বাছাই চর্যাপদ ২০১৫

এসো শব্দে বৃষ্টি নামাই

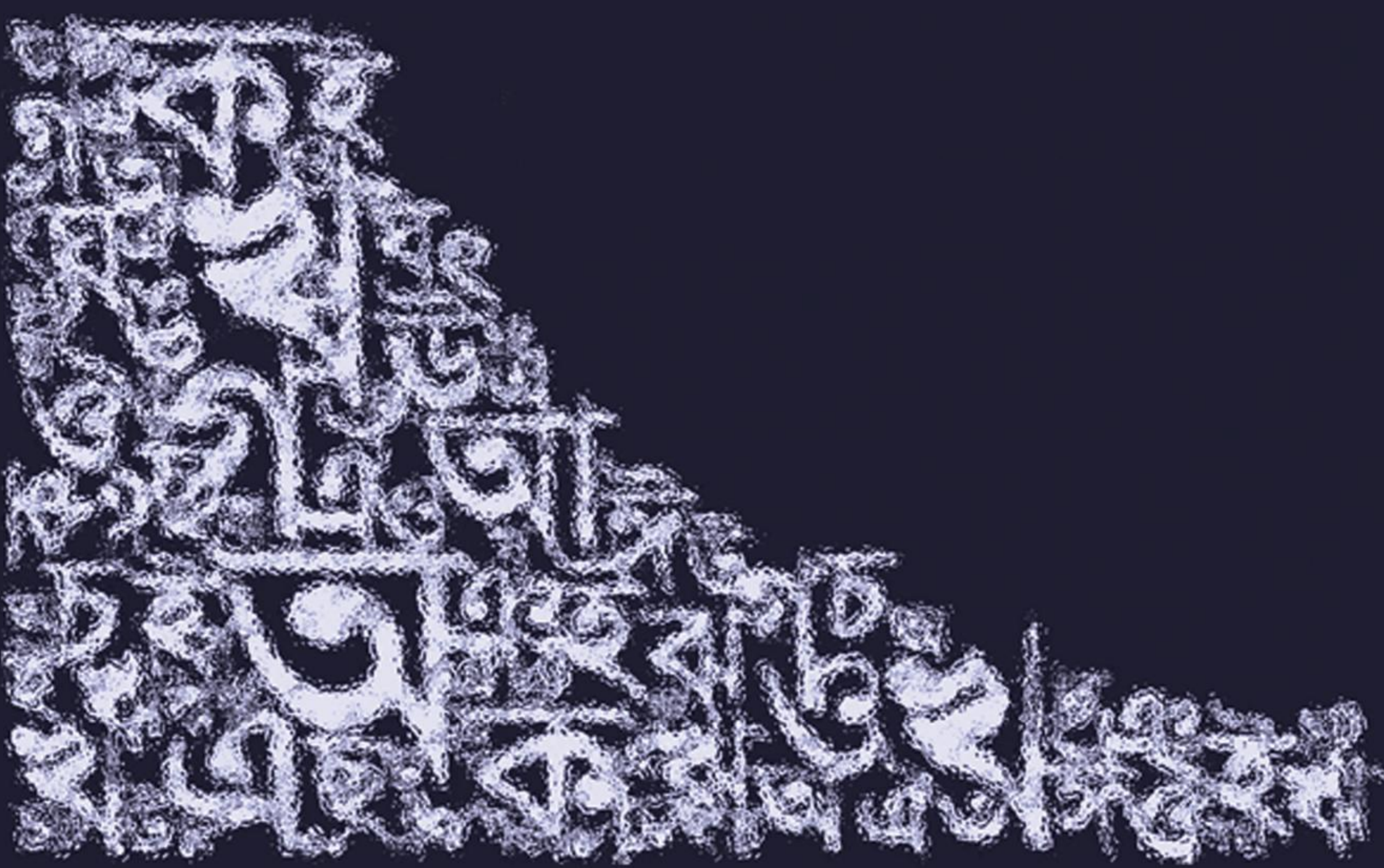

লেখালেখির সঙ্গে তিন সংখ্যাটির সখ্য বহুদিনের। কথায় আছে ‘কালি, কলম, মন, লেখে তিনজন’। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কালি–কলম স্থান ছেড়ে দিয়েছে কী–বোর্ডকে। লেখালিখিও ছাপাখানার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এসে কম্পিউটারের মনিটর পেরিয়ে এসে আজ হাতের মুঠোয় ধরা ট্যাবের স্ক্রিনে। তবু তিন সংখ্যাটি আজও সম্ভ্রম জাগায়। ২০১৫ সালে সেই সম্ভ্রমজাগানো তৃতীয় বর্ষ পেরিয়ে এল ‘চর্যাপদ’। যে কোনও নতুনের একটি প্রাথমিক উচ্ছ্বাস থাকে। মিলিয়ে যেতে সময় নেয়। সেই সময় অতিক্রান্ত হলে অবশিষ্ট থাকে নিখাদ মূল জিনিসটি। ‘চর্যাপদ’–এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শুধুমাত্র সেই কারণেই প্রথম দুই বছরের চেয়ে ফেলে আসা বছরটি আমাদের বেশি ঋদ্ধ করেছে, আরও বেশি সমৃদ্ধশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই তৃতীয় বছরের পথ অতিক্রম করে চতুর্থ বছরের চৌকাঠে পা রেখে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নেওয়া গেল সদ্য বিদায় দেওয়া সময়কে। অনাগত সময় আরও উজ্জ্বল হবে এই আশা রেখেই একত্রিত করা হল প্রতিনিধি স্থানীয় তেত্রিশটি লেখাকে।

কবিতা

ব্যষ্টিপ্রিয়	নবকলম	১১
ইয়াসমিন	অহ নওরোজ	৪৬
মাঝেমধ্যে	শ্রীপাদ	৮৯
রাজধানী	মধ্যমপুরুষ	৯৯
তুঁহু মম	স্বপন পাল	১১৫

ছড়া

সহজিয়া	পাগলা দাশু	২৬
রূপকথা	মৃণ্ময় ঘোষ	৬৭

গল্প

বাবলু ফার্নান্ডেজ	তুষার সেনগুপ্ত	৬
ডাক	ব্যকরণ শিং	৪৮
ঘুটনু কা দর্দ	স্বপন পাল	৯৩
আলোকপ্রাপ্তি	হযবরল	১০৩
বনমালী তুমি	থাংকমনি	১০৮

বড়গল্প

দায়	ব্যকরণ শিং	১১৬

অণুগল্প

এক জীবনের অপেক্ষায় অতিথি লেখক ৬১

দায় তুষার সেনগুপ্ত ১০৭

প্রবন্ধ

বিস্মৃত বৈষ্ণব সাধক পূর্ণানন্দ ও কানাই বলাই অতিথি লেখক ১৬

প্রথম ছাপা বাংলা বই ও এক অকথিত নায়ক শাক্যমুনি ৬২

রিফিউজি সমস্যা: ইউরোপের রিফিউজাল ও মানুষের হাহাকার সৌরদীপ ৯০

রম্যরচনা

ডাক ডাক কিসকো হযবরল ১৩

সিধুর ডায়েরি তুষার সেনগুপ্ত ৬৯

শোনা ঘটনা হস্তিমূর্খ ৮৭

ধ্যাৎ দাদামণি ৯৪

খুচরো ভালো লাগা সন্ধ্যাতারা ১১৩

মুক্তগদ্য

জলজ্যোৎস্না অভিমন্যু ২৭

এলোপাথাড়ি শাক্যমুনি ৯৫

স্মৃতিকথা

যেমন কাটিয়েছি ‘৯০ এর দশক হস্তিমূর্খ ২৮
পরিবেশ পরিচিতি প্রত্যয় ৭৮

সমকাল

মুক্তমনের বিদায় রুদ্ররোদ্দুর ৩৩
ভয় সদাধন খাঁড়া ৮০

রান্নাবান্না

আমিষের মজা প্রত্যয় ৩৭

ভ্রমণ

দু’দিনের ভাল্কি অতনু ৮২

ছবি-গল্প

সমাপ্তি প্রত্যয় ১০০

খেলাধূলা

ক্রিকেটের কুমার - ব্যাট-বলের বাইরের বাইশ গজে সৌরদীপ ৩৫

বাবলু ফার্নান্ডেজ

তুষার সেনগুপ্ত

মার্চ ১০, ২০১৫

ছেলেবেলায় কারও নামের শেষে গোমেজ, ফার্নান্ডেজ ইত্যাদি পদবীগুলো দেখলেই মনে মনে কল্পনা করে নিতুম ধপধপে ফর্সা সুঠাম চেহারার কোনও বিদেশী মানুষকে। আমার বেশ কয়েকজন মুসলমান বন্ধুও ছিল। কিন্তু অপরিচিত হলেও আলি, হায়দার বা রহমান পদবীর মালিকদের কখনই আফগানিস্তান, ইরান-ইরাক এমনকি পাকিস্তানী বলেও মনে হত না, খুব বেশী হলে কল্পনায় বাংলাদেশ এলেও আসতে পারত। কিন্তু বাংলাদেশ কি আর বিদেশ হল? সেইতো আমাদের মতই ছোটখাটো চেহারার দু'বেলা মাছ ভাত খাওয়া কালোকালো লোকগুলো, যারা একটু অদ্ভুত টানে হলেও বাংলাতেই কথা বলে। সেতো আমাদের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা কিম্বা আমার মতই বর্ধমানের লোকেরাও নিজস্ব অদ্ভুত টানেই কথা বলে। মুখ খুললেই আর বলে দিতে হবে না কার কোন জেলায় বাড়ি। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ পেলেও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আমার কাছে অধরাই ছিল। গ্রাম বাংলার প্রতিটা জনপদে এক বা একাধিক মসজিদ চোখে পড়লেও গির্জার সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। কালনায় একটা গির্জা ছিল। বড়দিনে দুর্গাঠাকুর দেখার মত করেই প্রতি বছর যিশুঠাকুর দেখতে যেতুম। কাটোয়ায় চলে আসার পর বড়দিনের নিয়ম করে যিশুঠাকুর দেখতে যাওয়াটা বাদ পড়লো। ওই লম্বা লম্বা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলের সাদা গাউন পরা যিশুঠাকুরের পুজো করা পুরুতমশাই গুলোকে কেন যে পাদ্রী বলে সেটাও জানলুম অনেক পরে, কারণ সবাই ওই পুরুতমশাই গুলোকে ফাদার বলেই ডাকতো। ততদিনে ফাদার মানে যে বাবা সেটা জেনে গেছি। বাবার বন্ধু বা পিতৃস্থানীয় কাউকে কাকু, জ্যেঠু বা পিসেমশাই-মেসোমশাই সম্বোধনেই অভ্যস্ত ছিলুম। নিজের বাবা থাকতেও একটা বাইরের লোককে মানুষ কি করে বাবা বলে ডাকে বুঝতুম না। হলই বা ইংরেজিতে ফাদার, বাংলা মানেটা তো সেই বাবা-ই, নাকি?

চার্চের যিশুপুজোর পুরুতমশাই গুলোকে কেন যে পাদ্রী বলে আর তাদের ফাদার বলে ডাকার কারণটাও জানলুম বাবলু, মান আমাদের বাবলু ফার্নান্ডেজের সাথে পরিচয় হওয়ার পর। ক্লাস ইলেভেনে আমাদের স্কুলে ভর্তি হল। বেশ সুঠাম বেঁটেখাটো চেহারা, একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল, কুচকুচে কালো রঙ, পুরো শরীর জোড়া জংলী আদিবাসীর ছাপ স্পষ্ট। ওর বাবার নাম ছিল বিশু টুডু, যার কথা জিজ্ঞেস করতেই নির্বিকার মুখে বাবলু বলেছিল,

- "মা বলে, ওইটে বেহেড মাতাল ছিল বটেক। পুটুস করি হাতির পায়ে পত্তেই, হুশ করে উপরে। মু দেখি নাই উঁয়াকে, মুর জন্মের আগেই........"

বাবলুর মুখেই শুনেছিলুম ওর বাবার দলা পাকানো দেহটা দেখেই মা ফুলমনি জ্ঞান হারিয়েছিল আর জ্ঞান ফিরতেই যাকে প্রথম চোখে পরেছিল তিনিই হচ্ছেন ফাদার ফার্নান্ডেজ, করজগ্রামের চার্চের পাদ্রী। সেই থেকেই সহায় সম্বলহীন গর্ভবতী ফুলমনি টুডুর আশ্রয়স্থল হল চার্চ আর ওই পাদ্রীর পদবীতেই পরিচিত হয়ে গেল বিশু টুডুর ছেলে বাবলু

ফার্নান্ডেজ। ফাদার অবিশ্যি আদর করে নাম রেখেছিল ববি, ববি ফার্নান্ডেজ। কিন্তু একটু বড় হতেই ববি নামটা কেমন যেন মেয়ে মেয়ে মনে হয়েছিল বাবলুর। তাই নিজেই ফাদারের কাছে আবদার করে ববি থেকে বাবলু হয়ে গেছিল। পুত্র স্নেহে মানুষ করা বাবলুর আবদারে ফাদারও আপত্তি করেন নি, স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন বাবলু ফার্নান্ডেজ নামেই। নিজের নাম করনের ইতিহাস নিয়ে বাবলু মজা করে বলতো,

- "মা বলে, মু বড্ড ইঁচড়ে পাকা। মুর লিজের নামটিকে তাই লিজেই দিছি।"

আমাদের স্কুলের হোস্টেলেই থাকতো বাবলু। পড়াশুনার থেকে ফুটবলে নজর বেশি। পড়ার বইয়ের অক্ষরের থেকেও ফুটবল মাঠের সবুজ ঘাস বেশি আপন ছিল বাবলুর। পড়াশুনাতে একটু নড়বড়ে হলেও ফুটবল মাঠে অল্প দিনেই সকলের নজর কাড়লো। ক্লাসের শেষ পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই স্কুলের গেমস টিচারের কিনে দেওয়া বুটজোড়া হস্টেলের ঘর থেকে বগলদাবা করেই একদৌড়ে খেলার মাঠে। পায়ে বুট গলিয়েই গায়ের সার্ট খুলে খালি গায়েই মাঠের মাঝে। খেলা শুরুর বাঁশি পড়তেই শুরু হত বাবলুর দৌড়, বল পায়ে অথবা বলের দখল নিতে অবিরাম দৌড়। বলের দখলদারি যেন বাবলুর জন্মগত অধিকার এবং সেই অধিকারকে কায়েম রাখতেই যেন বাবলুর এই জীবনপণ বাজি। বল পায়ে বাবলুর চকচকে ঘামেভেজা শরীরটা এঁকেবেঁকে পেরিয়ে যেত বাকী সবাইকে। জীবনযুদ্ধের লং-ডিস্টেন্স রানে বাকী সবার অনেক পেছন থেকে শুরু করা দৌড়ের অসম প্রতিযোগিতার খামতি মেটাতেই যেন এই ফুটবল মাঠে সবাইকে পেছনে ফেলে দেওয়ার এক অদম্য ইচ্ছে ফুটে বেরত বাবলুর চোখে মুখে, পায়ের পেশিতে আর দু'গাল বেয়ে চিবুক থেকে পড়তে থাকা ঘামের প্রতিটা ফোঁটায়।

****

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। কয়েক মাস পরেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। সবার মধ্যেই পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যস্ততা কিন্তু বাবলুর কোনও হেলদোল নেই। পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা বলতেই অদ্ভুত তাচ্ছিল্যের স্বরে বলতো,

- "মা বলে, মু উই করব বটেক, যিটা মুর ইচ্ছা।"

বাবলুর প্রতিটা কথা এই "মা বলে" বলে শুরু করার অভ্যাসটা আমার ভারি অদ্ভুত লাগতো। আর পাঁচটা আড্ডাবাজ বাঙালী ছেলের মতই আমরাও ততদিনে কথার শুরুতে দু অক্ষরের অশ্লীল মাত্রাগুলো আয়ত্ত করে ফেলেছি, কিন্তু আমাদের দলে ওই জংলী, আদিবাসী ভাষায় কথা বলা বাবলু ছিল একেবারেই ব্যতিক্রম। আমাদের সভ্য ভাষা আয়ত্ত করার প্রতি ওর যেমন অনীহা ছিল ঠিক তেমনই আমাদের পুরুষোচিত গর্বের অশ্লীল মাত্রগুলোর প্রতিও বাবলুর ছিল স্বতঃস্ফূর্ত অবজ্ঞা। ততদিনে ফুটবলার হিসেবে বাবলুর নাম জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যস্তরে পৌঁছে গেছে। অনূর্ধ্ব উনিশ বাংলা দলের ট্রায়ালে ডাক পেল বাবলু আর আমরা ব্যস্ত হয়ে গেলুম পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। পরীক্ষা শেষ, বাবলু ছাড়া সবাই পরীক্ষা দিলুম আর বাবলু সেই সময় বেঙ্গল জুনিয়ার টিমের হয়ে খেলতে গেল কেরলে। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরতেই সবাই ছিটকে গেলুম বিভিন্ন দিকে। কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং, কেউ মেডিকেল, কেউ কেউ কলকাতার বিভিন্ন কলেজে আর বাবলু ততদিনে পা দিয়ে ফেলেছে ফুটবলার হিসেবে ওপর দিকে ওঠার প্রথম সিঁড়িতে। তারপর আরও অনেক দিন দেখা হয়নি বাবলুর সাথে। অবিশ্যি মাঝে মাঝে খবরের কাগজে চোখে পড়ত

বাবলুর নাম। কলকাতার বড়দলে খেলছে, ইন্ডিয়ার হয়ে দেশের বাইরেও খেলতে গেছে বেশ কয়েকবার। বন্ধুদের মুখেই শুনেছিলুম কোন একটা ব্যাংকেও চাকরী পেয়েছে, খেলার জন্যেই। বাবলুর জন্যে মনে মনে গর্ব হত। ভাবতুম ও এখনও ওই সাঁওতালী ভাষাতেই কথা বলে কিনা অথবা এখনও ওর প্রতিটা কথা শুরু করার আগে সেই “মা বলে” বলার অভ্যাসটা আছে কিনা।

****

বাবলুর সাথে যে আবারও কোন দিন একেবারে সামনা সামনি দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। সুযোগটা এসে গেল আমাদের স্কুলের ১২৫তম বর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে। পুরনো, হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের খুঁজে পাওয়ার লোভেই গিয়ে বসলুম একেবারে পেছনের সারির একটা চেয়ারে। অসংখ্য অপরিচিত মুখের মধ্যেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতই মাঝেমাঝে ঝলক দিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট কিছু পরিচিত মুখ আর তার হাত ধরেই খুঁজে ফেরা সেই রঙিন রাংতায় মোড়ানো ফেলে আসা বা হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো। আরও অনেক কৃতি ছাত্রের সঙ্গে বাবলুও আজকের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি। নাম করা ফুটবলার! আমাদের স্কুলের অনেক প্রাক্তনীই আজকের নামজাদা ডাক্তার, সায়েন্টিস্ট অথবা শিক্ষাবিদ কিন্তু বাবলুর মত বিখ্যাত কেউ নয়। বাবলুই আজকের অনুষ্ঠানের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। ওকে কি করে হাতের সামনে পাওয়া যায় সেটাই ভাবছি। আজকের এই স্তাবকতাময় জগতে বাবলু নিশ্চয় স্তাবকদের ঘেরাটোপে হারিয়ে গেছে, এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ পিঠে অনুভব করলুম কার যেন ছোঁয়া। চমকে ঘাড় ঘোরাতেই আরও অনেক চেনা মুখের মাঝে সেই পরিচিত চকচকে চোখ, যেটা দেখলেই চিনে নেওয়া যায় বাবলু ফার্নান্ডেজকে। মাথার ঝাঁকড়া চুল উধাও হয়ে বেশ কিছুটা মসৃণ টাক আর হালকা ভুঁড়ি সত্বেও এক নজরেই চেনা যায় বাবলুকে। ঘোর কাটিয়ে ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাবলুর কাঁধে হাত রেখে প্রথমেই অদ্ভুতভাবে কুশল বিনিময় না করেই অথবা ওর পরিবারের কথা বাদ দিয়ে সেই বোকাবোকা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নটাই করে বসলুম,

- “তুই এখনও সেই সাঁওতালী ভাষাতেই কথা বলিস?”

- “কেন বে? তুর অসুবিধা আছে বটেক?”

বাবলুর স্বতঃস্ফূর্ত উত্তরে সবই হেসে উঠতেই সসংকোচে জিজ্ঞেস করলুম,

- “বিয়ে করেছিস? ছেলে মেয়ে? আর তোর মা?”

- “হ্যাঁ বিয়ে করেছি, একটাই ছেলে।”

বলেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার চোখে চোখ রেখে কাঁপা কাঁপা গলায়, পরিষ্কার আমাদের ভাষায় বলল,

- “বাপটা গেছিলো জন্মের আগেই আর মাও আমার হাঁটতে শেখার আগেই। প্রথম পা ফেলেছি ফাদারের হাত ধরে, ফাদারের মুখেই শুনেছি বিশু আর ফুলমনি টুডুর গল্প। বাপকে দেখিইনি আর মাকেও মনে পড়েনা.....”

- "কিন্তু তোর যে ওই প্রতিটা কথা বলার আগে 'মা বলে' দিয়ে শুরু করা...."

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই চাপা হিসহিসে স্বরে যেন স্বগতোক্তি করল বাবলু,

- "ওটা বললে মাকে সব সময় পাশে অনুভব করতাম, মনে জোর পেতাম আর সেদিনও আমি তোদের ভাষাতেই কথা বলতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছে করেই কথা বলতাম আমার সেই কোনও দিনও চোখে না দেখা আসল বাবার ভাষাতেই আর ওতেই অদৃশ্য ছোঁয়া পেতাম বিশু টুডুর হাতের...."

বলেই হনহন করে এগিয়ে গিয়ে জন সমুদ্রে হারিয়ে গেল আমাদের সেই জংলী আদিবাসী বন্ধু বাবলু ফার্নান্ডেজ.....

ব্যষ্টিপ্রিয়

নবকলম

ডিসেম্বর ৫, ২০১৪

আমার নতুন অসুখটা কালই কনফার্ম করেছেন চ্যাটারজি বাবু,
আমার ডাক্তার।
ভায়া অরিন্ন, খানকয়েক অন্যধারার আভাস দিয়ে শেষে যে জীবনটা এদিকে টার্ন নেবে,
এই ব্যাপারটা গল্পের একখানা মোক্ষম টুইস্ট সন্দেহ নেই;
আচমকা, তাই ভালো লাগলো খানিক, আবার ভালো লাগলোও না,
কারণ এইবারেই বিস্তর আলোচনা হবে...
যারা চিনতো না, জানতো না তারা আর জানবেও না,
কিন্তু মতামত দেবে সব্বাই – ভাববে কি দিলুম! অমোঘ ডায়াগনোসিস!
আমার অ্যাগোরাফবিয়া, অ্যাকিউট।
জন্মদিন গুলোয় আর ডাকিস না,
ডেকে লাভ নেই, ক্ষতি তোরই।
পরের পয়সায় কেনা শৌখিন মদও অতো বেশি খাইনা আর।
আহা, মদ নাই বা খেলাম, তবু তো আসা যায় তাই না?
বেশ, তবে অন্যদের ডাকিস না সেদিন, একা আমি যাব... পোষাবে?
বড় আলো গুলো সব নিভিয়ে দিস আমি পৌঁছোবার আগে।
গতমাসেই 'মিসটিক অফ হ্যালো' বইতে পড়েছি
- আলোর ভিড়ে আলোও শব্দ করে, প্রবল।
আমি ভিড়কে ভয় পাই, ভিড়তে ভয় পাই।

আমাকে কোনও বিয়েবাড়িতে ডাকিস না প্রসূন,
অচেনারা চেনা আর চেনারা অচেনা হবার খেলায় আমি ক্লান্ত।
এক্ষুনি এতো কোর্মা কালিয়া সইবে না।
রাস্তার যে ধারে বিয়েবাড়ি তার উলটোদিকের চায়ের
গুমটিতে আসিস, দেখা হবে...
বিয়ে ফুরোলে পরের বিকেলে।

প্রয়োজন ফুরোলে সব ভিড় ডিফিউজ করে যাওয়াই তো ভালো!
ডিফিউজড লাইট একলা দেখতে বেশি ভালো লাগে।
আচ্ছা, তোরও তো কাজ পড়েই যেতে পারে তাই না?
কাজটা সেরেই নিস বরং।
তুই চায়ের দোকানে আসিস, ওই ওখানেই, তবে আরও এক-দুদিন পরে।
জানিসই তো দুজনে বসলে ছোট দোকানে তিনজন হতে সময় লাগে না
শহরতলি–মফঃস্বলে।
ডাক্তারবাবু কানের কাছে মুখ এনে সাপের মতো হিসহিসে গলায় বলে গেছেন -
ওনলি সায়লেন্স ইজ নিডেড,
সায়লেন্স ইজ দ্য ওনলি অ্যাসিওরেন্স ফর ইউ।
ছাড়! ওনার কথা শুনি খানিক, হনার করি।
ওদিনটায় বরং চা-গ্লাস নিয়ে একলা বসি আমি

ডাক ডাক কিসকো

হযবরল

জুলাই ৭, ২০১৫

নব্বইয়ের দশকে আমরা যারা খুব হুড়মুড় করে বেড়ে উঠছিলাম তাদের কাছে এক যুতসই ডাকের যে কি মর্ম তা এই হোয়াটসয়াপ জেনারেশনের 'হাই' 'হুই' লিখে মেসেজ ভেজনেওয়ালারা বুঝবে না! তাদের না বোঝার দোষ যদিও সেই আমাদের ওপরেই বর্তায়, আমরা সেলফোন ব্যবহার না শুরু করলে এই হোয়াটসয়াপই বা তারা পেতো কোথায়? মোবাইলে স্নূজিং না থাকলেও, এলার্ম ঘড়ি তখনও আমরা ঘুমের ঘোরেই বন্ধ করে দিতাম, স্নূজ করা ক্যাঁ ক্যাঁ শুনে ঘুম ভাঙত কাকের ডাকে। আর তা না হলে খবর কাগজ দিতে এসে রানা কাকু সাইকেলের ঘন্টি তিনবার বাজিয়ে ডাকতেই বিছানা ছাড়তে হত। কাগজ হাতে পেতেই শেষের পাতায় ডেকে নিয়ে যেত সন্দীপ পাতিলের হরেক বলে চার মারার খবর কিম্বা কৃশানুর বল পায়ে ডিফেন্স কাটানোর ছবি। তখন সারাদিন স্কুলে বন্ধুদের কাছ থেকে কিব্বে, আব্বে, ওই, শোননা গোছের নানারকমের ডাক গুলোর মধ্যে কোথাও যেন একটা আন্তরিকভাবে বেঁচে থাকার রসদ লুকিয়ে থাকতো। সেই সময় ওই ডাকগুলোর মূল্য টের না পেলেও আজ কিন্ত সেগুলোকে বেশ মিস করি, বেখেয়ালেই হয়ত এদিক সেদিক তারা নিজের মত করে ডেকে বেড়ায়। পড়ন্ত বিকেলের আলো পড়তে না পড়তেই মাঠ ডাকতো, ফিরতে দেরী হলে মা ডাকত, সে ডাক শুনে না ফিরলে বাবার অফিস থেকে ফেরার পরেই মনে কেমন করা একটা 'কু' ডাকতো। আবার কোনো শব্দ না করেই দোতলার জানলায় উঁকি মারা জনৈক কৃষ্ণকলির চোখজোড়া যখন নিচে দাড়িয়ে থাকা সেন্টুদাকে নীরবে ডাকতো তখন আর আমাদের পায় কে, সাইলেন্ট ডাক পেয়েই সেন্টুদার দিল পুরো বোটানিক্যাল গার্ডেন হয়ে যেত! বেশ বুঝতাম, না চাইলেও, দাদা বিকেলে সিওর গোটা ক্যাপস্টান খাওয়াবে! অনেকদিন অব্দি ঘাবড়ে ছিলাম যে রাতের বেলায় নিশি ডাকলে কি করবো? প্ল্যান করেছিলাম নিশি ডাকলে কাঁচের জানলা দিয়ে তার ফটো তুলব প্রথমে, তারপর হবে নয় ওয়ান ইস্টু ওয়ান। ইনি মিনি করে ডেকে নিয়ে গেলেও ফটোতে প্রমাণ তো থাকবে। সন্তর্পণে রাতভর জেগে অপেক্ষা করলেও নিশির চেয়ে হিসির ডাকই আসত বেশি! ওদিকে আবার দিনের শেষে যখন কোনো ডাকই আসলো না, postmanরা খানিক ফ্রাস্টু খেয়ে ফিকে পরে যাওয়া সেই ডাকবাক্সগুলোতে গুটখার পিক ফেলে ফেলে লোহার জং আর লাল রং সব এক করে দিল।

এখনকার মতন তখনও ডাকখানাকে পোস্টাপিস বলাটাই চল ছিল আর আমার মনে হত ওটা নিশ্চই অব্বুলিশের মতন উদ্ভট এক বাংলা শব্দ। আবার সেই নীল রঙের শুকনো আঠালাগানো চিঠি গুলোকে আমি অনেকদিন অব্দি 'ইংল্যান্ড লেটার' বলতাম ও ভাবতাম ইংরেজদের দেশে চিঠি পাঠাতে হলে এতে লেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অদ্ভুত ভাবে 'কেলেঙ্কারি' আর 'ফস্টিনস্টি', এই শব্দ দুটি যতবার শুনতাম, মনে হত এরা দেশী নয়! এদের উৎপত্তি চেয়ার কিম্বা টেবিলের মতনই বিলেতি মুলুকে যা আমরা ধার নিয়ে বসে আছি। চিঠি লিখত বটে আমার ঠাকমা তার মেজদিকে, দেখলে পরে শর্টহ্যান্ড ফেল মেরে যাবে! দশ নয়ার পোস্টকার্ডে দুদিক মিলিয়ে মোটামুটি ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে ও গোটা বিশেক নাতি নাতনিদের যাবতীয় খবরাখবর, মাথা পিছু এক লাইন বরাদ্দ – যেমন 'বুবুর

পেটটা ভালো যাচ্ছে না', 'বাচ্চু আবার ফেল করেছে' ইত্যাদি। আবার গোপন কথাগুলো পেছনের দিকে খুদে খুদে হরফে আজব ভাবে লেখা থাকত – 'সেই যারা ওইগুলো করে দেবেনা বলছিল তারা কি মত বদলেছে, যদি করে ফেলে তা তুমি আমাকে সত্তর জানালে আমি সেইভাবে বাকিগুলো করে ফেলতে পারি', শালা কোথায় লাগে জার্মান সৈন্যদের সাঙ্কেতিক ভাষা। চিঠির শেষে ঠিকানাটাও খাস্তা – মেজদি, দারোগাবাড়ি, পোস্ট+টাউন+জেলা – মেদিনীপুর (তখন জেলাটা অবিভক্ত ছিলো)! পাড়ায় যে দোকানে গম ভাঙানো হত ঠিক সেই দোকানের বাইরেই টাঙানো থাকত লাল রঙের ডাক বাক্সটা। গম ভাঙিয়ে আটা বানানোর পরে দোকানের মালিক শম্ভুদা উপরি কালেকশন হিসেবে খুচরো পয়সা নেই বলে খদ্দেরদের এটা সেটা গছিয়ে দিতো, যেরকম আজ বড় শপিং মলের মুদি দোকানেরা আরো ব্যাপক ভাবে করে থাকে। আমিও ঠাকমার পোস্টকার্ড পোস্ট করার ফি বাবদ ৫ পয়সা বাগিয়ে শম্ভুদার দোকানের দুটো হজমি গুলি আর না হয় তিনটে মাছ লজেন্স কিনে বাড়ি ফিরতাম।

মাল্টিমিডিয়ার হরেক মিডিয়া মানে টেক্সট, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন, সাউন্ড ও মুভি, প্রত্যেকটাই তখনও সিঙ্গুলার ফর্মে বা ইচ্ছের বিন্যাসে একে অন্যের সাথে মিলেমিশে বহাল তবিয়তেই ছিলো। বৃষ্টি পড়লে এমনি দিনে এদের এক একটাই হয়ে উঠত ভীষণ ভাবে জীবনমুখী আবার পুজো পার্বণে এরাই জোট বেধে মন প্রাণ ছুঁয়ে মাতিয়ে যেত। কেউ আড্ডা মারত, কেউ শোনাত কবিতা। কারোর কাছে গান বা ছড়া, তো কারোর জন্য সেটা আর্ট এক্সিবিশন, সিনে ক্লাব কিম্বা মরশুম শেষে নাট্যমেলা! টেক্সটে ফিরি, লেখালেখি বলতে প্রথমেই কেন কবিতার আগে চিঠি লিখেছিলাম, সেটা জানা নেই। চিঠি লেখালেখি যে কতটা সিরিয়াস হতে পারে, তা ছোকরা ছোকরিদের মধ্যে চিঠি লিখে লিখে যোগাযোগ করার হিড়িক দেখলেই বোঝা যেত। প্রসঙ্গত তখনও অলসেরা চির-অপেক্ষায় ছিল যে কবে এসেমেস আসবে, কবে হোয়াটসয়াপ হবে? চাপে পড়ে গেলে চিঠি লেখালেখির ফর্মাট ছিল তিন প্রকার – প্রথমটা দু পক্ষের জন্যেই বিরক্তিকর, কেননা সেটা ছিল নোটের খাতায় হরেকরকমের এপ্লিকেশন লিখে প্রাকটিস করা ও বর্ষশেষে পরীক্ষার পাতায় তা ওগরানো। এক কথায় ভাষা শিক্ষার দরুন না চাইলেও ফাউতে মেলা পেশাদারি পানিশমেন্টের মতন। অবশ্য দ্বিতীয় দফায় দুই প্রান্তের লেখালিখিতে কিছু অনাবিল অপেশাদারি আনন্দও জড়ানো থাকত। ব্যক্তি বিশেষের উচ্চারণের দোষ থাকলে পরে তাকে বলা হত পেমপত্ত কিম্বা মাতৃভাষায় অরুচি ধরলে আমরা বলতাম 'লব লেটার'। অমুকের হাতের লেখা ভালো তো তমুকের ভাষা জবরদস্ত , কোলাবরেটিভ এপ্রোচে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা আনকোরা সেই প্রথম টেক্সট, 'তোকে স্বপ্নে দেখি, দেখতে পেয়েই আদিম ভোরে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে লাফ মারলাম। ঝপাস করে পরলাম তবু মরলাম না! জ্ঞান ফিরল বাগবাজার ঘাটে, বুঝলাম আমায় টেনে তোলা হচ্ছে। ভিড়ের মাঝে আমি সেই শুধু তোকেই খুঁজছি, তুই ছিলি তো?' এই ভাবে না জেনে, না শুনে, একে তাকে ধরে পাইকারি দরে চিত্তাকর্ষক চিঠি চালাচালি চলত ও সেই আলটপকা প্রতিযোগিতার পাস ফেলের খবর কোথাও ছাপানো হতনা। আর তৃতীয় কেসটি হচ্ছে দশ বারোটা চিঠি এদিক সেদিক বেছে পাঠানোর পরেও কাজ না হলে প্রেয়সীর বাপের নাম হাবি জাবি কাগজ ভরে বিয়ারিং চিঠি পাঠানো!

মনের কথা টেক্সট লিখে থুড়ি শব্দে জানাতে গেলে ডাইনোসররাও একসময়ে পাহাড়ের গায় আঁচড় কেটে যেতো! দুর্গম দেওয়ালে ডাইনো নখের আঁচড়ের দাগ এখনো জ্বল জ্বল করলেও নাগরিক দেওয়ালে লেখা ঝাপসা লাল রঙের স্লোগান গুলোও বোধহয় ডাকবাক্সদের মতই অবসলিট হয়ে যাচ্ছে। হোয়াটসয়াপের জমানায় প্রাক পুরাতন টেক্সটগুলো বুঝি বেজায় অক্সিমরন! মরণ বলতে মনে পড়ল, মরণদশা যেন হারুদার মতন না হয়। হারুদা আজকে সোশ্যাল

মিডিয়ায় থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু খুঁজে পাই নি, নাম বদলে ফেলেছে হয়ত। এখনো ভাবি যে সেই সময়ে ফেসবুক থাকলে পরে তার কীর্তিকলাপগুলো কেমন ভাইরাল হুল্লোড়টাই না মাচাতো! আপাতদৃষ্টিতে গোবেচারা ও ছাপোষা দেখতে হারুদা নামক এক বৈদ্যুতিন বিশারদের সাথে আমাদের অগ্রজপ্রতিম রূপকদার হাওড়া লাইনের লোকাল ট্রেনে সাক্ষাত হয়। যাত্রাপথে গায়ে পরে পরে সেই হারুদা দাদাকে জানায় যে তিনি ভিসিপি ও ভিসিআর সারিয়ে থাকেন ও হাঁক পারলেই লঞ্চ ধরে সে কিঞ্চিত সময়ের মধ্যেই সুদূর উত্তরপাড়া থেকে ব্যারাকপুরের যে কোনো প্রান্তে পৌছে যেতে পারেন। রূপকদা সব শুনে টুনে জানায় যে তার বাড়িতে ভিসিপি নেই। কিন্তু তা শুনে দমে না গিয়ে হারুদা ওই সাতটা স্টেশন কাটাতে কাটাতে রূপকদার গুষ্ঠী ও পরিচিতদের মধ্যে কার কার ভিসিপি ভিসিআর আছে তা জানার জন্য খামকা তুঘলকি আহ্লাদ করে যায়। ফিরে এসে, ট্রমা সামলানো সেই দাদা আমাদের ঘটনাটা জানিয়ে হারুদার ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলেন যে কারো ভিসিপি ভিসিআর সারাতে হলে একে ফোন করিস, তবে জেনে রাখিস এ আমার মত শান্ত মানুষকেও আধ ঘন্টার যাত্রা পথে জেরবার করে ছেড়ে দিয়েছিল। সাবধান! এরকম চিটেগুড় মার্কা সাইকোর পাল্লায় পড়া আর সুইসাইড করা কিন্তু একই ব্যাপার। ব্যাস আইস বাকেট চ্যালেঞ্জ কোথায় লাগে? হারুদার ভিসিপি ও ভিসিআর চ্যালেঞ্জ নিতে পরের দিন থেকেই অ্যাকশন শুরু। যাদের বাড়িতে ফোন আছে বা বাপের কোম্পানির দেওয়া বিনি পয়সার কানেকশন আছে, সবাই নিয়ম করে একবার ফোন করে ভুল ঠিকানায় হারুদাকে ভিসিপি সারাতে ডাকতে লাগলো। "হারুদা তুমি আসছে তো?" ছোকরা আবৃত্ত ছোকরি কণ্ঠে, উফ সে কি নিদারুন ডাক! জনৈক এক দাদাকে লোকাল ট্রেনে বসে দিমাগ চাটলে উল্টোভাবে তৎকালীন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং যে কি নির্দয় ভাবে তার শোধ নিতে পারে তা হারুদা অবশ্য দু তিন দিনের মধ্যেই হাড়ে মজ্জায় টের পেলেন। আর পরবর্তীকালে সেই কিসসা শুনলে পরে যারা উদ্বুদ্ধ হতো তারা মস্তি লুটতে এক টাকা খরচ করে পাবলিক ফোন থেকে হারুদাকে জিগ্গেস করত "কি হারুদা, মেশিনটা ঠিক হলো?" প্রথম প্রথম "কোন মেশিন? কোন ঠিকানা?" জাতীয় ভদ্র রেসপন্স এলেও পরে সেটা তীব্র রিঅ্যাকশনে পরিণত হয়েছিলো। ফোন লাগলেই শোনা যেত "ভিকিরির বাচ্চা, টিভি আছে বাড়িতে, যে ভিসিপি লাগাবি" কিম্বা "ওরে বাঙাল, কাঙ্গাল মানে জানিস? তোর্ মেশিনতো ভেঙ্গে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি, বাবাকে বল জলে নেমে পার্টস উদ্ধার করতে, তারপর নয় সারিয়ে দেবো!"

তারুণ্য ছাড়িয়ে যাওয়া বয়সন্ধিক্ষণে পড়তি বেলাতেও আমরা 'ডাক ডাক কিসকো' ডাক দিয়ে খেলার আগে নিজেদের দলভাগ করে নিতাম। একদিন বিকেলে ডাক শেষ হতেই, একটা প্যাঁকাটি মার্কা লোক এসে বলল, "সমানে সমানে দল ভাগ হলে, খেলাবেটা কে?" আমরা বললাম "স্যার আপনি খেলান না!" "ঠিক আছে তাহলে আমিই রেফারি? পকেটে বাঁশিটা নিয়েই এসেছিলুম আর স্যার ট্যার নয়, আমায় নবুদা বলেই ডাকিস।"

খেলার শেষে এক কোনে ডেকে, হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একটা চটি বই, চে গুএভারার লেখা – 'ডাক দিয়ে যাই' । আজকাল নবুদাদেরও দেখিনা, চে গুএভারারাও আর ডাকে না। জঞ্জাল হাতড়ালে পড়ে পাই একদা সযত্নে লালিত ওই ডাকব্যাকের ব্যাগে রাখা হরেকরকমের ডাকটিকিটগুলো। ওদের রংগুলোও কিরকম ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

বিস্মৃত বৈষ্ণব সাধক পূর্ণানন্দ ও কানাই বলাই

অতিথি লেখক

মে ২, ২০১৫

এক

ভক্তি-নিষ্ঠা, কর্মসাধনা, সৃজনী প্রতিভায় যিনি 'ইতিহাস' তৈরি করেন; অনেক সময় সেই ইতিহাস-ই তাঁকে ভুলে যায়। চৈতন্য-সমকালীন বা চৈতন্যোত্তর যুগের এমনি এক ইতিহাস বিস্মৃত বৈষ্ণব সাধক পূর্ণানন্দ। অবশ্য তাঁর বিস্মরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক আস্ত নগরীর বিলুপ্তি কথন। বর্গি হামলার রথচক্রতলে পিষ্ট অসংখ্য ছিন্নমূল মানুষের করুণ ক্রন্দন!

পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে ইতিহাসখ্যাত নগর ইন্দ্রাণীর বিকিহাট। অদূরে সন্ন্যাসতীর্থ কন্টকনগর। একাইহাটে কালাকৃষ্ণের পাটবাড়ি। অগ্রদ্বীপে গোবিন্দদাস পূজিত 'ভক্তের ভগবান' গোপীনাথ। বারো হাট তেরো ঘাট। কতো গগনচুম্বী মন্দির। ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীদের কলকোলাহল। হাট-বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের বিকিকিনি। বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাগত সাধক পূর্ণানন্দ বিকিহাটের গঙ্গাতীরেই প্রতিষ্ঠা করলেন কানাই বলাইয়ের দারু বিগ্রহ। সেবায়, ভক্তিরসের প্রেম সাধনায়, সতত সঙ্গীত সুধায় সিক্ত ভাগীরথীর এই পুলিন-বিপিন সেদিন হয়ে উঠেছিলো 'বঙ্গের বৃন্দাবন'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক। সুদূর মহারাষ্ট্রে উত্থিত বর্গী হাঙ্গামার ঘূর্ণিঝড় প্রবল বেগে আছড়ে পড়ে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে। লুঠেরা বর্গীদের ঘাঁটি হয়ে ওঠে এই ইন্দ্রাণী নগর। শাসনে শোষণে, নারী নিপীড়নে, ত্রাসে সন্ত্রাসে যেন শয়তানের অভিশাপ নেমে আসে। 'বঙ্গের বৃন্দাবন' হয়ে ওঠে 'কংসের কারাগার'! দলে দলে বিভ্রান্ত লোক সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ধাবমান। জনপদ হয়ে ওঠে জনশূন্য। ক্রমশ নির্জন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য! গঙ্গাও যেন প্রবল অভিমানে আরও পূর্ব দিকে সরে যায়। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় নগর ইন্দ্রাণী... বিকিহাট... সাধক পূর্ণানন্দ!

শুধু নির্জন ভগ্নমন্দিরে দণ্ডায়মান কালের বাঁশরি হাতে কানাই-বলাই।

দুই

যে যাই বলুন, ইন্দ্রাণীর প্রাণকেন্দ্র ছিল নিঃসন্দেহে বিকিহাট। সপ্তদশ শতকের ফন ডেন ব্রোকের ম্যাপে বিকিহাট উজ্জ্বল চিহ্নিত। কবি কৃত্তিবাস ও মঙ্গলকাব্যের বর্ণিত গঙ্গার বিখ্যাত ইন্দ্রেশ্বর ঘাট ছিল বিকিহাটে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের সন্ন্যাসখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে,

গোধুলি সমএ ইন্দ্রেশ্বর ঘাট দিয়া।
বিকিহাট প্রবেশিল নিত্যানন্দ গিয়া।।

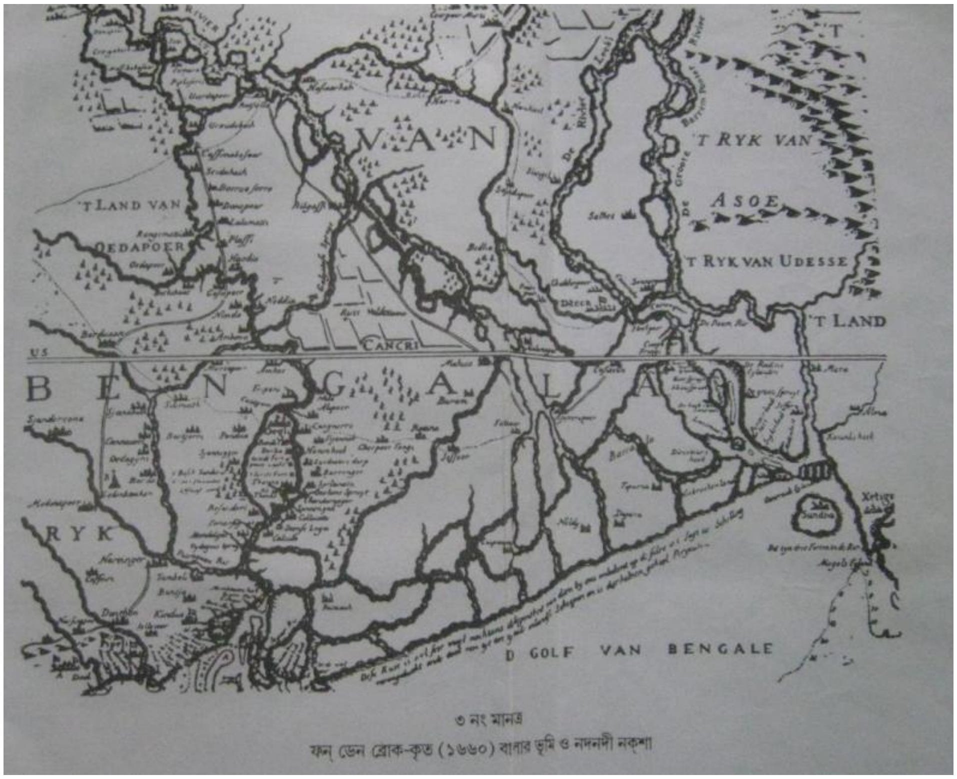

ফন ডেন ব্রোকের ম্যাপে বিকিহাট

ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন একটি উলম্ব প্রস্তরখণ্ড হনুমানলাঠি নাম নিয়ে এখনও দৃশ্যমান। বর্ধমানের মহারাণী এই বিকিহাটেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরগৌরী মূর্তি। তাঁর নিত্যপুজো এবং গাঁজন উৎসব হয়। এহ বাহ্য। বিকিহাটের মাঝামাঝি ঝিকরাডাঙা। একসময়ের সমৃদ্ধ জনপদ। বর্তমানে ঝোপঝাড় বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। অথচ মাটি খুঁড়লেই বেড়িয়ে আসে পুরাতন মুদ্রা। কালান্তরের তৈজসপত্রাদি। ভগ্ন গৃহস্থাপত্য। টেরাকোটা পুতুল ইত্যাদি নানা প্রত্নসামগ্রী। অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে সংগ্রহ করেছেন। একসময় ইটের ভাটায় মাটি কাটতে গিয়ে প্রচুর শঙ্খ, পুতুল ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঝিকরাডাঙার বকুলতলা থেকে পাওয়া গেছে লেখযুক্ত বিষ্ণু মূর্তির ভগ্ন পাদপীঠ। পাঠোদ্ধার করেছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। লেখে জনৈক বসন্ত সিংহ নামে এক বণিকের নাম খোদিত। সময়কাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। কাজেই বহু পূর্ব থেকেই বিকিহাট পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের কর্ষিত ভূমি। সাধক পূর্ণানন্দ এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর আরাধ্য দেব বিগ্রহ- কানাই-বলাই।

বিকিহাটের ঝিকরাডাঙা থেকে প্রাপ্ত মুদ্রা

কে এই পূর্ণানন্দ?

ইতিহাস তাঁর সম্পর্কে বড় নীরব। কার শিষ্য, কোথাকার ভূমিপুত্র, যাপিত জীবনের রেখাচিত্র ইত্যাদি কিছুই জানা যায়না। শুধু ক্ষীণ জনশ্রুতি, কানাই-বলাই'র সেবারীতি ইত্যাদি থেকেই একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। বৃন্দাবন থেকে এসে বহু ঘাটের জল খেয়ে বিকিহাটেই থিতু হয়েছিলেন। আবির্ভাব তিথি জানা না গেলেও তাঁর তিরোভাব তিথি পালিত হয় পৌষমাসের বকুল অমাবস্যায়। বিকিহাটের ঝিকরাডাঙায় এই উপলক্ষ্যে পূর্ণানন্দপন্থী শিস্যরা মহোৎসবের আয়োজনে যোগ দেন। সে কথায় পরে আসা যাবে। তার আগে পূর্ণানন্দ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্য জেনে নেওয়া জরুরী।

বিকিহাটের ঝিকরাডাঙা থেকে প্রাপ্ত পোড়া মাটির সামগ্রী

বঙ্গীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে এ পর্যন্ত আমরা তিনজন কবি বা সাধক পূর্ণানন্দের সাক্ষাৎ পাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহন ও রাঢ় পরিভ্রমণ করে মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে ওঠেন। তাঁকে দেখে আনন্দে মূর্ছিত হয়ে পড়েন তিনজন ভক্ত- অদ্বৈত আচার্য, তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী ও জনৈক সাধক পূর্ণানন্দ।

অদ্বৈতচন্দ্রের বাড়ি গেলা গৌরচন্দ্র।
আনন্দে সমাধি সীতা অদ্বৈত পূর্ণানন্দ।।

সুতরাং বোঝাই যায় এই পূর্ণানন্দ নিঃসন্দেহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈত আচার্যের পূর্বপরিচিত এবং তিনি শান্তিপুরেই থাকতেন। অনুমান করা যেতে পারে এই পূর্ণানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে কোনও এক সময়ে বিকিহাটে চলে আসেন।

দ্বিতীয়ত চৈতন্যপরিকর বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর পালিত পুত্র। জাহ্নবীদেবীর প্রয়াণের পর বৃন্দাবন থেকে কানাই-বলাই'র দারু বিগ্রহ নিয়ে এসে নাকি বাঘনাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রামচন্দ্রের এক শিষ্য ছিলেন বিপ্ররামচন্দ্র। তাঁর মাতুল ছিলেন সাধক পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। ইনি বিষ্ণুপুরের তপোবনে সাধন ভজন করতেন। রাজবল্লভ রচিত 'মুরলীবিলাস' কাব্য থেকে জানা যায়

পূর্ণানন্দ রামচন্দ্রে করাইল বিভা।
তথা প্রকাশিল কত শক্তির প্রতিভা।।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা তথা আরম্ভিলা।
শাখাসূত্র করি কত জীব নিস্তারিলা।।

এই ধরণের তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যেহেতু বাঘনাপাড়াও বিখ্যাত কানাই-বলাইয়ের জন্য, সেই সূত্রে পূর্ণানন্দ হয়ত বা বাঘনাপাড়া ঘরানার সাধক। কিন্তু এই অনুমানের সমর্থনে কোনও ঐতিহাসিক তথ্য মেলেনা।

তৃতীয়ত বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে জনৈক পূর্ণানন্দ বা পূর্ণানন্দ দাস ভণিতায় অনেকগুলি পদের সন্ধান মিলেছে। ইনি সম্ভবত চৈতন্যত্তোর যুগের পদকর্তা। রাধা-কৃষ্ণের-উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অভিনব পদ রচনায় তাঁর কব্যপ্রতিভা ঈর্ষণীয়।

এই বনে কংসের আজ্ঞা নাই বলে হরি।
রাই বলে এখন ভাঙ্গিব ভারী ভুরি।।
কৃষ্ণ বলে স্বর্গ মর্ত্য মোর অধিকার।
রাই বলে তোমায় জানি আভীরকুমার।।
কৃষ্ণ বলে ব্রহ্মা ইন্দ্র দমন করি আমি।
রাই বলে নন্দের গো-ধন চরাও তুমি।।
কৃষ্ণ বলে গোবর্ধন ধরেছি কৌতুকে।
রাই বলে নন্দের বাধা বহিছ মস্তকে।।
এই বোল শুনিয়ে কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে।
কৃষ্ণকে বাঁধিল রাই আপন বসনে।।
দেখিয়া সুবল সখা দূরে পলাইল।
দাস পূর্ণানন্দের মনে আনন্দ বেড়িল।।

পূর্ণানন্দের সম্পর্কে এখনও বোধহয় স্থিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি। ক্ষেত্রসমীক্ষা সূত্রে জানা যায় তাঁর অধিকাংশ শিস্য সম্প্রদায় তন্তুবায় গোষ্ঠীর। কাটোয়া মহকুমার শিলে-পলসোনা, শ্রীবাটি, আমডাঙা, ঘোড়ানাশ-মুস্থুলি, ইসলামপুর চক প্রভৃতি গ্রাম থেকে আজও তন্তুবায় গোষ্ঠীর নরনারীরা তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে সমবেত হন। তাঁদের পূর্বপুরুষরা আসতেন কাপড়চোপড় বিক্রি করতে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি হলে মধ্যস্থতা করতেন সাধক পূর্ণানন্দ। জরিমানাস্বরূপ এক ভাঁড় করে চাল মেপে দিতে হত। আর সেই চালেই হত কানাই-বলাই এর সেবা। প্রথাটি আজও তাঁরা টিকিয়ে রেখেছেন। সংশ্লিষ্ট তন্তুবায়রা নবান্নের দিনে পূর্ণানন্দের নামে একটি ঘট প্রতিষ্ঠা করেন। সংগৃহীত চাল নিয়ে যোগ দেন পূর্ণানন্দের তিরোভাব উৎসবে। বেড়ার গোস্বামী বাড়িতে।

তিন

কাটোয়া থানার বেড়া গ্রামের প্রয়াত মনোরঞ্জন গোস্বামী। গৃহী বৈষ্ণব। পেশা ও নেশা ছিল দারু বিগ্রহের অঙ্গরাগ করা। দুই সন্তানের মধ্যেও সঞ্চারিত প্রবল বৈষ্ণবানুরাগ। বেড়ার গোস্বামী বাড়ির দুটি অমূল্য সম্পদ, এক প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথি সংগ্রহ, যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের অনুলিপির অংশবিশেষ। চৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ। দুই দক্ষিণমুখি ছোট্ট দালানমন্দিরে পূর্ণানন্দ সেবিত সেই কানাই-বলাই বিগ্রহ।

বেড়ার কানাই বলাই

কি করে এলেন?

সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। গোস্বামী পরিবারের সঙ্গে কথা বলে যা যেটুকু জানা গেছে তার সারসংক্ষেপ হল – মনোরঞ্জন গোস্বামীরা ছিলেন কেতুগ্রাম থানার কেঁউগুরি গ্রামের আদি বাসিন্দা। বৈবাহিক সূত্রে তাঁর পূর্বপুরুষেরা চলে দাঁইহাট বাঘটিকরায়। এখানকার গোঁসাইরা ছিলেন বিকিহাটের। এবং কানাই-বলাইয়ের আদি সেবাইত। বর্গী হামলার পর তাঁরা বাঘটিকরায় এলেও কানাই বলাইয়ের সেবা হত বিকিহাটের নির্জন মন্দিরে। বংশ লোপ পাওয়ায় পরবর্তীকালে মনোরঞ্জন গোস্বামীরা সেবার অধিকার লাভ করেন এবং বাঘটিকরা থেকে বেড়াগ্রামে চলে আসেন। এদিকে ১৩৬২ বঙ্গাব্দের প্রবল বন্যায় বিকিহাটের আদি মন্দির ভেঙে পড়লে কানাই বলাই চলে আসেন বেড়াগ্রামের গোস্বামী বাড়িতে। বর্তমানে মাত্র একবারই বিকিহাটের ঝিকরাডাঙায় বিগ্রহদ্বয় নিয়ে যাওয়া হয় পূর্ণানন্দের তিরোভাব উপলক্ষ্যে।

বেড়ার পুঁথি

প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ

বলাইয়ের দারুবিগ্রহের উচ্চতা প্রায় তিন ফুট। শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট। কানাইয়ের উচ্চতা পৌনে তিন ফুট। হালকা নীল গায়ের রঙ। গোপ বেশ। বেনুকর; যুগলকর ধৃত বংশী ললিত ভঙ্গিমায় ওষ্ঠাবদ্ধ। নৃত্যরত চরণযুগল আড়াআড়িভাবে সংস্থাপিত দ্বিদল প্রস্ফুটির পদ্মবেদিকায়। ত্রিভঙ্গিম ঠামে দুই ভাই দণ্ডায়মান। মুখমণ্ডল ঢলঢল। দীঘল চোখে কৈশোরক

বিস্ময়। স্মিত হাস্যাধর। পৌগণ্ড দশার মূর্তি। বাঘনাপাড়ার কানাই বলাইয়ের সঙ্গে প্রভূত মিল থাকলেও মূর্তি বিন্যাসে কিঞ্চিৎ পৃথক। সেখানে বলরামের হস্তদ্বয় কটিসংলগ্ন।

বলরাম-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা বহু প্রাচীন সংস্কৃতি। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায় সুউচ্চ মন্দিরে কৃষ্ণ বলরামের পুজো হত। খ্রিষ্ট পূর্ব সময়ের অনেক রাজ মুদ্রায় কৃষ্ণ-বলরাম খোদিত। কিন্তু সে মূর্তি বীরের। যোদ্ধার। একসময় লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি হিসাবে বলরামের উপাসনা হত। যেমন বর্ধমান জেলার বোড়গ্রামের বলরাম। চৈতন্যত্তর যুগে বলরাম মূর্তি পুজো করতেন নিত্যানন্দপন্থী গৃহী বৈষ্ণবগণ। কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়িতে, সুদপুরে, মাঝিগ্রামে, কানাইডাঙা প্রভৃতি গ্রামে বলরাম-মহাপ্রভুর দারু বিগ্রহ রয়েছে। এই মূর্তিগুলি প্রেমের, মধুর রসের। কিন্তু কানাই বলাইয়ের দারুবিগ্রহ হাতে গোনা মাত্র। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল কাব্যের দিগ্‌বন্দনা থেকে তৎকালে জনপ্রিয় কৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যেমন 'সাঅড়াকোণের রাম-কৃষ্ণ', গোরুটির রাম গোপাল', 'বাগনাপাড়ার বলরাম' ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতকের অন্তিমার্ধ পর্যন্ত বলরাম-কৃষ্ণ উপাসনা বঙ্গদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রশ্ন উঠতেই পারে এই তালিকায় পূর্ণানন্দের নাম কই? উত্তর দেওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে সমর্থনে বলা যায় যে বর্গী হাঙ্গামার পর থেকে ইন্দ্রাণী নগরের মত কানাই-বলাইও বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। তাঁদের বংশীধ্বনি চাপা পড়ে যায় অসংখ্য সাধারণ মানুষের হাহাকারে আর আর্তনাদে।

চার

পূর্ণানন্দ সেবিত কানাই বলাইয়ের সঙ্গে বারোটি নারায়ণ শিলাও পূজিত হয়। নিত্যসেবায় বৈচিত্র না থাকলেও নিয়মসেবার মাসে অর্থাৎ শারদীয়া একাদশী থেকে পরবর্তী একমাসব্যাপী পূর্ণানন্দ প্রবর্তিত সেবারীতিই অনুসৃত হয়। সকালে মঙ্গলারতি। শ্রী শ্রী দামোদর অষ্টকোমের পর প্রভাতী কীর্তন, স্বপ্ন বিলাসের কীর্তনের মধ্যে দিয়ে কানাই বলাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ। বেলা ন'টার সময় বল্যভোগে চাই মালপোয়ার ভোগ, ফলমূলাদি সহ হাতে তৈরি মিষ্টান্ন। বলরামের একটি বিশেষ ভোগ আছে। মিছরির নৈবেদ্য। প্রসঙ্গত শ্রীখণ্ডের ঠাকুরবাড়ির এক কৃষ্ণ বিগ্রহের নাম চিনির ঠাকুর। চিনির ভোগ তাঁকে দিতেই হবে। দুপুরে যথারীতি আতপ ও সিদ্ধচালের ঘৃতসিক্ত অন্ন। অমৃতময় রসা। নানাবিধ ব্যঞ্জন। ভাজাভুজি। পায়সান্ন। বাঙলার নিরামিষ রন্ধনশিল্পে বৈষ্ণবদের বিশেষ অবদান রয়েছে। কানাই বলাইয়ের ভোগ পদাবলী সেই প্রাচীন ব্যঞ্জনশিল্পের দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যায় যথারীতি সন্ধ্যারতি এবং বলরামের আরতি কীর্তনের মধ্য দিয়ে বিগ্রহদ্বয়ের মন্ত্রশয়ান। মাঝে মাঝে দেশী চালের ভাজা মুড়ি সরষের তেলের সঙ্গে মাখিয়ে ভোগ দেওয়াও প্রাচীন প্রথা। বর্গী হামলার পর বিকিহাট যখন ঘন জঙ্গলে ঢেলে যায় তখন ব্যাঘ্রভয়ের নিবারণের জন্য বিরল ব্যতিক্রমী 'বাঘের ভোগ'ও নিয়মিত ছিল নির্জন মন্দিরে।

জন্মাষ্টমী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই দিন কীর্তনলীলা পরিবেশিত হয়। পালার বিষয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড ও বাল্যলীলা। নন্দোৎসবে নারকেল কাড়াকাড়ি। স্থানীয় ঘোষেদের ব্রজের রাখাল বালকের বেশে অংশগ্রহণে পুরাণ ও লোকায়ত ভাবনা মিলেমিশে একাকার। বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গেলেও গোস্বামী বাড়ির আরেকটি প্রাচীন বৈষ্ণব অনুষ্ঠান 'হরিদাস নির্যাণ'। মনরঞ্জন বাবুর আমলে সাড়ম্বরে পালিত হত। অনন্ত চতুর্দশী তিথিতে বৈষ্ণব সাধক হরিদাসের

তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে কানাই বলাই কে কীর্তন শোনাতে আসতেন বাঙলার বিভিন্ন স্থানের কীর্তনিয়ারা। কানাই বলাইয়ের বাৎসরিক উৎসব ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন গোবর্ধন পুজো ও অন্নকূট উৎসব। ঘৃতসিক্ত অন্নস্তূপে একটি শিলাকে স্থাপন করে বিশেষ পুজো অর্চনা হয়। এইদিনেও গোবর্ধন যাত্রার কাহিনী নিয়ে বিশেষ কীর্তন গানের আয়োজন হয়।

পাঁচ

মূর্তি-বৈচিত্র, সেবারীতি, ধ্যানমন্ত্র প্রভৃতির সূত্রে অনুমান করা অসঙ্গত হবেনা যে পূর্ণানন্দ ছিলেন সখ্য ও বাৎসল্য রসের উপাসক। তাঁর কানাই- বলাই যেন ব্রজের রাখাল। চঞ্চল কিশোর। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীও অনুরূপ। দুই ভাইয়ের ছদ্মবেশে কানাই-বলাই দাঁইহাটের ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন খেয়েছিল ছলনা করে। তারপরের ঘটনা ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার শাঁখা পরার মত। ভগবানকে কাছে পেয়েও চিনতে না পারায় ভক্তের আকুল আক্ষেপ। আজও সেখানকার ময়রা গোষ্ঠী মিষ্টান্ন ভোগ দেন। পরবর্তীকালে অবশ্য কানাই বলাইয়ের উপাসনায় লেগেছে মধুর রসের পরশ। তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্বগ্রাসী রাধাভাবের পাশে এ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

ভাবের দিক থেকে কানাই বলাই মূর্তি যথেষ্ট প্রাচীন। যদি ধরে নেওয়া যায় নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ উপাসনাই এর মধ্য দিয়ে প্রকটিত তাহলে এই মূর্তি অন্তত ষোড়শ শতকেই বাঙলাদেশে চালু হয়েছিল। পরবর্তীতে কানাই বলাইয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশে গৌর-নিতাইয়ের দারু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জোয়ার এসেছিল।

বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা'। দেবতাকে বৈষ্ণবরা কেবল ভক্তি শ্রদ্ধাই করেননি, অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। আদর করেছেন। তাঁদের অনেকের কাছে বিগ্রহ নিগ্রহ বা গলগ্রহ নয়। সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঘরের ছেলে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শীতকালে চাদর, লেপ, গলায় মাফলার পর্যন্ত পরানো হয়। কোথাও আরাধ্য গোপীনাথই করেন মৃত ভক্তের শ্রাদ্ধ। কেউ বা খরচ খরচা করে হয়ে যান ফকির। যেমন বাঘনা পাড়ার বলরাম। বাঙলার পারিবারিক সংস্কৃতিতে কানাই-বলাইয়ের একটা আলাদা স্থান রয়েছে। পিঠোপিঠি দুই ভাই। প্রায় সমবয়সী। পরম বন্ধু। নামেও সেই কানাই-বলাই। এরই দেবায়িত রূপ কৃষ্ণ বলরাম। নিশ্চয়ই আপনাদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন-

'আঙিনায় কানাই বলাই
রাশি করে সরিষা কলাই।
বড় বউ ছোট বউ মিলে
ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, সম্পাঃ বিমান বিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়
২. মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল, সম্পাঃ বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত
৩. বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সাহিত্য- কানন বিহারী গোস্বামী
৪. বৈষ্ণব পদাবলী (সংগ্রহ), সম্পাঃ কাঞ্চন বসু

ব্যক্তিঋণ- করুণা সিন্ধু গোস্বামী, বেড়া-গোস্বামী পাড়া ও ক্ষেত্র সমীক্ষায় সাহায্যকারী অনেকেই।
(ছবি- লেখক)

এই পর্বের অতিথি লেখক ড. স্বপন কুমার ঠাকুর। পেশায় দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক, নেশায় আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্র-গবেষক। "ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর কাটোয়া মহকুমার লোক জীবন ও লোক সংস্কৃতি" বিষয়ের ওপর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লোক সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী "কৌলাল" পত্রিকার সম্পাদক।

সহজিয়া

পাগলা দাশু

মে ১০, ২০১৫

"বুড়ো এক আধধেড়ে",
ছোট্ট খুকু চোখ পাকিয়ে বলল আমায় তেড়ে,
"তোমার সাথে আড়ি!
কিসব লেখো ছাইপাঁশ সব সহজ ছড়া ছাড়ি,
কত্ত কঠিন লেখা -
ইশ্কুলে তো হয়না দেখি এসব বলা শেখা।"
করুণ মুখে বলি,
"আর ভুল নয়, এবার থেকে তোমার কথায় চলি;
লিখব নতুন কিছু -
সেথায় পাবে আম-কলা আর কাঁঠাল কিংবা লিচু;
সবুজ তোতা-টিয়ে,
গাইবে তারা সহজ সুরে সহজ কথা দিয়ে;
সিংহ বাঘে মিলে
নাইতে যাবে গরুর সাথে পদ্মপুকুর ঝিলে।
রাজা-রানীর দেশে
থাকবে সবাই হাসি-মজায়, থাকবে সবাই মিশে।"
"শুধুই মজা? ছি!
দৈত্য-দানব নাই যদি রয়, করবে রাজায় কি?
বোকাই রয়ে গেলে,
দুষ্টু লোক তো সবেই থাকে!", বেজার খুকু বলে।
সত্যি কথাই বটে,
ছোট্ট হলেও খুকুর দেখি বুদ্ধি বেদম ছোটে।
"আর ভেবো না যাও,
এবার থেকে তেমনি পাবে ঠিক যেরকম চাও।"
খুকুর মুখে হাসি,
শান্ত হলো মনটা এবে, লিখতে আবার বসি;
মনের মাঝে সাধ,
মন্দ-ভালো যাই না লিখি, শক্ত কথা বাদ।

জলজ্যোৎস্না

অভিমন্যু

জানুয়ারী ২৯, ২০১৫

বিবাগীই হবো মনস্থ করেছি। ভিটেমাটি ভদ্রাসন সংসার সব ফেলে রেখে বিবাগী হয়ে যাবো আমার শৈশবের স্বপ্নের নদীর কাছে! হৃদয় নিংড়ে দেবো তার জলে, ভোরের শিউলির মতো টুপটাপ ঝরে পড়বে আমার গ্লানি দুঃখ অভিমান – নদীর জলে তারা ভাসবে দুলবে! ভাসতে দুলতে ভাসতে দুলতে চলে যাবে নদীর বাঁকের মুখে, তারপর তারা আর নেই, ছিলো না কখনও! একঠেঙে বাবার মতো এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বয়োবৃদ্ধ বক বলে উঠবে – যাঃ, সব ভাসিয়ে বেশ আমার মতোই হালকা হ'লি, বল! শুনে মনে হবে, তাইতো! এখন সত্যিই বেশ হালকা, ফুরফুরে! নদীর পাড়ে নরম ঘাসের গালিচায় গড়াতে গড়াতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! এরই ফাঁকে সেখানে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ত্রয়োদশীর সাবলীল চাঁদ! আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললে – শিশিরে শয্যা নিয়েছিস যে! উঠে আয়! যা, নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে নে! তখন খিদে উঠেছে চাগিয়ে, ঘাসের উপর ঝলক ঝলক জ্যোৎস্না, বাতাস চন্দন চন্দন! পায়ে পায়ে জলের ধারে গিয়ে মুখে জল দিতেই বিসর্জিত প্রতিমার মাটি যেমন জলে গ'লে যেতে থাকে তেমনি আমার মুখটাও জল-হাতের ছোঁয়ায় গ'লে যেন কেমন কাদামাটির মতো! ধুলোর আস্তরণ ধুয়ে যাচ্ছে ভেবে আরও জল দিই, এবার যেন আরও বেশি কাদা-গলা! যতই জলের ঝাপটা দিই ততই গ'লে গ'লে যায় আমার মুখ! তারপর একসময় যেন কেমন খটখটে! তাকাতে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি! চোখে হাত দিই, কই কোথায় চোখ, শুধু একটা গর্ত! হাতেও কোনো অনুভূতি নেই, কখন গ'লে গ'লে তারাও শুধু খট্ খট্! ভয় পেয়ে চিৎকার ক'রে উঠি, নদীকে শুধোই – সর্বনাশী, কী আছে তোর জলে, আমার হাত মুখ চোখ সব যে গ'লে গেলো! আমার সব তছনছ, এখন আমি কী করি! ঢেউ তুলে নদী খলখল হেসে উঠলে! বললে – বিবাগী হ'তে এসেছিলি না! যাঃ তোকে বিবাগী ক'রে দিলাম ! আমি তখন কাঁদোকাঁদো, দেখে চাঁদ বললে – আয়, একটু হাঁ কর দেখি! যন্ত্রের মতো মুখ উপরে তুলতেই সে আমার মুখে জ্যোৎস্না ঢালতে শুরু করলে! আমি তো তখন খটখট! জ্যোৎস্না গড়িয়ে যেতে থাকলো খটখট বেয়ে নিচে, তারপর নদীর জলে! স্পষ্ট শুনলাম শব্দ – কুলকুল কুলকুল!

জলজ্যোৎস্নার ধ্বনিতে আমি এখন নিগূঢ় কান পেতেছি! ভীষণ ইচ্ছে করছে যদি একবার নৌকা হ'তে পারি, তবে ওই ধ্বনির জৌলুশে ভেসে ভেসে আমি এবার বিবাগী হয়ে সত্যিই চলে যাবো জলজ্যোৎস্নার সমুদ্রে! কে জানে, কোথায় কত দূর থেকে আমার বাসনার রূপসাগর আমাকে ডাকছে! রত্ন অমৃত এসব কিছুই চাই না আমি, অকূলের উজ্জ্বলতায় ডুব দিয়ে শুধু জলজ্যোৎস্নার খঞ্জনি শুনতে চাই নিশিদিন!

যেমন কাটিয়েছি ৯০-এর দশক

হস্তিমূর্খ

এপ্রিল ৫, ২০১৫

১

৯০-এর দশক। প্রকৃত অর্থেই এক পরিবর্তনের দশক ছিল। যে কোনও দিক দিয়েই দেখুন, গোটা বিশ্বের ইতিহাসই পরিবর্তিত হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সদ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ঘটেছে, পূর্ব ইউরোপ গলে যেতে শুরু করেছে, বুকে হেঁটে শুরু হয়েছে একমুখী বিশ্বের দিকে যাত্রা।

এই যে সময়, এক অনন্য বিশ্বাসভঙ্গেরও বটে। একটা দীর্ঘ জীবন ধরে যাঁরা ভেবে আসছিলেন, যদিও ততদিনে কল্পপ্রাসাদের বেশ কিছু ইঁট খসে গিয়েছে, তবু একটা ক্ষীণ আশা যেটুকু ছিল, সেটুকুও নিভে গেল শুধু নয়, ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল যে আসলে একটা অন্তঃসারশূণ্য রঙিন বুদবুদ ফেটে গেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশের সামগ্রিক চেতনাও বদলে ফেলতেই হল। তবে আরও অনেক কিছুর মত ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের দেশের অভিভাবকরা দোলাচলে ভুগলেন না। কেন্দ্রে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের মন্ত্রীসভার পতনের পরেই চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা তৈরি হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল নতুন ঘোড়ার ওপরে সওয়ার হওয়া।

আর ঠিক এই সময়েই আমার গলা ভেঙে গেছে, বালক থেকে বা সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে লোক হয়ে উঠতে শুরু করেছি, ঠিক হোক বা ভুল, তৈরি হতে শুরু করেছে মতামত, একটা রোম্যান্টিক চিন্তাভাবনা ঘিরে ধরছে মনকে, সেই সাথে জানতে ইচ্ছা করছে, আগের দিনটা কিরকম ছিল, এবং একই সঙ্গে এটাও মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে যে চিন্তাভাবনা খুব সামান্য হলেও পরিণতি পাচ্ছে। অতএব এই সময় অর্থাৎ নব্বই দশক কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে যাঁরা পা রাখলেন তাদের কাছে এক অন্যরকম অর্থবহ হয়ে উঠল।

৯০-এর দশকে আমরা অনেক কিছুরই সাক্ষী থেকেছি, গড়ে ওঠা, ভেঙে পড়া, বিশ্ব-ইতিহাস বলুন কিংবা ভারতীয় ইতিহাস, সব দিক দিয়েই। এমনকি বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি অপরিবর্তিত থেকেও যেত, তবু ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক কিছুই ঘটেছিল, যা ছিল একান্তভাবেই তার নিজস্ব।

এই ট্র্যানজিশন পিরিয়ডে বেড়ে উঠলেও শুরুতেই জানিয়ে রাখা ভাল – আমি ঐতিহাসিক নই, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক পর্যবেক্ষক নই, অতএব এই ধরণের লেখার মূল সম্পদ যে 'নির্লিপ্তি' তা হয়ত অনেকাংশেই অধরা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়াও এত সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পশ্চাদপট কিংবা তুলনামূলক আলোচনা, পুরোটাই আমার অনায়ত্ব, অতএব আমার কাছে শুধু পড়ে থাকে 'সময়টাকে কিভাবে পেয়েছি, কিভাবে দেখেছি আমার স্কুল কলেজের গন্ডি পেরিয়ে চাকরিতে ঢোকার ঠিক আগে', চেষ্টা করব যথাসম্ভব সেই অংশটুকু তুলে ধরতে,

আপনারাও বিশেষত যাঁরা সদ্য চল্লিশ পেরিয়েছেন অথবা প্রায় চৌকাঠে পা রেখেছেন, তাঁরাও অনুগ্রহ করে নিজস্ব মতামত জানিয়ে আমাদের সবাইকে সমৃদ্ধ করবেন।

২

একটু পিছিয়ে যাই। ১৯৮৩ সাল, আমাকে একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক ভাবে এই আবাসিক বিদ্যালয়টি মূলত আর্থিক এবং সামাজিক ভাবে একটু পিছিয়ে থাকা ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকের জন্যেই খুলে দেওয়া হয়। অবশ্য এই উন্মুক্ত ব্যবস্থা চালু হলেও বিদ্যালয়টির খ্যাতি তখনও তার মূল কাজকর্মের জন্যেই ছিল। ফলত অন্যান্য আর পাঁচটি বিদ্যালয়ে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সেই সময় চালু ছিল তার চেয়ে কিছু বেশি ব্যবস্থাই এক্ষেত্রে নেওয়া ছিল। আবাসিক থাকাকালীন বিভিন্ন কারণে, যেমন একাধিক শ্রেণীর ছাত্র, ছাত্রদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণের পার্থক্য (প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, বিদ্যালয়টি শুধুমাত্র একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না, প্রয়োজনানুসারে একাধিক নন-কনভেনশনাল বিষয়ের পাঠদান করা হত, যার মধ্যে ছিল ডেয়ারি, কার্পেন্ট্রি, টেলারিং ইত্যাদি), পৃথক আবাসনে থাকলেও মেলামেশার মধ্যে কোন গণ্ডি ছিল না ফলত এইসব কিছুই বুঝতে পারতাম না। বরং প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা একসাথে সময় কাটানোর সুবাদে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, তার তুলনা মেলা ভার। দীর্ঘ সাত বছর ধরে গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক যেন খানিকটা ধাক্কা খেল বেরিয়ে আসার পরে। আজকের বিচারে অনুন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে এবং একেক জন এক এক দিকে চলে যাওয়ার কারণে কিছু শিথিলতা এসেই গিয়েছিল, তবু যেটুকু এর মধ্যে বাঁচিয়ে চলা যাচ্ছিল, অযাচিত ভাবে সেখানেও এসে উপস্থিত হল এমন একটা অন্য কিছু, যা আমরা বোধ করি কেউই ভাবতে পারিনি বন্ধুত্বের মাঝে চলে আসতে পারে, সেইরকমই কিছু একটা চলে এসে যে চিড় ধরেছিল, তা পুরোপুরি নির্মূল হতে সময় লেগেছিল।

সৌজন্যে – মণ্ডল কমিশন। ১৯৭৮ সালে প্রথম জনতা সরকারের আমলে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে সামাজিক এবং আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের উন্নতিকল্পে এই কমিশন তৈরি হলেও ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্টটি পেশ হলে সেই সময় শুধু নয়, রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন পরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারও রিপোর্টটিকে ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যাপারে কোনও রকম উদ্যোগী না হলেও বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ ১৯৮৯ সালে ক্ষমতাসীন হয়েই রিপোর্টির প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই গোটা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই এর সপক্ষে এবং বিপক্ষে হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। যদিও এই প্রস্তাবগুলি ছিল তফশিলি জাতি এবং উপজাতি ব্যতীত অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যে এবং তফশিলি জাতি এবং উপজাতির জনগণের জন্যে স্বাধীনতার পর থেকেই সংরক্ষণ চালু ছিল, তবু চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে অনুশীলিত এই বিষয়টিই সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে কি এক অজ্ঞাত কারণে অনেক বেশি প্রকট হয়ে উঠল।

ঠিক এই জায়গা থেকেই শুরু হয়েছিল সেই সম্পর্কের ভাঙন, যার উল্লেখ আগে করেছি। খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করতে শুরু করলাম যাদের সাথে একসাথে এতদিন এত সময় একসাথে কাটিয়েছি, তাদের মধ্যে কয়েকজন একটু গুটিয়ে গেল। সংরক্ষণের আওতাধীন নই জেনে আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল, অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে তারা

যেন একটু অপরাধ বোধেও ভুগতে শুরু করল। অথচ মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট থেকে তাদের নতুন করে বিন্দুমাত্র অতিরিক্ত কোনও সুবিধাভোগী হয়ে ওঠার কোনও সুযোগ ছিল না।

এই দুই গোষ্ঠীর যেসব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে সেই সময় দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তাদের অধিকাংশের সাথেই আমার উষ্ণ সম্পর্ক ফিরে এসেছে তবুও আজও আমার কাছে এটা একটা ধাঁধা ঠিক কি কারণে তারা সমবেতভাবে শুধু আমার সঙ্গেই নয়, আরও অনেকের সাথেই এইরকম আচরণে সামিল হয়েছিল। আবার হয়ত এটাও একটা সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত হলেও আমরা নিজেরাই হয়ত এমন কোনও মনোভাবের শিকার হয়ে পড়েছিলাম যা আমাদের বন্ধুদের দূরে ঠেলে দিতে সাহায্য করেছিল।

যথেষ্ট দ্বিধা নিয়েই লেখার এই অংশটি প্রকাশ করলেও এই পর্বটি ছাড়া ৯০-এর দশক অনেকটাই অধরা রয়ে যেত বলেই মনে হয়।

৩

উপস্থিত অনেকেই গুছিয়ে বসে উঠতে পারেনি, যারা বসে ছিল তাদের কারও কারও হাতের বাদামভাজা, পট্যাটো চিপস পুরোপুরি মুখের ভেতরে গিয়ে উঠতে পারেনি, এমন সময় গোটা পর্দা জুড়ে শুরু হয়ে গেল বাইকের স্ট্যান্ট।

বিরতির আগেই ছবির একমাত্র সুপারস্টার নায়ক ঋষি কপুরের মৃত্যু ঘটে গিয়েছে, খলনায়ক পিতাপুত্র অমরীশ পুরি এবং মনীশ বহেল, নবাগতা নায়িকা দিব্যা ভারতী ছবির দখল নিয়ে নিয়েছেন, স্বামীহারা তরুণী নায়িকা, পুত্রহারা সুষমা শেঠ কিভাবে বদলা নেবে এই ঘটনার তা দেখার জন্যে উদগ্রীব দর্শককূল, এমন সময়েই প্রবেশ উস্কো-খুস্কো লম্বা চুলের অধিকারী একটু খয়াটে চেহারার এক তরুণের। ঠোঁটে বিনোদ রাঠোরের কণ্ঠ – কোই না কোই চাহিয়ে প্যার করনেওয়ালা

অনেকেই যাঁরা টিভি সিরিয়ালের সাথে খুব বেশি পরিচিত নন, তাঁরা আশেপাশে খোঁজ নিতে শুরু করেছেন

- কে ভাই ছেলেটা?

- আরে ওই ছেলেটা সিরিয়াল করে। ফৌজি, সার্কাসে করেছে

- ওহ, সিরিয়াল করে

একটু যেন হতাশ ভাব গলায়। এর আগে সিরিয়াল থেকে উঠে আসা প্রায় সবাইই বড়পর্দায় কোনও রকম দাগ না কেটেই হারিয়ে গেছে। কে নেই সেই তালিকায়? আপামর ভারতবাসী যে সিরিয়াল দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, সেই রামায়ণ-মহাভারত-এর কথাই ধরুন না। পেরেছিল কেউ? এর দ্বারাও হবে না।

কিন্তু হল। এর দ্বারা হল। প্রথম ছবি 'দিওয়ানা'-তে অর্ধেক অংশে মুখ দেখালেও অচিরেই সেনসেশন হয়ে উঠলেন এই দ্বিতীয় নায়ক। তৎকালীন ধারানুযায়ী কলেজ-পড়ুয়ার নিটোল প্রেমের ছবিতে আত্মপ্রকাশ না করে বলিউডের চিরাচরিত খিচুরি ছবিতে সামনে এলেন শাহরুখ খান। পরের ছবি উর্মিলা মাতন্ডকরের বিপরীতে 'চমৎকার' বক্স অফিসে সেভাবে সাফল্য না পেলেও বাঁধ ভাঙল 'বাজিগর'-এ এসে। টিকিটের কালোবাজারী ফুলেফেঁপে উঠল তৃতীয় খানের নামেই।

এই 'বাজিগর' ছবি অবশ্য আরও একজনের জন্যে মাইলস্টোন হয়ে রইল। তিনি হলেন কাজল। আপাদমস্তক ফিল্মি পরিবারের কন্যা হয়েও এর আগে 'বেখুদি' নামক একটি চূড়ান্ত ফ্লপ ছবির অধিকারিণী এবং প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করা শাহরুখ খানের জুড়ি গোটা নব্বই দশক জুড়ে কাজল-শাহরুখ জুটির একাধিক ছবি প্রযোজকের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে তুলল। প্রথম ছবির সাফল্যের পরে আমির খান-জুহি চাওলা জুটির ব্যর্থতা, প্রায় পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া অনিল কপূর – মাধুরী দীক্ষিত এবং একটিমাত্র ছবিতে সফল হয়েই ভাগ্যশ্রী-র ডি-ফ্যাক্টো অবসরের সিদ্ধান্ত, বলিউডে মূল ধারায় জুটির জায়গাটা এই সময় এমনিতেই খালি পড়েছিল, ফলে সব মিলিয়ে জুলিয়ে ফাঁকা জমিতে মৌরসিপাট্টা গেড়ে ফেললেন এই দুজন।

অবশ্য এই সময়ের মধ্যে উভয়েই অন্য নায়ক বা নায়িকার সাথে জুটি বাঁধলেও 'ইয়ে দিল্লাগি', 'গুপ্ত', 'রাজু বন গয়া জেন্টলম্যান' এবং 'ডর' –এর মতো কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া আর কেউই অন্তত ব্যবসার নিরিখে এদের একত্রে অভিনীত 'করণ অর্জুন' কিংবা 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে'-র আশেপাশে পৌঁছতে যে ব্যর্থ হল শুধু নয়, রিয়েল লাইফ হিরো অজয় দেবগণের সাথে কাজল-এর অনস্ক্রিন কেমিস্ট্রিও একই পথে সামিল হল। এমনকি ববি দেওল-রানী মুখার্জির দুয়েকটা ছবি সাময়িক সাফল্য পেলেও সেভাবে দানা বাঁধল না। ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল ছয় বছরে মোট চারটি ছবির প্রত্যেকটিই তুমুল সাফল্য পেল যার দৌলতে ভারতের সিঙ্গল স্ক্রিনের ইতিহাসে এই জুটিই শেষ সফল জুটি হিসেবে নিজেদের নাম তুলতে সক্ষম হলেন। এই শাহরুখ-কাজল জুটি গোটা ৯০-দশক জুড়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী মাতিয়ে তুলতে পেরেছিল, সেই বিষয়ে খুব সম্ভবত সবাই একমত হবেন।

৪

বেশ কিছু ঘটনা সবসময়েই এইরকম থাকে যে একটু আগে শুরু হলেও তার এফেক্ট পেতে পেতে সময় গড়ায় এবং চূড়ান্ত রূপ ইতিহাস সৃষ্টি করে। এইরকমই একটি হল ভারতে পেপসি-কোক দ্বৈরথ যা গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে ভারতবাসীরা কোকের স্বাদ পেলেও পেপসির স্বাদ পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। এখনও মনে আছে, পেপসি আসছে এই ধুয়োটা ওঠার পরেই একদম প্রথম প্রথম পেপসি বলতে বোঝানো হত, একটু মোটা প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভেতরে একটি রঙিন বরফের লাঠি জাতীয় একটি জিনিস। যতদিন চেখে দেখিনি, ততদিন এই স্বাদটিকে সুস্বাদু মনে

হলেও, প্রথমবার খাওয়ার পরে বুঝেছিলাম, স্বাদটি কিছুতেই সবচেয়ে কমদামী কাঠি আইসক্রিমের চেয়ে বেশি ছিল না।

যাই হোক, পেপসি আসছে – খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ছেয়ে গেল অক্ষয়কুমার এবং জুহি চাওলার ছবিতে, হতবাক হয়ে সবাই দেখতে পেল বসার ঘরে টিভিতে তরুণ-তরুণীদের হার্টথ্রব দুই সুপারস্টার নেচে গেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে পেপসি আসলে একটি সফট ড্রিঙ্কস। তার সাথে তৎকালীন বাজারচলতি পেপসি-র দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, টিআরপি-র নিরিখে পেপসির সেই বিজ্ঞাপনী প্রচার আজকের দিনের যে কোনও আচ্ছা আচ্ছা মেগাসিরিয়ালের টক্কর নেওয়ার ক্ষমতা রাখত।

এর আরও চার বছর পরে ১৯৯৩ সালে তুলনামূলক ভাবে অনেক নিঃশব্দে কোকাকোলা-র প্রত্যাবর্তন ঘটলেও অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিশ্বব্যাপী পেপসি-কোক ডুয়েল সীমান্ত পেরিয়ে এসে ভারতে ঘাঁটি গেড়ে বসল। প্রথম ধাক্কাতেই বেশ কিছু বাজারচলতি নরম পানীয় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার জায়গায় পেপসি, কোক এইসব শব্দ সবার মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করল, প্রথম সারির ক্রিকেটার, নামী বলিউডি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই এই দুই শিবিরের কোনও না কোনও একটাতে নাম লিখিয়ে ফেললেন।

কিন্তু মূল পর্ব তখনও কিছু বাকি ছিল। যা দেখা গেল আরও তিন বছর পরে ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা একত্রে আয়োজিত আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের সময়। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ক্রিকেটপ্রেমী আপামর ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে বেশ আলোড়ন তুলে পেপসিকে পেছনে ফেলে এই মেগাইভেন্টের অফিসিয়াল স্পন্সরের তালিকায় কোক নাম তুলে ফেললেও সেই সময় আইকন ক্রিকেটারদের অধিকাংশই ছিলেন বিপক্ষ শিবিরে। সেই বছরই প্রথমবার উপমহাদেশে একটানা এতদিন ধরে দিনরাতের ক্রিকেট খেলার আসর বসেছে, খেলোয়াড়দের পরনে রঙিন জামা, বলের রং সাদা। এসবই তো মূল ক্রিকেটের পরিপন্থী ! যতই দশ বছর আগের ১৯৮৫ সালের বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ থেকে দিনরাতের ক্রিকেট দেখে দেখে ততদিনে এসব ক্রিকেটপ্রেমীদের গা-সওয়া হয়ে যাক না কেন এই ঘটনাকে সামনে রেখেই ম্যাচ চলাকালীন টিভির বিজ্ঞাপন বিরতিতে আছড়ে পড়তে থাকল – নাথিং অফিসিয়াল অ্যাবাউট ইট। দর্শক বুঝে গেল – দুনিয়াতে পেপসি জ্ঞান, পেপসি ধ্যান। ফলাফল – অফিসিয়াল স্পন্সর ঝড়ের মুখে প্রায় শুকনো খড়কুটোর মতোই উড়ে গেল। শত্রুপক্ষের এই চালে বোধহয় কোকাকোলাও খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অতএব যে সামান্য কিছু বিজ্ঞাপন তাদের দেখা যাচ্ছিল তা কারও মনে সেভাবে রেখাপাত করতে ব্যর্থ হল। মনে হয় বিশ্বক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা নয়, উপমহাদেশের ক্রিকেটকে বুঝতে প্রকৃতই সক্ষম হয়েছিল পেপসি, আদ্যন্ত একটি কর্পোরেট সংস্থা।

এই ঘটনাটির ফলে অবশ্য আইসিসির স্পন্সরশিপ সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজি পাল্টানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল এবং অচিরেই তাই হল। তারা কড়া পদক্ষেপ নিল অ্যাম্বুশ মার্কেটিং রুখতে। এর সাথে আরও যেটা হল এই 'অ্যাম্বুশ মার্কেটিং' শব্দবন্ধটি জনসাধারণের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অর্থাৎ একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যেটা থেকে শুধুমাত্র খেলার মজা নেওয়ার কথা ছিল, উপভোগ করার কথা ছিল দক্ষ খেলোয়াড়দের কেরামতি, বাণিজ্যের কল্যাণে তা পরিচিত করিয়ে দিয়ে গেল এমন একটি শব্দবন্ধের সাথে যার সাথে অন্তত সেই সময় রোজকার জীবনযাত্রার কোনও সম্পর্ক ছিল না।

মুক্তমনের বিদায়

রুদ্র রোদ্দুর

ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০১৫

আজও তবু রক্ত চাই
দিয়েছি তো বহু যুগ ধরে
অজস্র শতাব্দী জুড়ে সারা বিশ্বে এখানে ওখানে
অবিশ্বাসী মুছে গেছে
একে একে পৃথিবীর বুকে
অবিশ্বাসের পাড়ি তবু চলে স্রোতের উজানে।

রক্তবীজের ঝাড়
রক্ত দেখে ভয় পেলে চলে?
কলমে ভরব তাই, লিখে যাব, দ্বিগুণ প্রত্যয়
রক্ত দেব ততদিন
যতদিন শ্বাসরুদ্ধ নয়
মুক্তমনের ক্ষেত, রক্তে আরো উর্বরাই হয়।

কবিতার সাথে আমি কখনো কোন কথা লিখিনা। আজ লিখছি কারণ কিছু মানুষকে চোখে আঙ্গুল না দিয়ে বোঝানো যায় না, দিলেও কতটুকু যায় সে সন্দেহ থেকেই যায়। অভিজিৎ রায়ের লেখা যে অনেক পড়েছি এমন নয়। থেকে থেকে যা চোখে পড়েছে, তিতুমীর কে নিয়ে লেখা, হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার নিয়ে লেখা ছাড়াও প্রেমের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ অথবা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো কে নিয়ে লেখাও। যে শ্রেণীর মানুষের অভাব আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি, কোন রকম বাছবিচার না করে সত্যকে বলিষ্ঠভাবে পরিবেশন করা।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের প্রচার এবং প্রসার সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তসলিমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার যে প্রয়াস বাংলাদেশের মৌলবাদীরা করেছিল, সে কথা জেনেছি অনেক বড় হয়ে। হুমায়ূন আজাদের উপর হামলা ইত্যাদির সময়ও তেমন কিছু জানতে পারিনি কোনদিন। প্রথম ভাসা ভাসা আভাস পাই শাহবাগ আন্দোলনের সময়। থাবা বাবার কথা জানতে পারলেও তার লেখার সাথে পরিচিত ছিলাম না সেই অর্থে। আসিফ মহিউদ্দীনের লেখার সাথে পরিচিত হয়েছি, কিন্তু তাও তাঁর উপর হামলার পরেই। অভিজিৎ রায় আমার দেখা প্রথম বিশ্বাসের বলি, যিনি চোখের সামনে এই ছিলেন এই নেই, শুধুমাত্র তাঁর অবিশ্বাসের কারণে। যুক্তির বিরুদ্ধে এই একটিই তো পন্থা অবলম্বন করে এসেছেন যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীর নানা মতের নানা ধর্মব্যবসায়ীরা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশ ভারতকে অনেকে উদারপন্থী বলে থাকেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্বের ইতিহাস ঘাঁটলেই তো আমরা দেখতে পাব নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যা। আমরা দেখতে পাব কি ভাবে ভারতীয় যুক্তিবাদী সংস্থার প্রধান সনল এডামারকুকে, কিছু বুজরুকি ফাঁস করে দেওয়ার কারণে, নিজের দেশ ছেড়ে ফিনল্যান্ডে কাটাতে হচ্ছে, ধর্ম অবমাননার দায়ে। অতীত ইতিহাস এরকমই আর অজস্র ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে আছে, শুধু আমাদের দেশে নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে।

এই হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করার পাশাপাশি দাবী জানাচ্ছি ফাঁসির, না এই মৌলবাদী হত্যাকারীদের নয় কেবলমাত্র; এই সমগ্র মৌলবাদের। এই পৃথিবীর মুখ থেকে মুছে ফেলার দাবী জানাচ্ছি এই চিন্তার, এই মানুষের কণ্ঠরোধ করার ভাবনার, যেই মতবাদের উপর ভিত্তি করে কলমের মাধ্যমে প্রকাশিত সত্যের উপাসক মুক্তমনাদের হত্যার নিদান দেওয়া যায়, তার। এই দাবী কয়জন শাসক মেনে নেবে সারা বিশ্ব জুড়ে সে ব্যাপারে অবশ্য আমি যথেষ্ট সন্দিহান। কাজেই এই গুরুদায়িত্ব পালনের ভার বর্তায় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ওপরেই।

লড়াই কিন্তু এভাবে থেমে যায় না, যতই হত্যাকারীদের দল আশাবাদী হন না কেন। অভিজিতের প্রতিটি রক্তের কণা থেকে জন্ম নেবে আরো শত সহস্র সত্যবাদী, স্পষ্টবক্তা। সেই রক্ত দিয়েই লিখবে সত্যের কথা। মৃত্যু মানে থেমে যাওয়া নয়, এগিয়ে যাওয়া সত্যকে আরো দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে, কারণ সত্যই হবে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র, যাদের বসবাস মিথ্যার দ্বারা সৃষ্ট মায়ার প্রাসাদে।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।"

ক্রিকেটের কুমার - ব্যাট-বলের বাইরের বাইশ গজে

সৌরদীপ

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৫

সাউথ আফ্রিকায় সিরিজ খেলতে গেছেন। টেস্ট চলছে। পেশায় উকিল বাবা একটা ফ্যাক্স পাঠালেন। একজন টিমমেট খবর দিল। তিনি চিন্তিত হলেন, ব্যাপারটা কি? তবে কি বাড়িতে কারুর কিছু হল? তা হলে তো বাবা ফোন করতেন। যাই হোক। ফ্যাক্সের কাগজটা আনানো গেল। দেখলেন, ক্রিকেট-বিষয়ক একটা বইয়ের একপাতা। তাতে ব্র্যাডম্যানের কিছু কোটের নিচে দাগ মেরে তলায় বাবা লিখেছেন, পরের ইনিংসে ব্যাট করার সময় এইভাবে ভুলটা শুধরে নিও।

বাবাকে সারাজীবন এইভাবেই পেয়েছেন কুমার সঙ্গাকারা। প্রশ্রয়, আবার সমালোচক। উইকেটকিপার হয়েছিলেন নেহাত টিমে ঢোকার তাগিদেই। সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ডে সিলেকশনের সময় গেছেন, জাতীয় কোচ সেখানে উপস্থিত। সবাই ব্যাটসম্যান আর বোলার বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন। কোচ তখন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিপার কেউ নেই? সঙ্গার তখনও চান্স হবে কিনা জানা নেই। বুদ্ধিমান ছেলেটি এই সুযোগে হাত তুলে দিল। এইভাবেই শুরু। আর শেষ হবে ওয়ান ডে'তে এখনও অবধি সবচেয়ে বেশি আউট করতে পারা কিপার হিসেবে।

২০১১ সাল, ৪ জুলাই। লর্ডসে এমসিসি স্পিরিট অফ ক্রিকেট-এর কাউড্রি লেকচার দিতে উঠলেন সঙ্গাকারা। সদ্য ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েছেন, কিন্তু তখনও শ্রীলঙ্কা টিমের ফুলটাইম সদস্য, কাউড্রি লেকচারের ইতিহাসে তরুনতম এবং একমাত্র বক্তা যিনি প্রাক্তন নন। দেড় ঘন্টার বক্তব্যের শুরুতে প্রাজ্ঞ ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরলেন দেশের ক্রিকেট ইতিহাস, তারপর উঠে এল শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত অধ্যায়। "দাঙ্গার ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তাড়া করে বেড়ায় আমাকে। কতই বা বয়স আমার তখন, ছয় বছরও হয়নি। প্রায় ৩৫ জন বন্ধুর পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। ইস্কুল নেই, সবাই বাড়িতে আর আমার কাছে সেসব ছিল আনন্দের, কারণ একটি ছয় বছরের শিশুর কাছে বন্ধুদের কাছে পাওয়ার থেকে বড় কিছু আর হয় না। বাড়ির পিছনে মাঠে খেলতাম, কিন্তু মাঝেমধ্যেই খেলা ছেড়ে লুকিয়ে পড়তে হত, যখন গুণ্ডাবাহিনী তল্লাশি চালাতে আসত বাড়ি বাড়ি", বলে চলেন তিনি।

তারপর আসে জীবনের দুই কঠিনতম মুহূর্তের কথা। বক্সিং ডে, ২০০৪। "আমরা তখন নিউজিল্যান্ডের মাঠে ওয়ান ডে খেলছি। ড্রেসিংরুমে সনতের (জয়সুরিয়া) ফোন বাজল, মেসেজ এসেছে, সামুদ্রিক ঢেউতে নাকি শ্রীলঙ্কার কিছু অংশে বন্যা দেখা দিয়েছে। প্রথমে পাত্তা দিই নি, ভেবেছি এমন তো হয়েই থাকে। কিন্তু খেলা শেষে হোটেলের ঘরে ফিরে টিভি চালিয়ে যেন মাথায় বাজ পড়ল! ৩১ ডিসেম্বর রাত্রে কলম্বোতে নামলাম, সাধারণত যে রাত আলোয় ঝলমল করে, সেই রাতে গোটা কলম্বো শহর অন্ধকার। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব। মুরলীধরণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার ছেলে। সে দেখি মোবাইলে নম্বর ধরে ধরে ফোন করা আরম্ভ করল। সবাই যে যার পরিবারের খবর পেলাম। তারপর একটু গুছিয়ে নিয়ে শুরু হল আমাদের ডিউটি। মুরলী দেশবিদেশে ফোন করতে লাগল ত্রাণের সাহায্য চেয়ে, ওর উদ্যোগে আমরা শুরু করলাম ত্রাণ সংগ্রহের কাজ। সমস্ত উপকূল অঞ্চলে ঘুরতে লাগলাম, চোখের

সামনে দেখলাম দুর্যোগ কিভাবে এলটিটিই আর আর্মির মত যুযুধান দুপক্ষকেও হাতে হাত মিলিয়ে দিতে পারে"। যে মাঠে সঙ্গা জীবনের প্রথম টেস্ট ও ওয়ান ডে খেলেছেন, এমনকি জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি যে মাঠে, সেই গল স্টেডিয়ামটাই ধ্বংস করে দিয়েছিল সুনামি।

এতদিন ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশে থেকেও সেভাবে সরাসরি বোমাগুলির মধ্যে কখনও পড়েননি সঙ্গা। কলম্বোর মানুষ সেসবের মধ্যেই জীবনের অন্য রঙ খুঁজে নিত। কিন্তু কঠিনতম চ্যালেঞ্জ আসে ২০০৯ সালের মার্চে। "লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্ট, তৃতীয় দিন। সেদিন আমাদের বাস হোটেল থেকে একটু আগেই ছেড়েছিল। ভেতরে তুমুল হট্টগোল, ফাস্ট বোলাররা নিজেদের সমস্যার কথা আউড়াচ্ছে। হঠাত চারদিক থেকে একটা পটকা ফাটার আওয়াজ এল। সামনে থেকে কেউ একজন চিৎকার করল, 'গুলি চলছে, সবাই মেঝেতে শুয়ে পড়ো'। দুদ্দাড় করে যে যার ঘাড়ের ওপর পারল শুয়ে পড়ল। বাসটা থেমে গেছে। তারপরেই কানে এল, প্রবল শব্দে গুলিবৃষ্টির আওয়াজ। মাহেলা পিছনে ছিল, ওর চিৎকার শুনলাম, 'আমার পায়ে গুলি লেগেছে!' আমি ছিলাম থিলানের পাশে। ওর থাইতে গুলি লেগেছে, আমি ওর চিৎকারে মাথাটা সামান্য তুলে যে ওর পায়ের দিকে উঁকি মেরেছি, আমার কানের পাশ দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে পাশের সিটের গায়ে লাগল। ধাতব শব্দে বুঝলাম, সেকেন্ডের ভগাংশ আগে আমার মাথাটা ঠিক ওইখানেই ছিল। দিলশান চেঁচাচ্ছে, আরে ড্রাইভার করছেটা কি?" শেষপর্যন্ত ড্রাইভার বাসের স্পিড বাড়িয়ে কোনও মতে স্টেডিয়ামে ঢুকিয়ে দেয়। সঙ্গাকারার উপলব্ধি, "সেদিন কিছুক্ষণের জন্য হলেও বুঝেছিলাম, তিরিশ বছর ধরে আমার দেশের লোক ঠিক কেমন জীবন কাটিয়েছে"।

লেকচারের শেষটা ছিল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে বিশ্বকাপ পরবর্তী সময় ধরে চলা দুর্নীতির কথা। আমাদের কাছে এক তামিল ও তাঁর শিষ্যের কল্যাণে সেসব জলভাত, তাই সেদিকে আর না গেলেও চলে। তবে সঙ্গার এই লেকচার ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তৃতার মধ্যে পড়ে। এতটাই যে, পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে পাঠ্যবইয়ের সিলেবাসে অবধি এটাকে রাখা হয়েছে।

ভারতের খেলা দেখার সময় বা ইচ্ছে, কোনওটাই আমার খুব একটা হয় না এখন। তবে যখন দেখতাম, বেশ মনে আছে, শ্রীলঙ্কা ব্যাট করলে জয়সুরিয়া, জয়বর্ধনে আর সঙ্গাকারার ব্যাটিং দেখার জন্য মুখিয়ে থাকতাম। অরবিন্দ ডি'সিলভার খেলা লাইভ দেখিনি, দেখেছি জয়সুরিয়ার। ঝোড়ো ব্যাটিং যাকে বলে। ফর্মে থাকলে গ্যালারিকে রীতিমত সাবধানে থাকতে হয়! আর সঙ্গাকার উল্টোদিকে ঠাণ্ডা মাথায় ধরে খেলার মানুষ। ক্রিজের ওপারে জয়বর্ধনে থাকলে তো কথাই নেই। আপাদমস্তক ভদ্র। স্টার স্পোর্টসের এক অনুষ্ঠানে এক খুদের প্রশ্ন এল, "আপনি কিপার হিসেবে কতটা ইরিটেট করতেন ব্যাটসম্যানকে?" সঙ্গাকারার সরল উত্তর, "যখন নতুন ঢুকেছি, তখন কিপারের এদিকটা নিয়ে বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু পরে বুঝেছি, স্লেজিং জিনিসটা অর্থহীন। তাই কিছুদিন পর থেকেই আমি ঠিক করি, নিজের কাজেই শুধু মন দেব, ব্যাটসম্যানের কাজ সে করুক। থ্যাঙ্কস দ্যাট আই হ্যাভ গ্রোন আপ!"

ক্রিকেটের সম্ভবত সর্বকালের সেরা এক বিজ্ঞাপন। শ্রীলঙ্কার মত ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রে জন্মালেও যিনি আজীবন বিশাল জায়গা জুড়ে থেকেছেন। ম্যাচেই হোক বা ভক্তদের হৃদয়ে। স্বচ্ছতার ভাবমূর্তি। রিটায়ার করার মাসপাঁচেক আগে অবধি বিশ্বরেকর্ড করেছেন, বিশ্বকাপে পর পর চার ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকানোর রেকর্ড। ঝরঝরে ইংরেজি, ডিকশনে অসম্ভব ভাল। শেষ বেলায় মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানানো ছাড়া বোধ হয় আর কিছুই পড়ে থাকে না।

আমিষের মজা

প্রত্যয়

নভেম্বর ২৭, ২০১৫

ষাঁড়ের লেজ দিয়ে মারশালাকে!

নবকলমের নিরামিষাশী বিস্ফোরণের কথা শুনে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। তাই ভাবলুম কিছু আমিষের গল্প বলা যাক। (তাছাড়া সবাই যখন সিরিজ লিখতে শুরু করেছে, আমিই বা বাদ যাই কেন?)

এখনও অবধি রান্নার লেখায় বেশিরভাগই নিরামিষ রান্নার কথা বলেছি। কিন্তু যাই বলুন, ঐ শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায়না, তেমনি নিরামিষ যতই জুত করে রাঁধুন না কেন, তা দিয়ে আমিষের মজাটা রিপ্লেস করা যায়না।

নানারকম অদ্ভুত জিনিসপত্র খেয়ে দেখার শখ ছোটোবেলা থেকেই। মেঠো ইঁদুর, পোকামাকড় থেকে শুরু করে কুমির, ব্যাং সবই খেয়ে দেখেছি একবার করে। সম্প্রতি বাইসন খেয়ে দেখলাম, মন্দ নয়। তবে বীফের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই। অবশ্য মাংস বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন গোরুর মাংস ভাল না ভেড়ার মাংস ভাল এই ধরনের তুলনা একেবারেই অর্থহীন, কারণ দেহের কোন অংশের মাংস, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে (শুধু দামগুলোর দিকে চোখ বোলালেই অনেকটা টের পাওয়া যায়)।

আজ যেটার কথা বলব তার নাম অক্স টেইল, অর্থাৎ ষাঁড়ের লেজ। বেশ সুস্বাদু মাংস। ভাল করে রাঁধতে পারলে তো কথাই নেই। ভেবেছিলাম মারসালা স্টাইলে রান্না করব। মারসালা এক ধরনের ইটালিয়ান ওয়াইন, রান্নাটাও ইটালিয়ান জাতের। কিন্তু করতে গিয়ে মনে হল একটু ইম্প্রোভাইজ করা যাক। সেটা করতে গিয়ে খেতে অসাধারণ হল বটে, কিন্তু যা হল তাকে "অক্স টেইল মারসালা" বললে রন্ধন বিশেষজ্ঞরা আমায় তেড়ে আসবেন। তাই বরং এর নাম দেওয়া যাক "ষাঁড়ের লেজ দিয়ে মারশালাকে!"

"ষাঁড়ের লেজ দিয়ে মারশালাকে!" বানাতে আপনার লাগবে -

৫০০-৬০০ গ্রাম ষাঁড়ের লেজ

১০০-১৫০ গ্রাম ইনোকি (Enoki) মাশরুম (অভাবে অন্য কোনো মাশরুম যা সূক্ষ্মভাবে কাটা যাবে)

১ কাপ চিকেন স্টক

১/৪ কাপ টোমাটো পিউরি

১/২ কাপ মারসালা ওয়াইন

১ চা-চামচ রসুন কুচি

১ চা-চামচ আদা বাটা

২ বড় চামচ কুচি করা শ্যালট (অভাবে পেঁয়াজ)

৪-৫ টি কাঁচা লঙ্কা

১ চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার

পরিমাণ মত নুন, হলুদ, গোলমরিচ এবং সামান্য চিনি

রান্নার কাজ বেশ সহজ। তার আগে দেখে নিন যেন ষাঁড়ের লেজগুলো চাকা চাকা করে কাটা থাকে। সাধারণত এভাবেই বিক্রি হয় দোকানে, কাজেই সমস্যা নেই। পাতলা চাকা হলে ভাল, সিদ্ধ হতে কম সময় লাগে। ইনোকি মাশরুম একধরনের এসিয়ান মাশরুম, সরু সরু সুতোর মত দেখতে। সেগুলোকে আড়াআড়ি কয়েকবার কেটে নিলেই ঝুরি আলুভাজার মত কাটা হয়ে যাবে। অন্য মাশরুম ব্যবহার করলে একটু কষ্ট করে এরকম সূক্ষ ঝুরি ঝুরি বানাতে হবে।

মাশরুমটা আলাদা জায়গায় অল্প হলুদ, নুন আর প্রয়োজনে সামান্য শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভাজা ভাজা করে নিন। অনেকটা ঝুরি আলুভাজার মতই লাগবে দেখতে। এবার একটা পাত্রে সাদা তেল গরম করে তার মধ্যে কুচো রসুন, কুচো শ্যালট আর অক্স টেইল দিয়ে দিন। আদা বাটা দিন। গোলমরিচ গুঁড়ো দিন। একটু নাড়ুন চাড়ুন। তার মধ্যে দিন টোমাটো পিউরি, মারসালা ওয়াইন আর চিকেন স্টক। অল্প আঁচে জলটা মেরে আনুন কিছুটা। সামান্য জলে গুলে দিয়ে দিন কর্ন ফ্লাওয়ারটা, সঙ্গে পরিমাণ মত নুন আর সামান্য চিনি। ঢাকা দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন। মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিন। মনে রাখবেন আদা রসুন বা লঙ্কা খুব বেশি দেবেননা, তাহলে মারসালার ফ্লেভারটা পুরো ঢাকা পড়ে যাবে।

নামানোর পর উপরে ছড়িয়ে দিন ঝুরি ঝুরি মাশরুম গুলো। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

এই রান্না ষাঁড়ের লেজের বদলে অন্য মাংস দিয়েও করা যায়, বা মারসালা ওয়াইনের বদলে অন্য ওয়াইন দিয়ে।

কিন্তু তাহলে আদ্ধেক মজাই মাটি! তাই একটু কষ্ট করে জোগাড় করে ফেলুন এগুলো, আর বানিয়ে ফেলুন "ষাঁড়ের লেজ দিয়ে মারশালাকে!"

শুওরের লঙ্কাকাণ্ড

এবারের আমিষের মজায় হবে লঙ্কাকাণ্ড। হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড নয়, শুওরের!

শুওরের মাংস এমনিতে আমার খুব প্রিয় না। তা হলে কি হবে, শুওরের লঙ্কাকাণ্ড রান্নাটা এতই সুস্বাদু, এইটা সুযোগ পেলেই করে ফেলি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, এই রান্না করতে আপনার লাগবে শুওরের মাংস আর রাশি রাশি লঙ্কা! এছাড়া আর লাগবে -

রসুন কুচি – ৪-৫ কোয়া
গোটা ধনে – দুই চা-চামচ
গুঁড়ো হলুদ – এক চা-চামচ
কর্ন ফ্লাওয়ার – তিন চা-চামচ

পেঁয়াজ কুচি – দুটো বড় পেঁয়াজ
কম ঝাল কোনো লঙ্কা (আমি ব্যবহার করি চাইনিজ গ্রীন পেপার) – ৫-৬টা (না পেলে একটা ক্যাপ্সিকাম)
চিনি – দুই চা-চামচ
লেবুর রস – এক চা-চামচ
নুন – পরিমাণ মত
সাদা তেল – পরিমাণ মত

এই সমস্তের সঙ্গে দেবার জন্য বোনলেস শুওরের মাংস এক কেজি, আর গোটা দশেক কাঁচালঙ্কা। না না, ভয় পাবেন না, যতটা ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে ততটাও হবেনা। বাকিটা পড়েই দেখুন!

প্রথমে শুওরের বোনলেস মাংসটা ছোট ছোট পিস করে কেটে রাখুন। ধনে একটু শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিন। ধনেগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো আর কর্নফ্লাওয়ার একসাথে মিশিয়ে মাংসের গায়ে মাখিয়ে রাখুন। প্যানে সাদা তেল গরম করে রসুন আর পেঁয়াজটা লালচে করে ভেজে নিন। এরপর প্যানের মধ্যে দিয়ে দিন ওই মাংসটা। নাড়তে থাকুন। শুকনো হয়ে এলে লেবুর রস দিন, প্রয়োজনে অল্প জল। নুন চিনিও দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ঢাকা দিয়ে অল্প আঁচে সিদ্ধ করুন। প্রয়োজন মত মাঝেমাঝে সামান্য জল দেওয়া যেতে পারে।

অন্য একটি পাত্রে অল্প তেলে ৫ মিনিট ভেজে নিতে হবে সমস্ত লঙ্কা (কাঁচালঙ্কা আর কম-ঝালের লমকা)। লঙ্কা একটু কচকচে থাকতে নামিয়ে নিতে হবে। ওদিকে মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলে এবং তেল আলাদা হয়ে গেলে সবার শেষে

ওপরে দিয়ে দিন লঙ্কা গুলো। একটু ভাল করে মিশিয়ে আরও মিনিট খানেক বসিয়ে রেখে নামিয়ে নিন। পাত্রের ওপর ঢাকা দেওয়াই থাকুক কিছুক্ষণ, যাতে লঙ্কার ফ্লেভারটা ভাল করে ছড়িয়ে যায় রান্নার মধ্যে।

এরপর... না না, গরম গরম খেয়ে ফেলবেন না। বরং ঠাণ্ডা হলে সোজা চালান করে দিন ফ্রিজে। পরের দিন গরম করে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন। একদিন ফ্রিজে থেকে মজে আরো সুস্বাদু হবে।

বিশেষ সতর্কীকরণ – ফ্রিজ থেকে বার করে গরম করার জন্য ওই লঙ্কা শুদ্ধু জল দিয়ে ফোটাবেননা যেন। সবচেয়ে ভাল হয় শুকনো অবস্থায় মাইক্রোওয়েভে গরম করে নিলে। এই নির্দেশ না মানার দরুণ জিভে, পেটে, কিম্বা পরের দিনের টয়লেট পেপারে আগুন লাগলে সে দোষ আমার নয়!!

লঙ্কাকাণ্ড কেমন লাগল জানার জন্য মুখিয়ে থাকলাম!

লিকলিকে চিকেন

শুনলাম এদ্দিন শুধু "নিষিদ্ধ" মাংসের রান্না দিয়েছিলাম বলে অনেকের নাপসন্দ হয়েছে। এদিকে একজন আবার বলল রেড মিট খাওয়া বন্ধ ডাক্তারের নির্দেশে। সব মিলে ভাবলুম এবারে একটু হাল্কা রান্না দেওয়া যাক, যাতে করে ডাক্তার বা ধর্মানুভূতি, কেউই বাধ না সাধে। (শুনেছি এখনো অনেক গোঁড়া বামুনের হেঁসেলে চিকেন ঢোকেনা, সেরকম হলে আমি নাচার!)

ভয় পাবেন না, এই রান্নার জন্য আপনাকে বাজারে গিয়ে লিকলিকে রোগা মুর্গি কিনে আনতে হবেনা। রান্নাটা শুধু হোয়াইট মীট বলেই না, মশলাপাতির দিক থেকে ভাবলেও বেশ হাল্কা আর স্বাস্থ্যকর। কিন্তু এটা খেয়ে স্লিম থাকতে পারবেন, সেই ভেবেও লিকলিকে চিকেন নামটা দেওয়া নয়। আসলে এই রান্নায় চিকেন ছাড়া থাকবে প্রচুর পরিমাণে লিক (Leek)। বিচিত্র সবজির ভাণ্ডারে চাইভ এর কথা বলেছিলাম। সেই চাইভ যদি পেঁয়াজকলির ছোটোভাই হয়, তবে এই লিক হল গিয়ে পেঁয়াজকলির বড়দা। অত্যন্ত উপকারী, হাল্কা মিষ্টি ভাব আছে, আর আছে দুর্দান্ত একটা ফ্লেভার।

মার্কিন দেশে লিক প্রচুর চলে। আমাদের দেশে অত না চললেও একটু খোঁজ করলে পাওয়া যায়। একান্ত না পেলে এই রান্নাটা পেঁয়াজশাকের গোড়ার সাদা অংশটা দিয়ে করা যেতে পারে, তবে ফ্লেভারটা তাতে অন্যরকম হবে।

রান্নার জন্য লাগবে -

বোনলেস চিকেন (ব্রেস্ট বা থাই), খুব ছোটো ছোটো পিস করা – ৫০০ গ্রাম
লিক – ৪-৫টি
গোটা গোলমরিচ – ১০-১২টা, হামানদিস্তা বা গ্রাইন্ডারে থেঁতলে নেওয়া (কোর্স গ্রাইন্ড)
মাখন – পরিমাণ মত

নুন – পরিমাণ মত
চিনি – দু চা চামচ
লেবুর রস – এক চা চামচ

উপাদান দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন, রান্নার প্রণালী খুব সহজ। কিন্তু তার আগে যাঁরা আগে কখনো লিক ব্যবহার করেননি তাঁদের জন্য বলি কিভাবে এটা ধুতে এবং কাটতে হয়। লিক কেনার পর তার সাদা রঙের গোড়া আর সবুজ রঙের পাতা আলাদা করে চিনতে পারবেন। আমরা এই রান্নাটা করব শুধু সাদা অংশটা দিয়ে, কিন্তু তা বলে পাতাগুলো ফেলবেন না। ওগুলো দিয়ে অসাধারণ স্যুপ বানানো যায়। চাই কি, চিকেন একটু বেশি করে কিনে ওই লিকের সবুজ অংশ আর কিছুটা চিকেন দিয়ে সাধারণ ক্লিয়ার স্যুপ বানিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও নানারকম স্যুপে লিকের পাতা দেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে না বানাতে চাইলে কুচি করে ডিপ ফ্রিজে তুলেও রাখতে পারেন।

সাদা অংশটা আলাদা করে কেটে নেবার পর সেটাকে লম্বালম্বি অর্ধেক করতে হবে। এবার সামান্য গরম জলে মিনিট দশেক ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ভাল করে ধুয়ে নিন ওই জলের মধ্যেই। এতে করে লিকের মধ্যে কোনো মাটি থাকলে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। লম্বালম্বি কাটাটাই ট্রিক। ধোয়া হলে এবার আরো একটু ছোটো করে কুচিয়ে নিন। কুচানোর পর নিচের ছবির মত দেখতে হবে।

এবার প্যানে এক কিউব মাখন দিয়ে সেটা গলে গেলে তার মধ্যে লিকের কুচিগুলো দিয়ে দিন। চিকেনের পিসগুলোর থেকে জল একদম ঝরিয়ে রাখলে ভাল হয়। লিক একটু ভাজাভাজা হলে চিকেন দিয়ে দিন। সেটাকেও নেড়েচেড়ে

ভাজতে হবে, যতক্ষণ না একটু লালচে হয়। পিস ছোটো হবার দরুণ সিদ্ধ হতেও বেশিক্ষণ লাগবেনা। মিনিট পনেরোর মধ্যে পুরো ব্যাপারটা ভাজা ভাজা হয়ে এলে তার মধ্যে নুন চিনি আর লেবুর রস দিয়ে অল্প আঁচে পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। রান্না করতে করতে কোনো সময় ভীষণ শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হলে সামান্য জল দিতে পারেন, তবে রান্নাটা শুকনো শুকনোই হবে। নামানোর পর ছড়িয়ে দিন থেঁতলে গোলমরিচ।

ভাতের সঙ্গে খাওয়া যায়, শুধু মুখে খেতেও দারুণ লাগে। আমি সাধারণত স্টার্টার হিসেবেই ব্যবহার করি। এবার বানিয়ে ফেলুন চটজলদি, আর কেমন লাগল জানিয়ে ফেলুন কমেন্ট করে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা

শাক দিয়ে মাছ সত্যিই ঢাকা যায় কিনা সেই গভীর দার্শনিক প্রশ্নটা অনেক দিন ধরে ভাবাচ্ছিল। কোনো গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হলে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখে নাও, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন। তাই কোনো এক শুভ সকালে শাক আর মাছ নিয়ে বসা গেল।

বাড়িতে ছিল কিছু ডাইনোসর কেল (Dinosaur kale)। নাম শুনে হয়তো ভাবছেন এই কেলো করেচে! অত ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু না, স্রেফ এক সাদামাটা সবুজ শাক। সায়েবরা কাঁচাই খায় (কি করে খায় কে জানে), কিন্তু আমি রেঁধেই খাওয়ার কথা বলব। কদিন আগে চীনা দোকান থেকে কিছু পাঁকাল মাছ কেনা ছিল। কিভাবে রাঁধব ভাবতে ল্যাদ লাগছিল বলে এদ্দিন পড়ে ছিল ফ্রিজারের কোনায়। গভীর দার্শনিক রহস্য সমাধানের তাড়নায় সে বেরিয়ে এল ফ্রিজ থেকে। তারপর কি হল জানতে নীচে দেখুন।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে যা যা দরকার -

(১) বেশি করে শাক। আমি কেল দিয়ে করেছি, সুইস চার্ড (Swiss chard) দিয়েও ভাল লাগে। অন্য শাকও চেষ্টা করা যায়। তবে শাকটা একটু শক্ত গোছের হলে ভাল হয়, পালং এর মত নরম ক্যাতক্যাতে শাক দিয়ে ভাল লাগবেনা।

(২) শাকের তুলনায় কম পরিমাণ মাছ। এই পরিমাণের অনুপাত নিজেই ঠিক করুন, সবই আমি বলে দেব নাকি? তবে মনে রাখবেন, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে গেলে কম শাক নিলে কোনোভাবেই হবেনা। বেশ শাক নিলেও হবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই অবশ্য।

(৩) পাঁচ ফোড়ন, একটু বেশি করে। ৪০০ গ্রাম মাছের জন্য ২ টেবিল চামচ মত।

(৪) চার পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা, বা কতটা ঝাল খেতে চান সেই অনুযায়ী।

(৫) পরিমাণ মত নুন, তেল, হলুদ আর সামান্য শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো।

উপাদান দেখে ভাবছেন বেসিক কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসে জগাখিচুড়ি বানিয়ে আবার রেসিপি লিখে পোস্ট করছি? একবার বানিয়ে খেয়ে দেখুন...

উপাদানগুলো হাতের কাছে জড়ো হলে মাছটা ছোটো ছোটো পিস করে ভেজে রাখতে হবে। ভাজার সময় হলুদ, অল্প নুন আর শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর প্যানে তেল দিয়ে পাঁচফোড়ন আর কাঁচালঙ্কা দিন। তারপরে কুচো করে কাটা শাকটা দিয়ে ভাজতে থাকুন। শাক একটু ভাজা ভাজা হলে নুন দিন, নুন মিশে গেলে ভাজা মাছের টুকরো গুলো দিয়ে ভাল করে শাকের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করলেই রান্না শেষ। এরপর শাকের পাতাগুলো হাতা দিয়ে টেনে টেনে এনে মাছের পিস গুলো ঢেকে দিন। ভাত আর মুসুর ডাল দিয়ে মেখে খেতে বেশ লাগে।

ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আসল শাক কাঁচা অবস্থায় যতটা মনে হয়, ভাজলে পরে এতটাই কমে যায়, সব আন্দাজ গুলিয়ে যায়। সে যা হোক, আমি ঢাকতে পারিনি মানে এমন না যে ঢাকা যায়না। একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দিয়ে ডিসপ্রুভ করা যায়, কিন্তু একটা এক্সাম্পল দিয়ে প্রমাণ তো হয়না। তাই, শেষপর্যন্ত গভীর দার্শনিক প্রশ্নটা আনসলভডই রইল। কি বলছেন? তাহলে রেসিপির নামকরণটা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে? মরুক গে! রান্নাটা করুন, প্রাণভরে খান, আর তারপরে এখানে কমেন্ট করে জানান কেমন লাগল। তাহলেই আমি খুশি।

ইয়াসমিন

অহ নওরোজ

সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৫

দিন পাল্টায়।
রোমান আমলের রোদ,
প্রথমে লাল, ধীরে সাদা, অতঃপর কমলা।
কেউ নেশার বুদ কাটিয়ে জেগে ওঠে।
কেউ তন্দ্রা আঁকড়ে নিদ্রা দীর্ঘ করে।
কেউ বা জুয়া-নেশার ভরাডুবিতে
শূন্যে তাকায়।
আমি পূর্ণতা পাই।

যায় যায় করে,
সময় পেরিয়ে যায়।
তবু গির্জার উপরের আকাশ দেখা হল না।
লালচে ইট মেরুন হয়ে গেল,
জলের শহরে ইয়াসমিন ফুটে গেল,
কিন্তু বিবর্ণতা গেল না।
ঘুমিয়ে পড়ল স্বপ্নহীন সংবেদন।
ফিরে এলো না ফাগুনের
পালিশ করা বিকেল।

হে গোলাপি ইয়াসমিন,
ফুটেছ তো নীল পাথরের রাতে,
সরীসৃপ হয়ে হেয়ালি সবুজের বুঝবে কি?
কালোপানির জলফুল না হলে
বাঁশবন ঘেরা শুন্যতা বুঝবে কি করে?
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেখানে
নগ্ন হাইওয়েতে ইথার হয়ে যাওয়া
শতাব্দী পাওয়া যায়।
সেগুলোর শব্দপাপ মাপবে কিরূপে?

আমি জানি।
তুমি সলজ্জ হয়ে জন্মেছ।
মারুতি রঙের টিপকে
নীল গোলার্ধ বলে ভুল কর।
নিক বিষুবরেখা বরাবর বীভৎস হয়ে যাও।
নাম হয় অনামিকা।
তবু নতুন তারাদের বলয় তৈরি হয়।
গ্রহন নাও,
মৃত্যু ব্যাথা দাও।
অবশ্য শব্দের বিস্ফোরণে বধির করে দাও...

ইয়াসমিন,
সমষ্টিক বিপদের সমধান
আমি একাই দিতে পারি।
প্রাচীন আলোয়
ভংকুর আঁধার চিনতে পারি।
কুয়াশায় লেপটে থাকা বোধ,
কাচ বোতামে ফিরিয়ে দিতে পারি।
শব্দে নিমজ্জিত হয়ে স্বপ্নাবিষ্ট হতে পারি...

তাই,
আকাশের পানে আঁখি মেলে
নক্ষত্র খচিত সীমানায় বসে
চলো অগ্রহায়ণের কথা শুনি।
এক দূরবীন দূরে,
যেখানে একটি তারার সাথে
আঁধারের কথা হয়,
সেখানে বলয় গড়ে ফেলি।
কিছুই নিয়মিত নয় ইয়াসমিন।
কেউ তার আশাও করে না।

ডাক

ব্যাকরণ শিং

আগস্ট ৭, ২০১৫

১

কোলাহলটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। অন্তত: ত্রিশ চল্লিশ জন উত্তেজিত লোক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হাতে জ্বলন্ত মশাল, লাঠি, সোঁটা, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে চিৎকার করতে করতে সিংহদরজা অতিক্রম করে দালানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জানালা দিয়ে ওদের দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম, কি দুঃসাহস ওদের। কিছুদিন আগেও ওরা আমার ভয়ে থরথর করে কাঁপত। ওদের বাঁচা, মরা, ওঠা, বসা সবই আমার অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হত। অথচ আজ অদৃষ্টের কি পরিহাস। আমার পা এর তলায় এতদিন যারা পচে মরত, তারাই আজ আমায় মারতে উদ্যত। হ্যাঁ, আমি আমার পরিণতি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আজ এদের হাতেই আমাকে মরতে হবে। এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে কেউই আর বেঁচে নেই। একটু আগেই আমার শেষ সহায়, আমার বিশ্বস্ত লেঠেল গগনকে আমার চোখের সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ওরা। জানালা দিয়ে অসহায় ভাবে দেখা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারিনি। ওদের বাধা দেবার মত কোনও শক্তিই আজ আমার অবশিষ্ট নেই।

আমার হাতে আর বেশী সময় নেই। ওরা আমার ঘরের সামনে এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। এই সামান্য দরজাটা ওদের আর বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দরজা ভেঙ্গে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পরবে। একদিন যাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত, তাঁকে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

তবে এখানেই এর শেষ হবে না। এর প্রতিশোধ আমি নেবই। যাদের জন্যে আজ আমার এই অবস্থা তাদের আমি কখনই ছেড়ে দেব না। কোনওকালেই ছেড়ে দেব না।

২

বহুদিন বাদে কোলকাতার কোলাহলমুখর সদাব্যস্ত পরিবেশের থেকে বহুদূরে, এই ছোট্ট মফস্বল শহরটাতে এসে সত্যিই ভীষণ ভাল লাগছে। সেই বিয়ের ঠিক পরে একবার বউকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। তারপর দেখতে দেখতে আড়াইটা বছর কেটে গেছে। কোলকাতার বাইরে আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। খালি বাড়ি থেকে ক্লিনিক, ক্লিনিক থেকে হাসপাতাল আর হাসপাতাল থেকে বাড়ি, এই সাইক্লিক মোশন-এ ঘুরতে ঘুরতেই এতগুলো দিন কেটে গেছে। আসলে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সেই কোলকাতার এক অন্যতম বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট হয়ে যাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ নতুন গাড়ী বা নিউটাউনে তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট কিনে দিতে পারলেও, সুন্দরী বউকে

সময় এতদিন একেবারেই দিতে পারিনি। অদিতি অবশ্য এটা নিয়ে আমাকে কোনও দিন কোনও রকম অভিযোগ করেনি। কিন্তু আমি-ই মনে মনে অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যদি কয়েকদিনের জন্যে ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও একটা ঘুরে আসা যেত, তাহলে বেশ ভাল হত।

তাই পরশু বাবা যখন ব্রেকফাস্টের সময় বলল যে দেশের বাড়ি থেকে জ্যেঠু ফোন করে বলেছে যে পৈত্রিক আমবাগানটা বিক্রির ব্যাপারে বাবাকে একবার যেতে হবে, তখন আমি-ই প্রস্তাবটা দিলাম যে বাবা এখানেই থাকুক, বাবার বদলে আমি-ই বরং অদিতিকে নিয়ে একবার দিন তিনেকের জন্যে দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। তবে প্রস্তাবটা দিয়েই একবার মনে হয়েছিল যে অদিতি কি পারবে কোলকাতা ছেড়ে ওখানে গিয়ে থাকতে? যে মেয়ে কোলকাতার পশ এলাকায় বড় হয়েছে, ছোটবেলা থেকে কনভেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করেছে, তার পক্ষে নিশ্চয়ই হঠাৎ করে কোলকাতার বাইরে এরকম একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে ভীষণ অসুবিধা হবে। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম ওর উৎসাহ দেখে। অফুরন্ত এনার্জি নিয়ে সুটকেস গোছানো, কাজের মাসীদের ইন্সট্রাকশন দেওয়া, বাবাকে একলা থাকাকালীন যে যে ওষুধগুলো খেতে হবে, সেগুলো লিস্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া, দেশের বাড়িতে প্রথমবার যাচ্ছে বলে ওখানে জ্যেঠু, জ্যেঠীমনি, বড়দা, বৌদি আর ওদের পাঁচ বছরের ছেলে বুবুনের জন্যে একগাদা গিফ্ট কেনা এইসব কাজগুলো করল দুদিন ধরে। তারপরে আজ সকালে চা খেয়েই দুজনে নতুন কেনা অল্টোটায় করে বেরিয়ে পড়লাম।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে কোলকাতা থেকে প্রায় আড়াইশ কিমি দূরে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগলো চার ঘণ্টার একটু বেশী। এখানে পৌঁছতে না পৌঁছতে সবার আদর আপ্যায়ন, এতদিন না আসার জন্যে অভিযোগ, সামান্য জলখাবারের নামে ভুরিভোজ এসবের পাট চোকাতে চোকাতেই বেজে গেল সাড়ে বারটা। বুঝলাম আমি, ডঃ অর্ণব সেনগুপ্ত, কোলকাতায় যতই বিখ্যাত হয়ে যাই না কেন, এঁদের কাছে এখনও সেই ছোট্ট বাবাই-ই রয়ে গেছি। আর বিশ্বায়নের যুগে এই ছোট্ট মফস্বল শহরটা যতই আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করুক না কেন, এখানকার মানুষগুলোর আন্তরিকতা রয়ে গেছে সেই আগেরই মত।

আশ্চর্য মেয়ে এই অদিতি। প্রথমবার এখানে এসেই এমনভাবে সবার সাথে মিশে গেল, যেন এঁদের সাথে ওর কতদিনের পরিচয়। একবার জ্যেঠীমনির জন্যে কেনা হারটা জ্যেঠীমনির গলায় পরিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণেই বৌদির সাথে কোলকাতার নতুন শপিং মলগুলোর গল্প জুড়ে দিচ্ছে। এই বুবুনের হাত ধরে দৌড়ে পুকুরপাড় থেকে ঘুরে আসছে, পরমুহূর্তেই জ্যেঠু আর বড়দার সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করছে। সত্যিই এখানে এসে অদিতি যেন আবার নিজের কলেজের দিনগুলোতে ফিরে গেছে।

দুপুরে খেতে বসে বড়দার কাছে একটা খারাপ খবর শুনলাম। ছোটবেলায় যখন এখানে আসতাম, তখন আমি আর বড়দা পাশের বাড়ির মহিমজ্যেঠুর তিন ছেলের সাথে খুব খেলে বেড়াতাম। মহিমজ্যেঠুর ছোটছেলে পিনাকীদা ছিল আমার থেকে দুই বছরের বড়। সেই পিনাকীদা পড়াশোনার পর দিল্লীতে সেটল্ করেছিল। ওখানকারই এক বাঙ্গালী মেয়েকে সে বিয়ে করে। বিয়ের পর বউকে মানে অনন্যাবৌদিকে নিয়ে সে প্রথমবার এসেছিল নিজের বাড়িতে বেড়াতে। কিন্তু এখানে এসে প্রথমদিনেই বৌদি হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় সেন্সলেস অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করানো হয় স্থানীয় হাসপাতালে। রাত হয়ে যাওয়ায় ঠিক করা হয় পরেরদিন তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে কোলকাতায়।

কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড। পরেরদিন সকালে দেখা যায় বেড খালি, পেশেন্ট উধাও। যদিও সরকারী হাসপাতাল, তবুও এতগুলো লোকের চোখের সামনে দিয়ে একজন কোমায় থাকা পেশেন্ট এর এরকম নিরুদ্দেশ হওয়াটা, এই শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঘটনার পরে প্রায় দুবছর কেটে গেছে, এখনও পর্যন্ত অনন্যাবৌদির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ বহুকাল আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। এতদিন কেটে যাবার পরেও এখনও ছোট এই শহরটার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসেবে থেকে গেছে এই ঘটনাটা।

মনে পড়ে গেল আগে পিনাকীদার সাথে আমার কি ভাবই না ছিল। দুজনের বয়সটা কাছাকাছি হওয়ায়, মনের মিলটাও ছিল সবথেকে বেশী। আজ যদিও বহুদিন হল পিনাকীদার সাথে কোনও যোগাযোগ নেই, তাও খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ঠিক করলাম, সন্ধ্যেবেলা অদিতিকে নিয়ে একবার ঘুরে আসব মহিমজ্যেঠুদের বাড়ি থেকে।

৩

বিয়ের পর আড়াইটা বছর ধরে খালি নিউটাউনে শ্বশুরবাড়ি থেকে সল্টলেকে বাপের বাড়ি আর উল্টোটা করে করে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ইচ্ছে থাকলেও ওর সাথে কোথাও বেড়াতে যাবার সুযোগ হয়ে উঠছিল না। সবথেকে মন খারাপ হত যখন ফেসবুকে অন্যান্য বান্ধবীদের, তাদের বরেদের সাথে আন্দামান, রাজস্থান, কেরল এমনকি বিদেশেও ঘুরে আসার ছবিগুলো দেখতাম। বন্ধুত্বের খাতিরে লাইক করতে বাধ্য হলেও, মনে মনে একটু হিংসে যে হত না, একথা বলাটা ঠিক হবে না। কিন্তু কিই বা করা যাবে? মনে মনে ভাবতাম সবার তো আর আমার মত কোলকাতার বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডঃ অর্ণব সেনগুপ্তর স্ত্রী হবার সৌভাগ্য হয় না। আমাকে তো এটুকু মানিয়ে নিতেই হবে। এরকম সময় ও যখন হঠাৎ করে ওদের দেশের বাড়িতে যাবার প্রস্তাবটা দিল, মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, ঈশ, অন্য বান্ধবীদের কপালে আন্দামান, কেরল আর আমার বেলায় কিনা দেশের বাড়ি? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এটাই বা কম কিসে? ক'জনের আর পল্লিবাংলায় বেড়াতে যাবার সুযোগ হয়? ওখানে গিয়েই নাহয় কয়েকটা সেলফি তুলে পোস্ট করে দেব আমার ফেসবুক ওয়ালে। সাথে রবীন্দ্রনাথকে কোট করে "ধানের শীষে" "শিশির বিন্দু" এরকম জাতীয় কিছু একটা লিখে দিলেই অদিতি সেনগুপ্তের প্রোফাইলটা সুপারহিট হয়ে যাবে।

কিন্তু এখানে এসে দেখলাম না এলে সত্যিই ভীষণ ভুল করতাম। এত সুন্দর এই জায়গাটা। কোলকাতার দমবন্ধ করা পরিবেশের বাইরে স্নিগ্ধ ছিমছাম ছোট্ট এই শহরটায় এসে আমার সত্যিই মনটা ভরে গেল। এখানকার আকাশ যেন আমাকে বুকে জড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। বুক ভরে শ্বাস নিলাম এখানকার দূষণমুক্ত বাতাসে। শরীর মন জুড়িয়ে গেল। আর এখানকার লোকেরাও সবাই কত আন্তরিক। কত আদর করে এঁরা আমাকে কাছে টেনে নিল। জ্যেঠু, জ্যেঠীমনি যেন আমারই আরেক বাবা, মা। বৌদি যেন আমার নিজেরই দিদি। বড়দা তো আমরা আসছি বলে ছুটিই নিয়ে নিল। আর ছোট্ট বুবুনটা সেই যে আমার কোলে এসে বসলো, নামার আর নামই করছে না। এখানে এসে আমি যতটা আনন্দ পেলাম, আমার মনে হয় না, আন্দামান বা কেরলে গিয়ে এর থেকে বেশী আনন্দ হত।

Déjà vu বলে একটা শব্দ এতদিন বইতেই খালি পড়েছি। কিন্তু এখানে এসে যেন শব্দটা বাস্তবে ফিল করলাম। কেন জানি না, সর্বক্ষনই মনে হচ্ছে এই জায়গাটা যেন আমার কত পরিচিত। আমি আগেও যেন এসেছি এখানে। এখানকার আকাশ, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি সবই যেন কতদিন ধরে আমার আসার অপেক্ষা করে বসে ছিল। এই বাতাসে যেন আমি আগেও শ্বাস নিয়েছি। এখানকার মাটিতে আমি আগেও পা ফেলে হেঁটেছি। এখানকার গাছের তলায় বিশ্রাম করেছি। এই জায়গাটার প্রতিটা ইঞ্চিই যেন আমার চেনা। অথচ মজার ব্যাপার হল, আগে এখানে আসা তো দূরের কথা, এরকম যে একটা জায়গা আছে, সেটা আমি বিয়ের আগে জানতামই না।

হঠাৎ করে কেন জানি মনে হল, এত সুন্দর একটা শহর। এখানে একটা নদী থাকা উচিত। বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম কথাটা। বৌদি প্রথমে অবাক হয়ে গেল। বলল, "ও মা! তুমি জানলে কি করে?" তারপরে বলল যে সত্যিই নাকি এককালে এখানে একটা নদী ছিল। গঙ্গারই একটা উপনদী। কিন্তু বহুদিন হল নদীটা শুকিয়ে গেছে। এখন সেই জায়গায় পড়ে আছে মস্ত একটা চড়া। বর্ষাকালে তার মাঝখান দিয়ে একচিলতে জলের ধারা বয়ে যায়। লোকেরা শীতকালে সেখানে পিকনিক করতে যায়। আমার খুব ইচ্ছে হল একবার সেখান থেকে ঘুরে আসতে। বৌদিকে বলায় সেও এককথায় রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল, কাল দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা একবার নদীর চড়াটা থেকে ঘুরে আসব।

সন্ধ্যেবেলা গেলাম পাশের বাড়িতে মহিমজ্যেঠুদের ওখানে। সেখানে গিয়ে দুঃখের খবরটা শুনলাম। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মহিমজ্যেঠুর স্ত্রী, পূর্ণিমাজ্যেঠীমনি ওঁদের ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে পিনাকীদা আর অনন্যাবৌদির ছবি দেখালেন। আহা রে! বৌদিকে কি মিষ্টিই না দেখতে। খুব চেনা চেনা লাগল বৌদিকে। মনে হল আগে নিশ্চয়ই কোথাও একটা দেখেছি। কিন্তু পরে শুনলাম যে বৌদি নাকি ছোটবেলা থেকে দিল্লীতেই বড় হয়েছে। বিয়ের পরেই প্রথম পশ্চিমবাংলায় এসেছিল, আর তখনই এই কাণ্ড। সত্যিই কখন যে কার জীবনে কি হয়ে যায়, কেউই তা বলতে পারে না।

রাতে শোবার আগে অর্ণব হঠাৎ বলল আমাকে নাকি খুব অন্যমনস্ক লাগছে। আমি নাকি মাঝে মাঝেই উদাস হয়ে কি সব ভাবছি। ডাকলে একবারে সাড়া দিচ্ছি না। একটু আগে নাকি আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গাইছিলাম। ও নাকি দু তিনবার আমাকে ডেকেছে, কিন্তু আমি কোনও সাড়া দিইনি। আমি শুনে বললাম, "ক্ষেপেছো নাকি তুমি! আজ অব্দি ঠিকঠাক সুরে সা রে গা মা টাই গেয়ে উঠতে পারলাম না! আর আমি নাকি গান গাইছিলাম"। শুনে অর্ণবও হা হা করে হেসে উঠল। সত্যি সত্যিই আমি গান গাইছিলাম কিনা জানি না, কিন্তু একটা কথা অর্ণবকে বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। সন্ধ্যেবেলা মহিমজ্যেঠুদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আমার কেন জানি একটু ভয় ভয় করছে। খালি কিছুক্ষণ পর পর চোখের সামনে অনন্যাবৌদির মুখটা ভেসে উঠছে। বৌদি যেন আমাকে ডেকে বলছে, "বোন, চলে যা এখান থেকে! যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে যা! তোর ভীষণ বিপদ"।

৪

কাল সন্ধ্যেবেলা থেকেই অদিতিকে বেশ অন্যমনস্ক লাগছে। সারাক্ষণই একটা ঘোরের মধ্যে থাকছে। কি সব জানি ভেবে চলেছে। রাত্রিবেলা আবার জানলা ধরে কি একটা সুর গুনগুন করছিল। একটা গ্রাম্য সুর। টেনে টেনে বেশ সুরেই ও গুনগুন করছিল। আমি তো একটু অবাকই হয়ে গেলাম। কারণ আমার সুন্দরী স্ত্রীর আরও অনেক গুণ থাকলেও, গুনগুন করার গুণটা আগে কোনদিনই লক্ষ করিনি। আর ওর গান গাইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ও নিজেও বেশ ওয়াকিবহাল। তাই বিয়ের পর এতদিনে আমি কখনই ওকে কোনও গান গাইবার চেষ্টা করতে দেখিনি। ওকে একথাটা বলতে ও যদিও হেসেই উড়িয়ে দিল। তবুও আমার কেন জানি একবার মনে হল যে ও আমাকে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। আমিও আর জোর করলাম না।

সকালবেলা আবার আরেক কাণ্ড। এমনিতে রোজ সকালে আটটার সময় আমাকে ক্লিনিকে বসতে হয় বলে আমি রোজ ছটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ি। তারপরে স্নান টান সেরে সাতটার সময় আমিই ম্যাডামকে ডেকে তুলি। এখানে ক্লিনিকে যাবার তাড়া নেই, তাছাড়া এখানে ঠাণ্ডাটাও কোলকাতার থেকে বেশী। তাই ভেবেছিলাম আজ একটু দেরি করেই ঘুম থেকে উঠবো। কিন্তু অ্যালার্ম না দেওয়া সত্ত্বেও রোজকার অভ্যেসবশতঃ আজও সেই ছটা দশেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশ ফিরে দেখি অবাক কাণ্ড, অদিতি বিছানায় নেই। ভাবলাম নতুন জায়গা, হয়ত ঘুম ভাল হয়নি বলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে। আমিও উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি বাড়িতে কেউই তখনও ওঠেনি। কিন্তু অদিতিকে কোথাও দেখতে পেলাম না। মেন গেট দিয়ে বাইরে এসে দেখি অদিতি বেশ দূরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে কোথায় যাচ্ছে। হাঁটার ধরণটা ভারী অদ্ভুত। খুব ধীরে ধীরে দুলে দুলে হাঁটছে। আমি পিছনে পিছনে এসে বেশ কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু ও কোনও সাড়া দিল না। কাছে এসে ওর হাতটা ধরতেই ও চমকে ফিরে তাকাল। আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছ?"। ও কেমন অবাক হয়ে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। যেন ও নিজেও বুঝতে পারছে না যে ও বিছানা ছেড়ে এখানে কি করে চলে এল। আমার মনে হল, ও যেন স্লিপওয়াক করছিল। এটা অবশ্য আশ্চর্যের কিছু না। অনেক সময় আচমকা পরিবেশের পরিবর্তনে অনেকের মধ্যেই কিছু কিছু অস্বাভাবিক সিম্পটম লক্ষ করা যায়। হয়ত ওর ক্ষেত্রেও এরকমই কিছু একটা হয়েছে।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে আমি, অদিতি, বড়দা, বৌদি আর বুবুন, আমার গাড়ীতে করে বেরলাম নদীর চড়ের দিকে। আমি ছোটবেলা থেকে এতবার এখানে এসেছি, কিন্তু আগে কখনও শুনিনি যে এখানে একটা নদী ছিল। বাড়ি থেকে প্রায় তের কিমি দূরে নদীর চড়ায় সেই পিকনিক স্পটটায় এসে পৌঁছতে মিনিট পঁচিশ সময় লাগলো। বেরিয়েছিলাম যখন তখন আকাশ ছিল ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার। কিন্তু এখানে এসেই দেখি কালো মেঘে পুরো আকাশটা ছেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যে হলেই তেড়ে বৃষ্টি নামবে। 'নভেম্বর রেন' তাহলে খালি বিদেশে নয়, আমাদের গ্রামবাংলাতেও হয়।

উল্টোদিকে নদীর চড়াটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা ছোটোখাটো জঙ্গল। বড়দা বলল সেই জঙ্গলে নাকি একটা পুরনো গড় রয়েছে। শুনেই আমার ইচ্ছে করল একবার গড়টা দেখে আসতে। অদিতিও দেখলাম রাজী। কিন্তু বৌদি একদম বেঁকে বসল। বড়দা হেসে বলল, "বাবাই, আসলে কি জানিস তো, এখানকার লোকেরা মনে করে যে ওই গড়ে নাকি অপদেবতা বাস করে। তাই তোর বৌদি যেতে চাইছে না"। শুনে আমি হো

হো করে হেসে উঠে বললাম, "তাহলে তো এই সুযোগে অপদেবতাটার সাথে একবার দেখা করে আসা যাক, কি বল? কোলকাতায় থেকে তো এই সুযোগটা আর কোনদিনই পাব না"। বৌদি বলল, "না গো! আমি মোটেও সে জন্যে বারণ করছি না, আসলে এসব জায়গায় ভীষণ সাপের উপদ্রব কিনা, তাই"। আমি বললাম, "বৌদি, তুমি কিছু চিন্তা কর না, এখন শীতকাল, সাপেরা সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। চল না, একবার চট করে দেখেই চলে আসব"। আমাদের সবার উৎসাহের কাছে বৌদির আপত্তি আর ধোপে টিকলো না। আমরা সবাই পা বাড়ালাম গড়ের দিকে।

নামেই গড়। আসলে একটা বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই না। ভাঙ্গাচোরা একটা সিংহদরজা, ধ্বসে পড়া দেওয়াল, ভেঙ্গে পড়া কড়িবরগা, চতুর্দিকে আগাছা সব দেখে মনে হচ্ছিল কমসে কম একশ বছর ধরে বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার জন্যে এই সাড়ে চারটের সময়ও একটা আলো আঁধারি পরিবেশ। মাঝে মাঝে কোথাও থেকে একটা তক্ষক ডেকে উঠছে। সবমিলিয়ে এই গড়টার সামনে দাঁড়িয়ে আমারও গা টা একটু ছমছম করছিল। সেই ভাবটা কাটানোর জন্যে আমি বললাম, "চল, একটু ভিতরে ঢুকে ঘরগুলো দেখে আসি"। দেখলাম কারোরই খুব একটা ইচ্ছে নেই, তবু আমি জোর করে সবাইকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

বেশীরভাগ ঘরগুলোরই দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা মূল বারান্দাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছিলাম। একটা ঘর দেখে মনে হল যে সেটাই সবচেয়ে বড় ঘর। অথচ এই ঘরটাই সবচেয়ে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ঘরের ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার। আমি বললাম, "এটা হয়ত সভাঘর টর জাতীয় কিছু হবে"। কড়িকাঠ থেকে একটা ঝাড়লন্ঠনের অবশিষ্টাংশ ঝুলছে। দেওয়ালগুলোতে এখনও কয়েকটা পোর্ট্রেট রয়েছে, যদিও সেগুলোতে একশ বছরের ধুলো জমে আছে। আশ্চর্য, এই ঘরটা এতটা অক্ষত, অথচ এর আশেপাশের সবকটা ঘরেরই ছাদ, দেওয়াল একদম ধ্বসে পড়েছে। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলাম দোতলায় ওঠার একটা ভাঙ্গাচোরা সিঁড়ি। ভাবছিলাম একবার দোতলায় ওঠার চেষ্টা করব নাকি, এমন সময় হঠাৎ বৌদি বলল, "আরে! অদিতি কোথায়? ওকে তো দেখতে পাচ্ছি না!"

চমকে তাকিয়ে দেখি অদিতি আমাদের সাথে নেই। আমার বুকের ভিতরটা কেন জানি হঠাৎ করে কেঁপে উঠল। ওকে ডাকতে ডাকতে কিছুটা পিছনে গিয়ে দেখি সভাঘরটার এক কোণে অদিতি স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা ছবির দিকে। কাছে গিয়ে ডাকলাম ওকে। কোনও সাড়া না পেয়ে কাঁধে একটা হাত রাখলাম। ও আস্তে আস্তে আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওর মুখের দিকে তাকাতেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। দেখলাম ওর মুখটা একদম রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে, চোখদুটো বিস্ফারিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে, অদিতি, কি হয়েছে?" ও কোনও উত্তর না দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছবিটার দিকে দেখাল। দেখে পুরনো কোনও রাজা বা জমিদারের পোর্ট্রেট বলে মনে হল। মনে হল অদিতি যেন কি বিড়বিড় করছে। ওর মুখের কাছে কানটা নিয়ে গিয়ে শুনলাম ও বলছে, "ভীষণ অন্ধকার এখানে। আমার খুব ভয় করছে। দরজাটা খুলছে না কেন? আমি বাইরে যাব, আমার ভীষণ ভয় করছে"। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

৫

– "শ্যামলী, ও শ্যামলী! বলি তোর হ'ল?"

দিদি ডাকচে। বললুম, "হ্যাঁ রে দিদি, এই হ'ল বলে, চুলটা বেঁধেই আসচি"।

দিদি বললে, "তাড়াতাড়ি কর বোন, গগণজ্যেঠু এসেচে। আমাদের নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করচে"।

গগনজ্যেঠুকে রাজাবাবু পাঠিয়েচেন। রাজাবাবু হলেন আমাদের গেরামের জমিদার। খুব ভালোমানুষ। আমার বাবা তাঁর বাড়িতে নিত্যিপূজা করেন। তাঁর আর কেউই বেঁচে নাই। সবাই মারা গিয়েচে। আমাকে আর আমার দিদিকে তিনি বড় ভালবাসেন। আমাদের মা বলে ডাকেন। আমরা তাঁকে গান শুনাই। তিনি আমাদের গান শুনতে খুব পছন্দ করেন। তিনি আমাদের বাবাকেও বড় স্নেহ করেন। আমরা গরিব বলে আমাদের তিনি অনেক সাহায্য করেন। আমার বাবাও তাঁকে খুব ভক্তি করেন। বাবা বলেন কোম্পানির আমলে এই গোটা দেশে তাঁর মত ভালোমানুষ আর দুটো নাই। তবুও লোকে কেন জানি তাঁর সমন্ধে মন্দ কথা বলে। বাবা এতে ভারী কষ্ট পান।

আজ কালীপূজা। বাবা তাই পাশের গেরামে গেচেন পূজা করতে। আজ রাতে আর ফিরবেন না। তাই জন্যে রাজাবাবু আজ রাতে তাঁর বাড়িতে আমাদের থাকতে বলেচেন। তিনি বলেচেন আজ সারা রাত তিনি আমাদের সাথে গল্প করবেন আর আমাদের গান শুনবেন। গগনজ্যেঠু আমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে এসেচে।

চুল বেঁধে একটা ছোট টিপ লাগিয়ে বাইরে আসতেই দিদি বললে, "বাঃ রে বোন, তোকে তো আজ ভারী মিষ্টি লাগচে। আয় তোকে একটা কাজলের ফোঁটা দিয়ে দিই, যাতে কারোর নজর না লেগে যায়।" সবাই বলে আমাকে নাকি দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু আমি জানি, আমার দিদি আমার চেয়েও বেশী ভালো দেখতে। আমার বাবা গরিব ব্রাহ্মণ। লোকের বাড়ি পূজাআচ্চা করে যা পান তাই দিয়ে কোনওমতে আমাদের তিনজনের দিন চলে। মাকে আমার একেবারেই মনে নাই। আমি যখন খুব ছোট, তখন মা মারা যান। সেই থেকে আমরা দুটি বোন বাবার সাথে থাকি। আমার দিদির বয়স আঠার আর আমার ষোল। আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি। লোকে বাবাকে এই নিয়ে নানা কথা বলে। বাবা বলেন তিনি গরিব, বিয়েতে কিছু দেবার সামর্থ্য তাঁর নাই। তাই নাকি আমাদের বিয়ে হয় না। কিন্তু আমরা জানি আসলে বাবা আমাদের এত ভালবাসেন যে আমাদের ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারেন না। তাই তিনি আমাদের বিয়ে দেবার তত চেষ্টাও করেন না।

আমরা এই গেরামে নতুন এসেচি। আমরা আগে পাশের গেরামে থাকতাম। গেল মাসেই রাজাবাবু বাবাকে তাঁর বাড়িতে নিত্যিপূজা করার জন্যে ডেকে পাঠান। তিনিই তাঁর বাড়ির কাছে নদীর ধারে আমাদের জন্যে একটা ঘর বেঁধে দেন। সেই থেকে আমরা এই গেরামেই থাকি।

আমি আর দিদি গগনজ্যেঠুর সাথে রাজাবাবুর বাড়িতে এলুম। রাজাবাবু আমাদের জন্যে দরবার ঘরে অপেক্ষা করচিলেন। আমাদের দেখেই বললেন, "আয় আয় মা! তোদের জন্যেই বসে আছি। আজ কিন্তু এই বুড়োমানুষটাকে অনেকগুলো গান শোনাতে হবে।" দিদি বললে, "ঠিক আছে, শুনাব 'খন"। রাজাবাবু আমাদের মিষ্টি আর শরবত

খেতে দিলেন। মিষ্টি আর শরবত খেয়ে যেন শরীর মন সব জুড়িয়ে গেল। খাওয়ার পর রাজাবাবু বললেন, “মা, আমি ছোট করে কালীপূজার আয়োজন করেছি। তোদের আজ মা-এর সামনে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে হবে, পারবি তো?” আমরা হেসে বললুম, “পারব”। তিনি তখন বললেন, “চল তবে, মা-এর কাছে যাই।” আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসচিল। কোনও মতে তাঁর সাথে চললুম। তিনি তাঁর বড় ছবিটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটাকে একটু সরিয়ে তার পিছনে একটা কল ঘোরাতেই পাশের দেওয়ালটা ঘড়ঘড় শব্দ করে সরে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, দেওয়ালের পিছন থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। সিঁড়ির শেষে একটা ছোট মতন ঘর। সেখানে একটা কালীমূর্তি। মূর্তির সামনে একটা পিদিম জ্বলছে। উনি বললেন, "আয় মা! আমার পিছনে পিছনে সাবধানে আয়!”। বলে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে মূর্তির সামনে গিয়ে বসলেন। আমরাও তাঁর পিছনে এসে বসলুম। তিনি বললেন গান শুরু করতে। আমি আর দিদি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে শুরু করলুম।

দুটো গান শেষ হতে না হতেই আমার খুব ঘুম পেতে লাগল। এমন সময় রাজাবাবু বললেন, “একটু বস তোরা, আমি নৈবিদ্যর থালিটা নিয়ে আসি। এই যাব আর আসব”। বলে তিনি পিদিমটা নিয়ে বাইরে গেলেন। ঘরের ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার হয়ে গেল। দরজার বাইরে থেকে যেটুকু আলো আসচে তাতে যতটুকু যা দেখা যায়। হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দেখি দেওয়ালটা বন্ধ হয়ে যাচ্চে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলুম। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু মাথাটা ঘুরে গেল। তাকিয়ে দেখি দিদিও ওঠার চেষ্টা করচে, কিন্তু পারচে না। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে দেওয়ালটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমরা নিজেদেরই দেখতে পারচিলুম না। ভয়ে আমি আর দিদি চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম। বারবার ডাকলুম রাজাবাবুকে, কিন্তু তাঁর কোনও সাড়া পেলুম না। আমার চোখ বুজে আসতে লাগল ঘুমে। কিছুতেই আমি চোখ খুলে রাখতে পারচি না। কেন আমার এত ঘুম পাচ্চে? কেঁদে কেঁদে দিদিকে বললুম, “দিদি, ভীষণ অন্ধকার এখানে। আমার খুব ভয় করচে। দরজাটা খুলচে না কেন? আমি বাইরে যাব, আমার ভীষণ ভয় করচে”।

৬

নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্যে আমার নিজেরই নিজের ওপরে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। আমিই শুধু শুধু জিদ করে সবাইকে নিয়ে গড় দেখতে ঢুকেছিলাম বলে আজ অদিতির এই অবস্থা। কোনওমতে অদিতিকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে আজ রাতেই রওয়ানা দেব কোলকাতায়। কিন্তু এরকম বৃষ্টিতে এতটা রাস্তা ড্রাইভ করে যাওয়াটাও রিস্কি হয়ে যাবে। তার ওপরে আজ নাকি আবার অমাবস্যা। তাই সবাই বলল আজ রাতটা কোনও ভাবে এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে বেড়িয়ে পড়তে। আমার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সবার চাপে থেকে যেতে বাধ্য হলাম।

অদিতিকে প্রাইমারি চেকআপ করে দেখলাম যে এমনিতে সব ঠিকই আছে, খালি প্রেশারটা খুব ফল করে গেছে। মনে হয় কোনও কারণে ওর ভীষণ বড় একটা প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে। খুব খারাপ লাগছিল ওর জন্যে। বেচারি,

আমার জন্যেই কোলকাতার স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে এসে এরকম একটা বিপদে পড়ল। কেন যে ওকে নিয়ে আসতে গেলাম এখানে।

রাতে যা হোক করে দুটো ভাত মুখে দিয়ে এসে দেখি অদিতি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভাবলাম আজ রাতটা আর না ঘুমিয়ে জেগেই কাটিয়ে দেব। রাতে যদি কোনও দরকার পড়ে। রাত জাগার জন্যে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে থ্রিলার জাতীয় কিছু পড়া। তাই একটা অগাথা ক্রিস্টি খুলে বসলাম। পড়ায় মন বসছিল না, তবুও চেষ্টা চালিয়ে গেলাম পড়ার।

পড়তে পড়তে কখন যে চোখ লেগে গেছিল টের পাইনি। হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম অদিতি বিছানায় উঠে বসেছে। হাতঘড়িটায় তাকিয়ে দেখলাম তিনটে কুড়ি বাজে। আমি বললাম, "অদিতি, কেমন আছ এখন?" ও তখন আমার দিকে ফিরে তাকাল। চোখের দৃষ্টিটা ঘোলাটে। যেন আমাকে চিনতেই পারছে না। আমি আবার বললাম, "তোমার কি কিছু লাগবে?"। কিন্তু ও কোনও জবাব না দিয়ে আপন মনে বলল, "আমাকে এখন যেতে হবে, গগনজ্যেঠু এসে গেছে, রাজাবাবু অপেক্ষা করছেন"। আমি বললাম, "অদিতি, কি বলছ তুমি? কে রাজাবাবু? গগনজ্যেঠুই বা কে?" বলে ওর কপালে হাত রেখে দেখতে গেলাম জ্বর টর এল নাকি? কিন্তু ও আমার হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলল, "কে আপনি? আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন কোন সাহসে?"। আমি অবাক হয়ে গেলাম। নির্ঘাত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। আমাকেও চিনতে পারছে না। আমি কিছু বলার আগেই দেখি ও বিছানা ছেড়ে নেমে পড়েছে। মুখে বলল, "আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। দিদি, একটু দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি"। বলেই খালি পায়ে বাইরে বেরতে গেল। আমি বেগতিক দেখে ওর হাতটা ধরে ওকে আটকাতে গেলাম। কিন্তু তাতে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা দিল। অমানুষিক জোরে ওই ধাক্কাটা খেয়ে আমি ছিটকে পরলাম ঘরের মাঝখানে। আট দশ সেকেন্ড লাগলো আমার ধাতস্থ হতে। তারই মধ্যে দেখলাম অদিতি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে আমার মাথায় আর হাঁটুতে একটু চোট লেগেছিল। সেই চোট নিয়েই বাইরে এসে দেখি, প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই অদিতি দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্যের মত দৌড়ে দৌড়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি অদিতিকে ডাকতে ডাকতে পিছনে পিছনে গেলাম। কিন্তু কিছুটা এগিয়েই আর পারলাম না। এই ভয়ানক দুর্যোগে কোথাও যাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব। এরই মধ্যে দেখি অদিতি উদভ্রান্তের মত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম অদিতিকে। ও কোনও উত্তর না দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে মিলিয়ে গেল রাস্তার বাঁকে।

ততক্ষণে আওয়াজ পেয়ে সবাই উঠে পড়েছে। আমি বললাম কি হয়েছে। সবাই শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। জ্যেঠু দেখলাম আমার আর অদিতির কথোপকথন সব শুনে খুব গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। আমি আর বড়দা ছাতা নিয়ে বড়দার বাইকটা করে বেরলাম অদিতিকে খুঁজতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! মেয়েটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হন্যে হয়ে সারা শহর অলিতে গলিতে অদিতিকে খুঁজে বিফলমনোরথ হয়ে পাগলের মত অবস্থায় যখন বাড়ি ফিরলাম তখন ভোর হয়ে গেছে। বৃষ্টিও ততক্ষণে অনেকটা কমেছে। অবসন্ন দেহে বাড়িতে ফিরে দেখি ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে প্রচুর মানুষ এসে জড় হয়েছে।

ভিজে জামাকাপড় চেঞ্জ করে আসতে না আসতেই জ্যেঠু ডাকল। পরিচয় করিয়ে দিল আরেকজন ভদ্রলোকের সাথে। তাঁর নাম রথীন ভট্টাচার্য। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। কিন্তু খুব টানটান শরীর। উনি এই শহরের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। রথীনজ্যেঠু আমাকে ডেকে বললেন, "শোন বাবা, তোমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। তোমার জ্যেঠুর কাছে সবকথা শুনে আমি না এসে আর থাকতে পারলাম না। আজ তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। অনেক পুরনো একটা ঘটনা। আমার বাবা কাকাদের মুখে শোনা। তখন বিশ্বাস করিনি, কিন্তু আজ আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যা ঘটছে তার সাথে হয়ত ওই ঘটনাটার কোনও না কোনও যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে"।

আমি বুঝতে পারছিলাম না, পুরনো ইতিহাস শুনে এখন আমার কি লাভ হবে, এর থেকে তো থানায় একটা রিপোর্ট করাটা অনেক বেশী জরুরী। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে শুনতে হল রথীনজ্যেঠুর কাহিনী।

৭

কি হয়েছে আমার? এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে খালি পায়ে আমি কোথায় যাচ্ছি? অর্ণব কোথায়? আমার কিছুই মনে পড়ছে না। আমি চারপাশটা কিছুই চিনতে পারছি না। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। তার ওপরে এই মুষলধারে বৃষ্টি। আমার খুব ভয় করছে।

কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। কোথায় যাচ্ছি, আমি তা জানি না, কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছি যে কেউ একজন আমাকে ডাকছেন। তাঁর ডাক অমান্য করার মত শক্তি আমার নেই। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁর ডাক শুনে হেঁটে চলেছি। আমার সামনে কয়েক পা দূরে ওই যে ছায়ার মত লোকটা হেঁটে যাচ্ছে, সে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। আমাকে তার পিছনে পিছনে যেতে হবে। যত দুর্যোগ, যত ঝড়বৃষ্টিই হোক না কেন, আমাকে যিনি ডাকছেন তাঁর কাছে আমাকে পৌঁছতেই হবে। অনেকদিন ধরে তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।

– "বোন ফিরে যা! আর এগোস না, সামনে তোর ভীষণ বিপদ। ফিরে যা লক্ষ্মীটি!"

আরে একি! আমি অনন্যাবৌদিকে দেখতে পাচ্ছি। অনন্যাবৌদি এখানে কোথা থেকে এল? বৌদি আমাকে কাতর ভাবে অনুরোধ করছে যাতে আমি ফিরে যাই। আমি হঠাৎ করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি একা একা কোথায় যাচ্ছি? অর্ণব কেন আমায় একা ছেড়ে দিল? ও তো আমাকে একা কোথাও যেতে দেয় না। নিউটাউন থেকে সল্টলেক যেতে হলেও আমাকে আমাদের গাড়ীতে ড্রাইভারের এর সাথেই পাঠায়। সে কিনা এভাবে অজানা অচেনা একটা লোকের সাথে আমাকে একা ছেড়ে দিল। আমাকে এখুনি বাড়িতে ফিরতে হবে, কিন্তু বাড়িতে ফেরার রাস্তাটা যেন কোন দিকে?

কিন্তু না। আমার তো এখন বাড়িতে গেলে চলবে না। আমার তো এখন তাঁর সাথে দেখা করতে যেতে হবে। ওই তো ওঁর ডাক আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। উনি ডাকছেন, "আয় মা শ্যামলী, আয়। কতদিন ধরে তোর জন্যে বসে আছি মা, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়"। এই ডাক আমি অগ্রাহ্য করব কি করে? আমার সব মনে পড়ে গেছে। উনি

আমাদের রাজাবাবু। রাজাবাবু আমার গান শুনবেন বলে আমাকে ডাকছেন। সামনে গগনজ্যেঠু আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার দিদি নিশ্চয়ই আগে আগেই পৌঁছে গেছে। রাজাবাবু এখন আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এই তো নদীটার পাশে এসে গেছি। এবার নদীটা পার করলেই রাজাবাবুর প্রাসাদ। এতদিন ধরে উনি ওখানে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে।

– "বোন, তোর পায়ে পড়ি! যাস না! ফিরে যা, তুই ফিরে যা!"

আবার অনন্যাবৌদির গলা। অনন্যাবৌদিকে ঠিক আমার দিদির মত লাগছে। ও আমাকে রাজাবাবুর কাছে যেতে বারণ করছে। কিন্তু কেন? রাজাবাবু তো আমাকে আর আমার দিদিকে দুজনকেই কত ভালবাসেন। আমাদের সাথে কত গল্প করেন। আমাদের কত কিছু খেতে দেন। আমাদের গান শোনেন।

এই তো তাঁর প্রাসাদে এসে গেছি। রাজাবাবু নিশ্চয়ই দরবার ঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই বলবেন, "আয় মা আয়! কতদিন ধরে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। কি ভালো যে লাগছে তোকে দেখে।"। সত্যিই, এতদিন বাদে ওঁকে দেখে আমারও খুব ভালো লাগবে।

হঠাৎ আমাকে পিছন থেকে কে যেন টেনে ধরল। চমকে তাকিয়ে দেখি অনন্যাবৌদি আমার ওড়না ধরে টানছে। বলছে, "বোন, এখনও সময় আছে, বাঁচতে চাস তো ফিরে যা"। শুনে আবার হঠাৎ করে একটা অজানা ভয়ে আমার হাত পাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম একটা পোড়ো বাড়িতে আমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছি। আরে! এটা তো জঙ্গলের মধ্যেকার সেই পুরনো গড়টা, যেখানে আমরা বিকেলবেলা বেড়াতে এসেছিলাম। এখানে আমি একা একা কি করছি? আমি ভয়ে চিৎকার করে অর্ণবকে ডাকলাম। কিন্তু বাইরে ঝড়ের ভীষণ আওয়াজে আমার ডাকটা চাপা পড়ে গেল।

সামনে চোখ পড়তেই দেখি অন্ধকারে একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখেই আবার ধীরে ধীরে আমার ভয় কেটে গেল। আমি চিনতে পারলাম রাজাবাবুকে। আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। উনি ইশারায় আমাকে তাঁর পিছনে আসতে বললেন। আমি দেখলাম দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে। রাজাবাবু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমি যন্ত্রের মত তাঁকে অনুসরণ করলাম।

পিছন থেকে আবার অনন্যাবৌদির ডাক শুনতে পেলাম, "বোন, যাস না! ফিরে আয়।"

কিন্তু রাজাবাবু আমাকে ডাকছেন। আমি মরে গেলেও তাঁকে অমান্য করতে পারব না।

আমি পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে।

৮

রথীনজ্যেঠু বলতে শুরু করলেন –

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগের কথা। সেই সময় এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন রাজা দিগ্বিজয় সিংহ। প্রচণ্ড নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী শাসক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রজাদের ওপর তিনি অমানুষিক অত্যাচার করতেন। আজ এর বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিতেন, তো কাল ওকে তুলে এনে গুম খুন করিয়ে দিতেন। তাঁর প্রজারা তাঁকে যমের মত ভয় করত।

কিন্তু সব অত্যাচারী শাসকেরই অত্যাচারের ঘড়া একদিন পূর্ণ হয়। এঁর ক্ষেত্রেও এমনটাই হল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রজাদের ওপর থেকে ওঁর কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। এর ওপরে বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক জমিদার হঠাৎ করে পুত্রহারা হলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে, যে অত্যাচার ও দাপটে কালে কালে তাঁর বাবাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ করে একদিন মারা গেলেন ডাকাতের আক্রমণে। হয়ত এই আক্রমণের পিছনে কিছু বিদ্রোহী প্রজাদেরই হাত ছিল। সে যাই হোক, আচমকা ছেলেকে হারিয়ে বৃদ্ধ জমিদার একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু বিদ্রোহী প্রজা ধীরে ধীরে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে লাগল। কিন্তু জমিদারের বয়স হয়ে গিয়েছিল বলে চুপচাপ সব সহ্য করা ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় ছিল না।

এরকম অবস্থায় একদিন সেই জমিদার এক তান্ত্রিকের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নেন। সেই তান্ত্রিকের পরামর্শে তিনি নবযৌবন লাভের জন্যে মা কালীর উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে মা কালীকে দুটি কুমারী সহোদরা কন্যা উৎসর্গ করতে হবে। তাহলেই তিনি পুনর্যৌবন লাভ করবেন। পুনর্যৌবন লাভ করলে তিনি আবার তাঁর পুরনো দাপট ফিরে পাবেন এবং বিদ্রোহী প্রজাগুলোকে কড়া হাতে দমন করে আবার তিনি আগের মতন রাজ্যশাসন করবেন, এই ছিল তাঁর আশা। তাছাড়া আবার বিবাহ করে পুত্রসন্তান লাভ করলে বংশরক্ষাও হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি সন্ধান চালিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এক দরিদ্র পুরোহিত আর তাঁর দুই কুমারী কন্যাকে নিজের গ্রামে নিয়ে আসেন এবং নিজের বাড়ির নিত্যপূজার দায়িত্ব দেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের সাহায্য করে চতুর জমিদার এই পরিবারটির বিশ্বাস অর্জন করেন। এরপরে কালীপূজার দিন সেই জমিদার কৌশলে এই গরিব ব্রাহ্মনটির দুই কন্যাকে অপহরণ করেন এবং মাকালীর উদ্দেশ্যে বলী দেন।

তিনি ভেবেছিলেন একরকম, কিন্তু আসলে হল আরেকরকম। তাঁর নবযৌবন লাভ করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। উল্টে সব শুনে প্রজারা গেল ক্ষেপে। এমনিতেই প্রজারা তাঁর ওপর কোনওকালেই খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। এই ঘটনাটা যেন আগুনের ওপর ঘি ছড়িয়ে দিল। সব প্রজারা একসাথে বিদ্রোহ করল। তারা জমিদারবাড়ি আক্রমণ করে জমিদার আর তাঁর বাকি লোকেদের নৃশংস ভাবে হত্যা করল। কিন্তু ওই দুই হতভাগিনী বোনের মৃতদেহ কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই রাগে উন্মত্ত জনতা জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেদিন থেকে এই জমিদার বংশটি ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে লোপ পেল।

৯

দু সপ্তাহ হল আমরা কলকাতায় ফিরেছি। এতদিনে অদিতি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। সেদিন যেভাবে ওকে উদ্ধার করা হল সেটা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমি। চিরটাকাল ভগবান, ভূতপ্রেত ইত্যাদিকে আমার সিলেবাসের বাইরেই গণ্য করে এসেছি। কিন্তু এই কটা দিনে যা অভিজ্ঞতা হল, তাতে আমার এতদিনের বিশ্বাসের ভিত্তিটা যে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গেল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সেদিন রথীনজ্যেঠুর গল্পটা শোনার পর সবাই সিদ্ধান্ত নিল একবার জঙ্গলের মধ্যে পুরনো গড়টাতে অদিতিকে খুঁজতে যাবে। ওই পুরনো গড়টাই নাকি ছিল রাজা দিগ্বিজয় সিংহের প্রাসাদ। আমি যদিও মন থেকে কিছুতেই এসব মেনে নিতে পারছিলাম না, তবুও কিছুটা সবার চাপে পড়ে আর কিছুটা "একবার দেখেই আসা যাক না কেন?" এরকম মনোভাব নিয়ে সবার সাথে গেলাম। কিন্তু এখানে এসে সবচেয়ে বড় ঘরটায় অদিতির পরনের ওড়নাটা পড়ে থাকতে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার মানে অদিতি কাল রাতে এখানে এসেছিল। যদিও তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অদিতিকে কোথাও পেলাম না। হঠাৎ আমার মনে হল অদিতি জ্বরের ঘোরে কোনও একটা দরজা খোলার কথা বলছিল। বলছিল খুব অন্ধকার, ওর খুব ভয় করছে। তার মানে কি এখানে কোনও গুপ্ত দরজা রয়েছে? সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের এই কথাটা বলায় সবাই ঠিক করল এই ঘরের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলবে। দেওয়ালে ধাক্কা দিতে দিতে এক জায়গায় ফাঁপা আওয়াজ পাওয়া গেল। ওই জায়গাটার দেওয়ালটা ভেঙ্গে ফেলতেই আমরা অবাক হয়ে দেখলাম দেওয়ালের পিছনে একটা গুপ্ত কুঠুরি। সেই কুঠুরি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় অদিতিকে উদ্ধার করলাম। অদিতির শ্বাসপ্রশ্বাস ভীষণ ক্ষীণ হলেও তখনও চলছিল। আর কিছুক্ষণ দেরী হলেই হয়ত ওকে আর বাঁচানো যেত না। সবার পরামর্শে আমি সঙ্গে সঙ্গেই আর দেরি না করে ওকে নিয়ে কোলকাতা রওয়ানা দিলাম। এখানে এসেই হাসপাতালে ভর্তি করলাম। সাতদিন হাসপাতালে থাকার পরে ওকে ডিসচার্জ করা হয়। এখনও ওর দুর্বলতা পুরোপুরি কাটেনি, যদিও বেশ তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, এটাই ভরসা। এই কদিনে ওর ওপর দিয়ে যা গেল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই এত বড় ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় ওর লাগবে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার, সেই রাতে কি ঘটেছিল একথা জিজ্ঞেস করলে ও কোনও উত্তর দিতে পারে না। আশ্চর্যজনক ভাবে সেই রাতের সব স্মৃতি ওর মেমরি থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে গেছে।

পরে বড়দার কাছে ফোনে খবর পাই যে আমি অদিতিকে নিয়ে চলে আসার পরে, ওই গুপ্ত কুঠুরি থেকে একটা নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। সেই কঙ্কালটা ডিএনএ টেস্টের জন্যে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল। কাল সেই টেস্টের রিপোর্ট এসেছে। যদিও সেই রিপোর্টের কোনও প্রয়োজন ছিল না, কারণ তার আগেই কঙ্কালটার পরনের সব গয়নাগাটি দেখে পিনাকীদার বউ অনন্যাবৌদিকে সনাক্ত করা হয়ে গিয়েছিল।

এক জীবনের অপেক্ষায়

অতিথি লেখক

মার্চ ১৩, ২০১৫

অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুধটা গরম হয়ে এসেছে। ফুটে উঠবে আরেকটু পরেই। দুধের স্তরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, সরের আস্তরণ কুঁচকে যাচ্ছে। গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলেই ফুলে উঠবে। রাগ হলে ঠিক এইরকমই হয়। চেপে রেখে রেখে, গুমরে গুমরে থেকে একসময় ফুলে ফেঁপে উথলে বেরিয়ে আসে চিৎকার হয়ে। বেরতে বেরতে একসময় ফুরিয়ে যায়। কমতে কমতে ছেড়ে যায় শরীরের কানাচ। রাগটা বেরিয়ে যাবার পর খুব ক্লান্ত লাগে দেবযানী'র। একটু বসে জিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

আজকাল অবশ রাগের উপশম একটা খুঁজে দিয়েছে টুয়েলভে পড়া ছেলে। ক্যান্ডি ক্রাশ। টাচ স্ক্রীনে আঙুল চালিয়ে নানা রঙের নানা আকৃতির ক্যান্ডি খচমচ করে ক্রাশ করে যান দেবযানী। একসঙ্গে তিনটের বেশি ক্যান্ডি ভাঙতে পারলেই টুংটাং বাজনার মধ্যে লেখা ভেসে ওঠে 'ডেলিশিয়াস'। পুরুষ কণ্ঠ বলে ওঠে 'টেস্টি'। একের পর এক লেভেল ক্রস করে গেলে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি, আনন্দ, উল্লাস হয়। রান্না ভালো হলে কিম্বা সিরিয়ালের দজ্জাল শ্বাশুড়ি প্রতিবাদী পুত্রবধূর হাতে শায়েস্তা হলেও তেমনটা আর হয় না আজকাল। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লে হাতের কাজ সেরে গভীর রাত অবধি বসার ঘরের সোফায় বসে চলে ক্যান্ডি ভাঙার খেলা। শোবার ঘরেই খেলত আগে। কিন্তু গেমের উজ্জ্বল আলোয় অস্বস্তি হয় কত্তার। অগত্যা বসার ঘরেই আসতে হয়।

কিন্তু সব সময়ই যে ভালো দিন যায় তা না। এক একটা লেভেল এমন কঠিন হয়, পাঁচ মিনিটেই পাঁচখানা লাইফ শেষ হয়ে যায়। তখন আবার আধঘন্টার অপেক্ষা। আধঘন্টা পর পর একটামাত্র লাইফ বরাদ্দ। এই সময়ে খুব অস্থির লাগে। কোন কিছুতেই মন বসে না। মাইক্রোওয়েভের বাঁশি বেজে বেজে থেমে যায়, খেতে দিয়ে জল দিতে ভুলে হয়ে যায়। বারবার ফোনটা হাতে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে আর কতক্ষণ বাকি আধঘন্টা হতে। ক্যান্ডি ক্রাশের লাইফ টাইমার পেছন দিকে হাঁটে। তিরিশ, উনতিরিশ, আঠাশ, সাতাশ হয়ে পিছিয়ে আসতে থাকে দেবযানীকে আরও একটা জীবন উপহার দেবে বলে। আরও একবার আঙুল দিয়ে ঠেকে ঠেলে লাল হলুদ কমলা বেগুনি ক্যান্ডি ভাঙার নির্মল সুযোগ করে দেবে বলে।

ছোট্ট রান্নাঘরে জ্বলন্ত গ্যাস ওভেনের সামনে দাঁড়িয়ে দুধের বাটির দিকে নজর রেখেছেন দেবযানী। যে কোনো মুহুর্তেই ফুটে উঠবে। ডান হাতে ধরা মোবাইলের স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে এক রঙিন প্রান্তর, যার ওপরে বাঁদিকে একটা ঘড়ি পেছন দিকে হাঁটছে। সেকেন্ডের কাউন্ট কমে আসছে দশ নয় আট সাত... যেকোনো মুহুর্তেই ফুটে উঠে উথলে যাবে বাটির দুধ। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ওপারেই দেবযানীর জন্য অপেক্ষা করছে একটা নিটোল তাজা জীবন।

এই পর্বের অতিথি লেখক পল্লবী ব্যানার্জি। ইন্টারনেটের জগতে বিভিন্ন জায়গায় লেখালিখি করে থাকেন। কিছু উদাহরণ পাবেন এখানে।

প্রথম ছাপা বাংলা বই ও এক অকথিত নায়ক

শাক্য মুনি

মে ৮, ২০১৫

এটা যে সময়ের কথা সেটা একটা উত্তাল সময়। বক্সার যুদ্ধে শাহ আলম ও মীরকাশেমের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত করে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার খাজনা আদায়ের ক্ষমতা গেছে মাত্র ৫ বছর হয়েছে। সকলেই এই গোলমেলে সময়ে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। প্রভু ব্যস্ত তার নতুন প্রজাদের ভালো করে চিনে নিতে, আর প্রজারা ব্যস্ত নবাবের শাসন ভুলে নতুন নিয়মে অভ্যস্ত হতে। এরকমই একটা সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানীর সমস্ত কুঠিগুলিকে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় নিয়ে এসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আরও গভীরে প্রোথিত করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা হল কোম্পানি রাজ। যার রাজধানী হল কলকাতা আর যার গভর্নর জেনারেল নির্বাচিত হলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সির ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ওয়ারেন হেস্টিংস। সালটা ১৭৭৪।

ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ট্রাগলের ইতিহাস বলার স্থান এটা নয়, আমাদের শুধু এটুকু জানলেই চলবে যে ভদ্রলোক ১৭৫০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানীর চাকরী নিয়ে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং তারপরের দীর্ঘ ২২ বছর এদেশের সাত ঘাটের জল খেয়ে, নানাবিধ সংকটের মধ্যে দিয়ে অবশেষে পেশাদারী জীবনে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছন। হেস্টিংস এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দূরদৃষ্টি ছিল প্রখর। এদেশের মানুষের সঙ্গে কাটানোর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এবং তীক্ষ্ণ ব্রিটিশ বেনিয়া বুদ্ধির ফলে তিনি বুঝেছিলেন যে নেটিভদের ভাষা বোঝা ও সেই ভাষায় কথা বলাটা জরুরী। শুধুমাত্র গা-জোয়ারির দ্বারা লংটার্ম ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে হবার নয়। সে কারণে তিনি উর্দু ফার্সি বাংলা ইত্যাদি ভাষাগুলি মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করেছিলেন।

অবশ্য এই কথা যে হেস্টিংস প্রথম বুঝেছিলেন তা নয়। বস্তুত পলাশীর যুদ্ধের পর পরই রবার্ট ক্লাইভ এই সত্য অনুধাবন করেন এবং প্রত্যেক রাজ কর্মচারীর দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে জোর দেন। সে যুগে, এমনকি, দেশীয় ভাষা না শেখার অপরাধে ব্রিটিশ কর্মচারীর চাকরী খোয়ানোর দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়! ক্লাইভের প্রিয়পাত্র হেস্টিংস ক্ষমতায় এসে তাঁর পূর্বজের চিন্তাধারাটিকেই আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ফিরিঙ্গী মহলে নেটিভের ভাষা ও সংস্কৃতির শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি চার্লস উইলকিন্স ও নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড নামক দুই তরুণ বিদ্যোৎসাহীকে বেছে নিলেন।

নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের জন্ম লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টারের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তিনি ১৯৬৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে তাঁর আলাপ হয় প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোন্সের সঙ্গে। জোন্সের অনুপ্রেরণায় অক্সফোর্ডে থাকাকালীন হ্যালহেড ফার্সি ও আরবী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন এবং এর চার বছর পর ১৭৭২ সালে তিনি মিস্ লিনলে নামক এক নারীর প্রেমে দাগা খেয়ে কোম্পানির রাইটারের চাকরী নিয়ে কোলকাতায় এসে পৌঁছন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

কোলকাতায় এসে তিনি কেরানীর চাকরিতে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর প্রাচ্যবিদ্যার কাজও চলতে লাগলো পুরোদমে। কোলকাতার নেটিভ ভাষা বাংলা শেখবার উদ্দেশ্যে তিনি দোভাষী, নাপিত, ল্যান্ডলেডী কাউকে জ্বালাতে বাদ রাখেননি। এবং এই করতে গিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে এদেশের সংস্কৃতিকে বোঝা ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য আগে সংস্কৃত ভাষা শেখাটা জরুরী। কিন্তু সেকালে একজন ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গীর পক্ষে দেবভাষা শেখা চাট্টিখানি কথা ছিলনা। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন থেকে হরিদাস তর্কপঞ্চানন- কেউই তাঁর সমস্যার সুরাহা করতে পারলেন না। অবশেষে বহু চেষ্টায় একজন অনামী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে পাওয়া গেল যিনি দীর্ঘ এক মাসের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের (যার মধ্যে ছিল নির্জলা উপবাস থেকে গোমূত্র সেবনের মাধ্যমে ম্লেচ্ছত্ব নিবারণ পর্যন্ত সমস্ত প্রকারের টর্চার!) পর হ্যালহেডকে সংস্কৃত ভাষায় দীক্ষা দিতে রাজী হলেন। আর এই সময়তেই হ্যালহেডের সঙ্গে আলাপ হল চার্লস উইলকিন্স নামক এক ভদ্রলোকের।

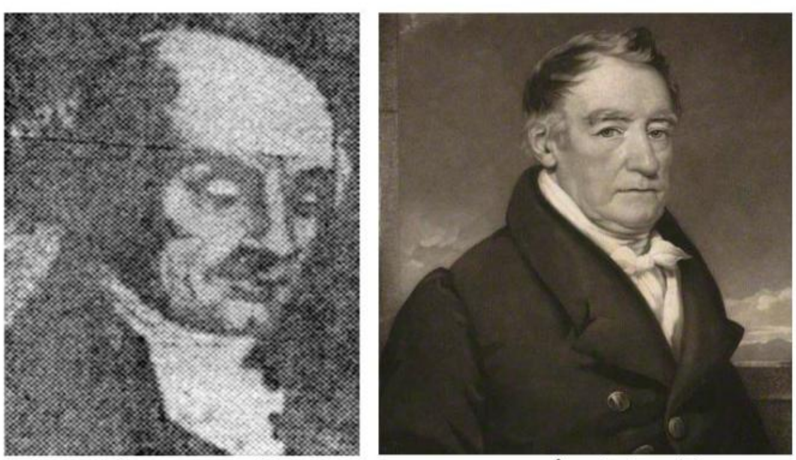

নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ও চার্লস উইলকিন্স

চার্লস উইলকিন্স কোম্পানির চাকরী নিয়ে ভারতে আসেন ১৭৭০ সাল নাগাদ এবং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মালদহের ব্রিটিশ কুঠির সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে বসেন। যদিও, বলা বাহুল্য, তাঁর মূল আগ্রহ ছিল প্রাচ্যবিদ্যা ও মুদ্রণশিল্প। মালদহে থাকা কালে তিনি আরবি ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং রাজা নন্দকুমারের সভাপণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এবং অচিরেই তাঁর এই প্রাচ্য অনুসন্ধিৎসার কারণে তিনি হেস্টিংস সাহেবের সুনজরে পড়েন।

হেস্টিংস, উইলকিন্স ও হ্যালহেড- এঁরা তিনজনই দেশজ বাংলা ভাষা রপ্ত করবার সময় যে প্রধান সমস্যাটির সম্মুখীন হন তা হল বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট কাঠামোর অভাব। দেশজ পণ্ডিত মহলে ভাষা হিসাবে বাংলার কৌলীন্য বা শাস্ত্র রচনাগত উপযোগিতা কোনও কালেই ছিলোনা। ফলে কেউই এই ভাষার ব্যকরণ নির্মাণ নিয়ে কস্মিন কালেও মাথা ঘামানোর কথা ভাবেননি। তবে ইউরোপীয় বণিকদের কাছে স্থানীয় ভাষার কদর প্রথম থেকেই ছিল। তাই এ ব্যাপারে পর্তুগীজরাই প্রথম এগিয়ে আসেন। ১৭৩৪-৩৫ সাল নাগাদ পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল দা-আস্‌সুম্পসাঁও (Manoel da Assumpção) লিসবন থেকে রোমান হরফে "বাংলা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ" (Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তবে ব্রিটিশদের কাছে সে বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা বা সহজলভ্যতা ছিল কিনা বলা যায়না। ফলে ইউরোপীয় স্ট্রাকচারাল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রিটিশ প্রভুদের খপ্পরে পড়ে বাংলা ভাষার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল! ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মনীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে হ্যালহেডকে একটি বাংলা ভাষার ব্যকরণ রচনার ভার দিলেন এবং এই ব্যকরণ পুস্তকাকারে ছাপাবার জন্য যে মুদ্রণ প্রণালীর প্রয়োজন তা নির্মাণের ভার গিয়ে পড়লো চার্লস উইলকিন্সের ওপর। এই ঘটনার মাধ্যমে কিভাবে বাংলা সাহিত্যের জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে এবং বাংলা ভাষা তার শৈশব থেকে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার বল পাবে সে বিষয়ে একটু পরে আসছি। কিন্তু তার আগে অতি-সংক্ষেপে ভারতবর্ষে ছাপাখানার ইতিহাসটা একবার দেখে আসা যাক।

ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে গোয়ায় কয়েকজন পর্তুগীজ জেসুইট পাদ্রীর আনুকূল্যে। একটি জাহাজে করে ছাপাখানাটিকে পর্তুগাল থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে আবিসিনিয়া (আজকের ইথিওপিয়া) নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং মাঝপথে গোয়াতে বিশ্রামের জন্য জাহাজটি দাঁড়ায়। তারপর যে কোনও কারণেই হোক আবিসিনিয়াতে না গিয়ে সেই ছাপাখানা গোয়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। জন দা বুসামেন্ট (Jóão de Bustamante) নামক এক স্পেনীয় ধর্মযাজক ও মুদ্রাকর এই ছাপাখানা থেকে "Conclusœs" নামে একটি পর্তুগীজ ভাষায় রচিত ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ধর্মপ্রচার মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটিই ভারতবর্ষে মুদ্রিত প্রথম বই। এরপর সেই প্রেসে আরও বেশ কিছু গ্রন্থ ছাপা হয়। কিন্তু সবই ওই পর্তুগীজ ভাষায় ও রোমান হরফে। ভারতীয় ভাষায় ছাপা প্রথম গ্রন্থটি আসতে আরও ২২ বছর সময় লেগেছিল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে কেরালার কুইলন থেকে "Doutrina Christā" নামক একটি পর্তুগীজ বইয়ের তামিল অনুবাদ গ্রন্থ "Christya Vannakanam" প্রকাশিত হয় যা ভারতীয় ভাষায় ও ভারতীয় হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। আর এই গ্রন্থ নির্মাণের জন্য তামিল মুদ্রাক্ষরগুলি তৈরির মাধ্যমে যিনি ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে পথিকৃৎ হয়ে থাকলেন তিনি একজন জেসুইট পাদ্রী, নাম জোহানেস গনজালভেস (Joannes Gonsalves)।

এরপর আমরা অবলীলায় দুশো বছরের একটা লম্বা লাফ দিয়ে চলে আসবো ১৭৭৮ সালে, হুগলীর ডাচ কলোনির লাগোয়া জন অ্যান্ড্রুজ নামক এক ব্রিটিশ পুস্তক বিক্রেতার সদ্য-নির্মিত বাংলার প্রথম ছাপাখানায়। যেখানে হ্যালহেড

লিখিত প্রথম বাংলা ব্যকরনের বইটি ছাপার জন্য চার্লস উইলকিন্স একজন বাঙালী ধাতুশিল্পী কে সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফ নির্মাণের জটিল ও সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলি হাতে ধরে শেখাচ্ছেন। বাঙালী ধাতুশিল্পীটির নাম পঞ্চানন কর্মকার।

পঞ্চানন ছিলেন হুগলীর পার্শ্ববর্তী ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলের একজন লিপিকর। ইস্পাত ও লোহার ওপর লিপি খোদাইয়ের কাজে পঞ্চাননের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল, যার জন্য এঁর পূর্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খানের কাছ থেকে 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। পঞ্চাননের সঙ্গে উইলকিন্স ও হ্যালহেডের কিভাবে আলাপ হয়েছিল তা বলা মুশকিল। দুটি প্রচলিত মতের একটি হল, বাঁশবেড়িয়ার রাজবাড়িতে পঞ্চানন বেশ কিছু লিপি খোদাইয়ের কাজ করেছিলেন এবং রাজবাড়ির সূত্রেই এই প্রতিভাবান খোদাই শিল্পীর সঙ্গে দুই ব্রিটিশ রাজ-কর্মচারীর যোগাযোগ হয়। এঁরা দুজনেই সে সময় কোম্পানির কাজে হুগলীতে পোস্টিং ছিলেন।

অন্য আরেকটি মত অনুযায়ী হ্যালহেডকে পঞ্চানন কর্মকারের সন্ধান দেন হুগলীর তৎকালীন ডাচ গভর্নর অস্কার রিবাউট, যাঁর মেয়ে হেলেনার সঙ্গে কিছুকাল পরে হ্যালহেড সাত পাকে বাঁধা পরবেন। পঞ্চানন হয়ত সে সময় হুগলীর ডাচ দুর্গ গ্যাস্টাভাসে (Fort Gustavus) কিছু খোদাইয়ের কাজ করে থাকবেন এবং হ্যালহেড যখন হুগলীতে জন অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানায় তাঁর সদ্য রচিত বাংলা গ্রামার বইটি ছাপাবার উদ্দেশ্যে বাংলা টাইপ বানানোর জন্য একজন ধাতুশিল্পীর সন্ধান করছেন তখন অস্কার রিবাউটের কাছ থেকে তিনি পঞ্চানন কর্মকারের কথা জানতে পারেন।

মোট কথা পঞ্চাননের সঙ্গে উইলকিন্স ও হ্যালহেডের যোগাযোগ যেভাবেই হয়ে থাকুক, সেটা ছিল প্রকৃত সুবর্ণযোগ। ধাতুর ওপর সূক্ষ্ম হরফ মুদ্রণের পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও উইলকিন্সের মত অভিজ্ঞ গাইড পেয়ে পঞ্চানন যে বাংলা হরফগুলি তৈরি করেন সেগুলির নিপুণতা দেখলে আজও বিস্মিত হতে হয়। হ্যালহেডের বইটি যদিও মূলত ইংরাজি ভাষাতেই লেখা, তবে বিশেষ বিশেষ অংশের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে এতে একাধিক বাংলা কাব্যের উদ্ধৃতি (কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই উদ্ধৃতিগুলির জন্যেই প্রয়োজন হয় বাংলা মুদ্রণ শৈলীর। কিন্তু মূল সমস্যাটা ছিল অন্য জায়গায়। বস্তুত সেদিনের সমস্যাটা আজকের দিনে কল্পনা করাও বেশ দুরূহ, কেননা আমরা ছোটবেলা থেকেই বইয়ের ছাপা অক্ষর দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু প্রথমবার ছাপাবার উদ্দেশ্যে যে বাংলা হরফগুলি নির্মিত হবে সেগুলো তৈরির জন্য হ্যালহেড বা উইলকিন্সের কাছে কোনও স্ট্যান্ডার্ড সর্বজনগ্রাহ্য উদাহরণ ছিলোনা। তাঁদের তখন খান-কতক হাতে লেখা পুরনো বাংলা পুঁথিই সম্বল। এবং বলা বাহুল্য, প্রতিটা পুঁথির হস্তাক্ষর লেখক বিশেষে আলাদা আলাদা! ফলে প্রথম ছাপা বাংলা অক্ষরগুলি কেমন দেখতে হবে তাই নিয়ে হ্যালহেড ও উইলকিন্সকে বিস্তর বিপাকে পড়তে হয়। এমত অবস্থায় অবশেষে এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা শরণাপন্ন হলেন হুগলী নিবাসী জনৈক খুসমৎ মুন্সীর, যার সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য এলাকায় সুনাম ছিল। এবং এই খুসমৎ মুন্সীর সুচারু হস্তাক্ষরের আদলেই লোহার ওপর ছেনী ও হাতুড়ির শৈল্পিক কারসাজীতে পঞ্চানন গড়ে তুললেন বাংলার প্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফের ছাঁচ। আর এই হরফ ব্যবহার করেই ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী থেকে প্রকাশিত হল ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত "A Grammar of the Bengal Language"।

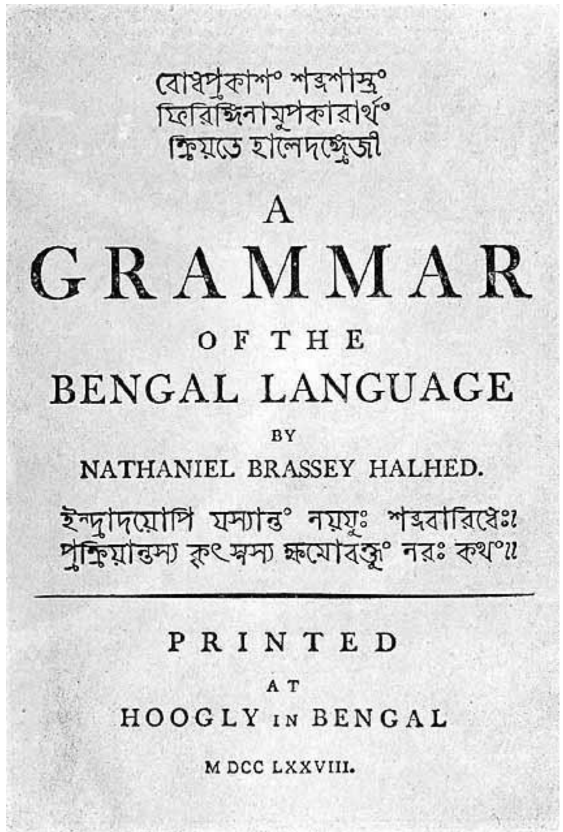

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং।।

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

হ্যালহেড তাঁর এই ব্যকরন বইয়ের শুরুর আখ্যাপত্রে লিখেছিলেন "ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থ"। কিন্তু ফিরিঙ্গীদের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে এই বই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করলো। এর মাধ্যমে মূলত কাব্যধর্মী বাংলা সাহিত্যর সামনে গদ্য রচনার উপযুক্ত এক নতুন নির্মাণের পথ খুলে গেল। আর ব্রিটিশ প্রভুরাও এর সুযোগে বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে আগামী দেড়শ বছর শাসন করার পথে আরও এক কদম এগিয়ে গেলেন। শুধু দুঃখের বিষয় একটাই, যে নেটিভ মুদ্রাকরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসামান্য প্রতিভায় প্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফগুলি প্রস্তুত হল সেই পঞ্চানন কর্মকারের নাম হ্যালহেড একবারের জন্যও উচ্চারণ করলেন না। তাঁর বইয়ের লম্বা ভূমিকায় উইলকিন্স সাহেবকেই তিনি যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়ে গেলেন। আর ইতিহাসও চার্লস উইলকিন্সকেই বাংলা ছাপাখানার জনক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিলো। চির-পরিচিত ব্রিটিশ জাত্যাভিমানের বিদ্বেষমূলক ট্র্যাডিশানের স্বীকার হয়ে ইতিহাসের অগুনতি অকথিত নায়কদের সঙ্গে ইতিহাসের ফুটনোটের এক কোণে নিঃশব্দে রয়ে গেলেন আমাদের ঘরের ছেলে বাংলার প্রথম মুদ্রণ শিল্পী হুগলীর পঞ্চানন কর্মকার।

(ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত)

রূপকথা

মৃণ্ময় ঘোষ

ডিসেম্বর ১৯, ২০১৪

এক যে ছিলো রাখালছেলে
সরল এবং বোকা,
গাছগাছালি, পেরজাপতি
এই নিয়ে তার থাকা।
গরু চরায়, বংশী বাজায়,
খেয়ালখুশি সুরে,
রাজার মহল অনতিদূর
সে সুর ঘোরে ফেরে।
রাজকুমারী, কি সুন্দরী
মায়ার কাজল চোখে,
বাতায়নে আসেন ছুটে
বংশীধ্বনির ডাকে।
সরল সিধে রাখালছেলে
জানে না একটুও,
গুঞ্জে কোথায় বংশীধ্বনি
ভীষণ গোপনীয়।

বংশীধ্বনি বাজতে পারে
অলক্ষ্যে নিভৃতে,
অমন কতো সুর থেমে যায়
রোজের পৃথিবীতে।
রাজকুমারী রাজার মেয়ে
মহল আকাশজোড়া।
রাজারকুমার আসবে চেপে
পক্ষীরাজের ঘোড়া।
এলেন সে এক রাজার কুমার
কান্তি দ্যুতিময়।

রাজপুরীতে নহবতের
শব্দ শোনা যায়।
পালকী চেপে শ্বশুর গৃহে
নতুন রাজবধূ,
কোথাও কি তাও বংশীধ্বনীর
সরল সুরের যাদু,
গুঞ্জে আজও, গোপন থেকে
গোপনতর কোনে।
জানলো না সে রাখাল ছেলে,
বাঁশী বাজায় বনে।

সিধুর ডায়েরি

তুষার সেনগুপ্ত

জানুয়ারী ৮, ২০১৫

এক

বাবার চাকরিসূত্রে কালনার পাট চুকিয়ে কাটোয়ায় এসে ক্লাস টেনে ভর্তি হলুম কাশীরাম দাস ইন্সটিটিউশনে। আমার তখন রোগাসোগা চেহারা। নাকের নিচে গোঁফের রেখার চিহ্নমাত্র নেই। অনায়াসেই সিক্স-সেভেনের ছাত্র বলে চালিয়ে দেওয়া যেত আর মুখের ক্যাবলা চিহ্নটা এখনকার মত তখনও মুখের প্রতিটা রেখায় ফুটে উঠত। একে নতুন স্কুলে প্রথম দিন তাও আবার টেনের মত উঁচু ক্লাস, কোনওমতে প্রেয়ার সেরে গুটিগুটি পায়ে ক্লাসে প্রবেশ। ইতস্ততঃ পায়ে ক্লাসে ঢুকে একেবারে শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসলুম। বসে বসেই অনুভব করতে লাগলুম বেশ কয়েক জোড়া লোলুপ চোখ আমার আপাদ মস্তক চেটে যাচ্ছে। যেন বেশ একটা ঘোরের মধ্যে আছি। হঠাৎ ঘোর কাটল এক মৃদু ধাক্কায়। চোখ তুলে দেখলুম মোটা কাঁচের চশমা পরা, আমারই মত ক্যাবলা চেহারার আমার এক নতুন সহপাঠী, আর তাকে ঘিরে জনাদশেক ছেলে অশেষ কৌতূহলে চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জি দেখার কৌতূহল মেশানো দৃষ্টি দিয়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে চলেছে আমাকে। ওদের দিকে তাকিয়ে মুখে ক্যাবলামি মেশানো দেঁতো হাসি হাসতেই আমাকে লক্ষ্য করে চশমাধারীর তরফ থেকে উড়ে এলো প্রথম প্রশ্নবাণ,

- "নতুন মনে হচ্ছে? তা, খোকার আগমন কোথা থেকে?"

- "কালনার মহারাজা হাইস্কুল থেকে...."

আমায় প্রশ্নের উত্তর শেষ করতে না দিয়েই চশমাধারীর পরবর্তী প্রহার,

- "আগের স্কুলে ফার্স্ট সেকেন্ড কিছু হতিস?"

মুখে কিছু উত্তর না দিয়ে দু'দিকে ঘাড় নাড়াতেই যেন এক প্রশান্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো চশমাধারীর চোখে মুখে। আমার ইন্টারভিউ পর্ব হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত কিন্তু প্রথম পিরিয়ডের বাংলার স্যার সুদেববাবুর আগমন ঘটতেই যে যার সিটে।

এবার ওই চশমাধারীর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। নাম আলয়, একদা ক্লাসের ফার্স্টবয় কিন্তু ক্লাস সেভেনে নতুন ছাত্র সুজয়ের আগমনে আলয়ের সিংহাশনচ্যুতি ঘটে। সেই থেকে ক্লাসে নতুন ছাত্রের আগমন হলেই আলয়ের মনে পুরনো আতঙ্ক তাজা হয়ে যায়।

ভালোয় ভালোয় চারটে পিরিয়ড কেটে গেল, টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই ছেলেরা মুখে বিকট আওয়াজ করতে করতে ক্লাস থেকে বেরোতে লাগলো। আমি তখনও বেঞ্চে বসে, ভাবছি একটু ফাঁকা হলে আস্তে আস্তে বেরবো। কিন্তু হঠাৎ দেখি আমারই ক্লাসের তিন মূর্তি আমার সামনে। প্রথমেই ফর্সামত একটা ছেলে বলে উঠলো,

- "কি বে! নাম কি তোর?"

- "তুষার, তোমার নাম?"

আমার জড়তা মেশানো স্বরে বলা কথা শুনে ফর্সামত ছেলেটা বাকি দু'জনের দিকে তাকিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলে উঠলো,

- "আব্বে দেখ! জ্যেঠুমনি আমায় তুমি বলছে.."

বলেই আমার থুতনিটা একটু নেড়ে দিয়ে বাকি দু'জনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,

- "এর নাম গৌতম আর ও হচ্ছে দেবনাথ আর আমি সিধু। বাড়ি থেকে টিফিন এনেছিস?"

আমি মৃদুস্বরে "না" বলতেই, সিধু বলল,

- "চল! আজ আমরা তোকে টিফিন করাবো.."

গুটিগুটি পায়ে ওদের অনুসরণ করে বেড়িয়ে এলুম ক্লাসরুম থেকে, থামলাম সোজা গিয়ে বাবলুদার আলুকাবলীর ঝুড়ির সামনে। অতঃপর বাবলুদার উদ্দেশ্যে সিধুর নির্দেশ,

- "বাবলুদা! তোমার নতুন কাস্টমার! বেশী করে ঝাল দিয়ে চার আনা করে চারটে দাও চটপট"

শালপাতা ভর্তি আলুকাবলি হাতে নিয়ে সিধুর ইশারায় কড়কড়ে একটা একটাকার নোট বাবলুদার হাতে দিয়ে ওদের পিছুপিছু গিয়ে বসলুম স্কুলের ফুটবল মাঠের একেবারে শেষ প্রান্তে বটগাছের গোঁড়ায়। আলুকাবলি খেয়ে ঝালে একেবারে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে, নাক চোখ দিয়ে জল ঝরছে। জামার হাতায় চোখ আর নাক মুছতে মুছতেই কানে এলো দেবনাথের গলা,

- "বিড়ি খাস?"

আমি আলতো করে "না" বলতেই ভীষণ গম্ভীর স্বরে সিধুর উপদেশ,

- "ক্লাস টেনে পড়ছিস আর বিড়ি খাস না? এতগুলো পিরিয়ডের পড়া! বলি, শক্তি পাবি কোত্থেকে?"

- "না, মানে কোনদিন খাইনি তো..."

আমার কাঁচুমাচু মুখে মিনমিনে উত্তরে সিধুর ঝাঁঝালো প্রত্যুত্তর,

- "নাহ্! তোকে মানুষ করার দায়িত্বটাও দেখছি আমার ঘাড়েই চাপবে।"

বলেই একটা বিড়ি বের করে ধরিয়েই দু'টান দিয়েই আমার হাতে ধরিয়ে দিল। অনভ্যস্ত হাতে সিধুর প্রসাদ ঠোঁটে লাগিয়ে টান দিতেই শুরু হল দমকা কাশি। কাশতে কাশতেই কানে এলো টিফিন পিরিয়ডের বেল পড়লো। আমায় হাত ধরে দাড় করিয়ে দিয়েই সিধু পা বাড়াল ক্লাসের দিকে আর পিছুপিছু আমরা তিনজন।

দুই

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলুম। হঠাত যেন বড় হতে শুরু করলুম। মাকে ম্যনেজ করে এক রোমাঞ্চকর শনিবারে সারারাতব্যপী ফিস্টি করার অভাবিত সুযোগ জুটে গেল। কানুর বাবা মা ওদের গ্রামের বাড়িতে গেছিল বলে ওদের ফাঁকা বাড়িতে আসর বসল। রাত নটায় মুড়ি-আলুরচপ, পেয়াজ কাঁচালঙ্কা সহযোগে সন্ধ্যাকালীন জলখাবার শুরু হল। রান্নার দায়িত্ব গৌতমের। ফিস্টির মেনু খাসীর মাংস আর ভাত। ওই বয়েসেই কানু, দেবার মত দু'চারজন যারা পানাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছিল তারা বসে গেল চানাচুর আর ঝালে বোম্মতালু গরম করা কচুভাজা সহযোগে বাংলুর বোতল নিয়ে। আমরা যারা সবে বিড়িতে টান দিতে শুরু করেছি, তারা বিড়িতে টান দিতে দিতে দশপয়সা কার্ডে ব্রে খেলাতে মত্ত হয়ে গেলুম।

দু'তিন ঘন্টা পরে সবারই খিদে পেতে শুরু করলো। গৌতমকে জিজ্ঞেস করে জানলুম মাংস নামতে এখনো দশ-পনেরো মিনিট লাগবে। কারো হাতেই ঘড়ি নেই। সেই সময় মাধ্যমিক পাশ করলেই রিস্টওয়াচ প্রাপ্তির চল ছিল। সিধুকে জিজ্ঞেস করলাম,

- "কটা বাজে রে?"

অনায়াসেই সিধু পাশের ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে টাইম দেখতে পারত, কিন্তু সেটা না করে দুম করে বাংলুর নেশায় এক অদ্ভুত কান্ড করল। কানুদের ফোনটা তুলে কোথায় যেন ফোন করল। কানে ফোনটা ধরা, মুখে কিচ্ছু বলছে না। আমরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি সিধুর দিকে। মিনিট খানেক পরে ফোনটা নামিয়ে রেখে বলল,

- "রাত একটা মত বাজে.."

- "কি করে বুঝলি?"

আমার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে সিধুর সংক্ষিপ্ত জবাব,

- "মৃণালের বাড়িতে ব্ল্যাঙ্ক কল করলাম, ওর বাবা খচে গিয়ে বলল, কোন শুয়োরের বাচ্চা এই রাত একটায় ফোন করে চুপ করে আছিস বে?"

বলেই সিধু আবার গিয়ে বাংলুর আসরে বসে পড়ল। গৌতমও ঘোষণা করল,

- "মাংস নেমে গেছে, সবাই খেতে আয়..."

তিন

তখন বোধহয় ক্লাস ইলেভেন/টুয়েলভ। আমার চেহারা একেবারে প্যাকাটি, মেরেকেটে ছেচল্লিশ/সাতচল্লিশ কিলো ওজন। সেই সময় আমাদের মত মেদহীন চেহারার কদর একেবারেই ছিল না। বেশ নাদুস নুদুস চেহারার ছেলে দেখলেই মা/কাকীমা/জেঠিমারা গদগদ স্বরে বলে উঠতেন,

- "আহঃ! কি সুন্দর গোপাল গোপাল চেহারা! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, আর আমাদেরটাকে দেখ? যেন জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া! এত চোব্য-চোষ্য খেয়েও গায়ে লাগেনা কেন কে জানে....."

চেহারার হীনমন্যতা বন্ধুমহলে বেশিরভাগেরই ছিল। মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে গায়ে একটু মেদ-মাংসের সংযোগের প্রার্থনা প্রায় সকলেই করত, প্রসূন-সুকুমারের মত দুয়েকজন প্রয়োজনতিরিক্ত ভাগ্যবান ছাড়া। ছয় ফিট উচ্চতা সঙ্গে শতোর্ধ ওজন নিয়ে ওরা আমাদের মত লিলিপুটদের দলে ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম।

গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে এবার আসল গল্পে আসা যাক। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখে ঘরে ফেরার জন্যে হাওড়া স্টেশনে কাটোয়া লোকালের জন্যে অপেক্ষা করছি সবাই মিলে, আমি, গৌতম, নীলে, সিধু..... এবং অবশ্যই প্রসূন। টিপিক্যাল মারোয়াড়ী সুলভ ঘিয়ে ভেজানো চেহারা, মুখে স্বীকার না করলেও আমাদের সকলেরই স্থির বিশ্বাস প্রসূনের দৈহিক ওজন একশো অতিক্রম করেছে। ট্রেনের জন্যে এখনও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটানোর জন্যে সবাই মিলে হামলে পড়লাম ওজন মাপার যন্ত্রের ওপর। দু'একজনের পরে আমারও সুযোগ এলো। কম্পিত বক্ষে চেপে দাঁড়ালাম যন্ত্রের ওপর, কয়েন ঢোকাতেই বেরিয়ে এলো ওজন লেখা টিকিট। দেখেই মনটা খুশিতে ভরে গেল, টিকিটে লেখা 50.5 kg, এবার বোধহয় কাকতাড়ুয়া অপবাদটা ঘুচবে। একে একে সবার ওজন মাপা হল কিন্তু লক্ষ্য করলাম প্রসূন নিরাপদ দূরত্বে দাড়িয়ে। মুখ দেখে মনেই হচ্ছেনা ওজন মাপাতে কোন রকম উৎসাহ ওর আছে। অবশেষে সিধু ওকে একরকম টানতে টানতে এনে দাড় করিয়ে দিল ওজন মাপার যন্ত্রের ওপর। সিধু নিজেই পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে ঢুকিয়ে দিল যন্ত্রে এবং বেরিয়ে আসা ওজন লেখা টিকিটটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। আমাদের সকলের চোখে মুখে তখন পাহাড় প্রমাণ কৌতূহল, সকলেই প্রসূনের ওজন জানার জন্যে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছি। সিধুকে জিজ্ঞেস করতেই চোখে মুখে ভীষণ বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে ঘোষণার ভঙ্গিতে বলে উঠল,

- "টিকিটে লেখা আছে, Use weighing mechine one by one, dnt use more than one person at a time!"

চার

মাধ্যমিকের পরে আমাদের বেলতলার শানবাঁধানো বেদীর আড্ডার স্থানান্তরটা অবশেষে সমরদার চায়ের দোকানের বেঞ্চে হয়েই গেল। আসলে গেমস টিচার নন্দবাবুর সাথে সেদিনের ঘটে যাওয়া বিচ্ছিরি ঘটনাটা না ঘটলে আড্ডাস্থলের এই স্থানান্তরটা অবিশ্যি ঘটতো বলে মনে হয় না। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে হাতে অখণ্ড অবসর। বিকেলের আড্ডাটা শুরু হয়ে যেত বিকেল তিনটেতেই। আড্ডার শুরু স্কুলের ফুটবল মাঠের একেবারে শেষ প্রান্তে বটগাছের গোঁড়ায় আর স্কুলের ছুটি হলেই গুটিগুটি পায়ে বেলতলার শানবাঁধানো বেদীর নিশ্চিত আশ্রয়ে। সেদিনও তিনটে বাজতে না বাজতেই সদলবলে হাজির। সিধুসহ দেবনাথ, গৌতমের সঙ্গে আমরা আরও দু'তিনজন। আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরনো আড্ডার সংসারে যেখানে বিড়ির খরচা জোগাতে বাবার পকেটের খুচরো পয়সা কিম্বা মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা একটাকার কয়েনই ভরসা, সেখানে সেদিন গৌতমের পকেটে দু'দুখানা ফিল্টার উইলস! সবার নজর তখন গৌতমের পকেটে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সিগারেটের সংখ্যা দুই আর তার ওপর নজর ছ'সাত জোড়া তৃষ্ণার্ত চোখের। সিধু আর গৌতম দু'জনে একটা করে সিগারেট ধরিয়ে দু'একটান দিয়ে অন্যকে দিয়ে দিল। কাউন্টারটা আমার হাতেও এলো অবশেষে। মৌজ করে দু'তিন টান দিতেই সিধুর নির্দেশ,

- "ব্যাস! লাস্ট টানটা দিয়ে কাউন্টারটা আমায় দে..."

অতঃকিম! শেষ টানটা দিয়ে কাউন্টারটা সিধুর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই একেবারে চক্ষু ছানাবড়া। যমদূতের মত নন্দবাবু কখন আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারিনি। ততোক্ষণে সিগারেটের কাউন্টার সিধুর হাতে। সিধু চোখ বুজে সুখটান দিতেই নন্দবাবুর হাত সিধুর কাঁধে আর সাথে সাথেই সিধুর মধুর সম্ভাষণ,

- "শুয়োরের বাচ্চা! কাউন্টারেরও কাউন্টার চাস?"

বলে পেছন ফিরতেই নন্দবাবুর চোখে চোখ, আর নন্দবাবুর মুঠোয় সিধুর ডান কান...

সমরদার দোকানের বেঞ্চের আড্ডাটাও দিনদিন জমতে শুরু করল। চায়ের জগতের "একটাকে দুটো", "ঠেকানো" ইত্যাদি মনি মাণিক্য ততদিনে আমার বঙ্গীয় শব্দভাণ্ডারের অমূল্য সঞ্চয় হিসেবে সঞ্চিত হতে শুরু করেছে। পঞ্চাশ পয়সায় একভাঁড় চা, কখনো সখনো অর্থাভাবে একভাঁড়কে দু'ভাগ অথবা একজন একভাঁড় শেষ করার পর অন্যজনের ভাগে ফাঁকা ভাঁড়ে সমরদার ঠেকানো মুফত আধভাঁড় চা। বিড়ির কাউন্টারের মতই চায়ের কাউন্টারও ততদিন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে গেছে। আমাদের ছ'সাতজন ছাড়াও বাইরের কিছু আড্ডাবাজও ভিড়ে গেল এই সমরদার চায়ের দোকানের আড্ডাতে, আর খুব স্বাভাবিকভাবেই সিধুই সেই আড্ডারও মধ্যমণি। সেদিনও সবাইমিলে আড্ডা দিচ্ছি। সেদিন প্রসূনের কল্যাণে সবার কপালে পুরো একভাঁড় চা, "ঠেকানো" সমেত সঙ্গে পুরো বিড়ি। প্রসূন ছিল জাতে মারোয়াড়ী কিন্তু বুদ্ধি আর চিন্তায় ষোলআনা বাঙালী। পৈতৃক ব্যবসায় সময় দেওয়ার প্রতিদানে ওর কিছু হাতখরচা জুটে যেত, যার সিংহভাগই আমাদের ভোগে লাগত। অবিশ্যি আমরাও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রসূনের মত ঘোর নিরামিষাশী মারোয়াড়ীকে গরম গরম ডিমসেদ্ধর স্বাদ আরোহণের মানসিক শক্তি জুগিয়েছিলুম।

সবাই মন দিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছি, সিধুর চোখ রাস্তার দিকে। ঠোঁটের কোনে ঝুলছে সেই বিখ্যাত রহস্যময় হাসি, যার অর্থ ওর মগজে পাক খাচ্ছে আমাদের পক্ষে আকল্পনীয় কোন কাজের পরিকল্পনা। চা খেয়ে ভাঁড়টা ফেলে একটা বিড়িতে ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে গেল সামনের রাস্তার ধারে। সিধুর চোখে চতুর শিকারির দৃষ্টি। হঠাত দেখি একটা ছেলে সিগারেট টানতে টানতে আসছে আর সিধু ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে, "আগুনটা দেখি" বলতেই ছেলেটা বিড়ি ধরাতে নিজের সিগারেটটা সিধুর হাতে দিল এবং সবাইকে চমকে দিয়ে সিধু নিজের বিড়িটা ওর হাতে দিয়ে সিগারেটটা টানতে টানতে বেঞ্চে এসে বসলো। হতবম্ব ছেলেটা কি করবে বুঝতে না পেরে হাঁটা দিল সামনের রাস্তায়।

আমাদের আড্ডা তখন একেবারে তুঙ্গে। মারাদোনা, রুড গুলিটের সঙ্গেই আলোচনায় তখন শ্রীদেবী অথবা পাশের বাড়ির বারান্দায় চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত সদ্যবিবাহিত বৌদি। আমাদের উদ্দাম আড্ডার মাঝেই কানে এলো সিধুর "এ্যাই রিক্সা" বলে সিধুর চিৎকার। আচমকা থেমে গেল আমাদের আলোচনা, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি আমাদের মজলিসকে পেছনে ফেলে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়া একটা রিক্সা ঘুরে এসে সমরদার চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াতেই উচ্চস্বরে সিধুর প্রশ্ন,

- "ভাই, স্টেশনে যাবে?"

রিক্সাওয়ালা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়াতেই সিধু সংক্ষেপে "যাও" বলে অবশিষ্ট সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে যোগ দিল আমাদের আলোচনায়.....

পাঁচ

তখন গড়িয়াতে মেসে থাকতুম। টিউশনের পয়সায় দিন গুজরান। আমহার্স্টস্ট্রীটে দুটো টিউশন সেরে রাত আটটা দশের বারুইপুর লোকাল ধরতুম। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকী ছ'দিন একই ট্রেনে ফেরা। কোনও কোনও দিন একটু আগে এসে পড়লে দাড়িয়ে থাকা ক্যানিং বা ডায়মন্ড হারবার লোকাল ছেড়ে দিতুম। আটটা দশের বারুইপুর লোকালের পেছন থেকে তিন নম্বর কামড়ার বাঁদিকের গেটের ঠিক পেছনের সিটের জানলার ধারের সিটটা আমার বরাদ্দ ছিল, আর তার ঠিক উল্টোদিকের সিটটা, আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এন্ড গাইড শ্রীমান সিধুর। দীর্ঘদিনের পরিচিত সহযাত্রীরা সিটদুটো আমাদের জন্যে ফাঁকাই রাখত। প্রতিদিনের মত সেদিনও আমরা রিজার্ভ সিটে বসে আছি। এক ভদ্রলোক দুহাতে দুটো বড় বড় সুটকেস নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানলার কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলো,

- "দাদা, এটা কি গাড়ি?"

বোধহয় জানতে চাইছিল এটা কোন লোকাল। কিন্তু সিধুর স্বভাবসিদ্ধ নির্লিপ্ত উত্তর,

- "রেল গাড়ি..."

শুনেই ভদ্রলোক একরাশ বিরক্তি মেশানো স্বরে সংক্ষেপে "জানি" বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আটটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। আমার প্রতি সিধুর নির্দেশ,

- "চ, দ'রজায় দাড়িয়ে একটু দম দিয়ে নি।"

তখন ষ্টেশনে বা ট্রেনের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ হলেও এখনকার মত কড়াকড়ি ছিল না। দু'জনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে সবে দু'চার টান দিয়েছি ট্রেন হুইসেল মেরে দিল। ধীরে ধীরে ট্রেন সবে গড়াতে শুরু করেছে, হঠাৎ তিনজন লোক দৌড়তে দৌড়তে আমাদের গেটের সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো,

- "দাদা এটা বারুইপুর লোকাল তো?"

এই ট্রেনেরই যাত্রী বুঝতে পেরে আমার প্রতি সিধুর স্বভাবসিদ্ধ নির্দেশ,

- "মালগুলোকে টেনে তোল!"

সিধুর নির্দেশে আমার রোগাপাতলা শরীরে হঠাৎ যেন যৌবনের রক্ত টগবগ করে ফুটতে শুরু করলো। দু'জনমিলে একহাতে গেটের মাঝখানের রডটাকে শক্ত করে ধরে অন্যহাতে দুজন লোকের হাত খপ করে ধরে এক ঝটকায় কামড়ায় তুলে নিলুম। ইলেকট্রিক ট্রেনতো! হঠাত গতি বেড়ে যাওয়ায় তৃতীয়জন আর উঠতে পারলো না। লোকদুটো তখনও হাঁপাচ্ছে। ওদের সহযাত্রী ট্রেন মিস করে গেল। সিধু বিজ্ঞের মতো সান্ত্বনা দিয়ে বললো,

- "ট্রেনের স্পীডটা হঠাৎ বেড়ে গেল বলে আপনাদের বন্ধুকে তুলতে পারলুম না। না হলে....."

সিধুর কথা শেষ করতে না দিয়েই ওদের মধ্যে একজন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলল,

- "থামো তো হে ছোকরা! অনেক উপকার করেছো আর নয়! যাকে তুলতে পারলে না, আসলে ওই ছিল যাত্রী, আমরা দু'জন ওকে ট্রেনে ওঠাতে এসেছিলাম....."

ওখানে দাড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ মনে হল না। টুকটুক করে নিজের সিটে গিয়ে বসে পরলুম।

ছয়

আমাদের মেসের দু'একজনের স্টেডি গার্লফ্রেন্ড থাকলেও অধিকাংশের অবস্থাই ছিল বড্ড নড়বড়ে। পুজো এলেই সবার বুকে অদ্ভুত এক ধড়ফড়ানি, নড়বড়ে গার্লফ্রেন্ড হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়, আর তাহলেই পুজোর কয়েকটা দিন সিধুর হাত ধরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভবঘুরের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরা। কথায় কথায় সিধুর কথা যখন উঠেই গেল তখন সিধুর সাথে সবার পরিচয়টা সেরেই ফেলা যাক। মেসের অভিভাবক বা রিংমাস্টার বিদ্যুৎ অন্যদের

সবথেকে কাছের লোক হলেও সিধু আর আমি ছিলাম হরিহর আত্মা। হয়তো আমার আর সিধুর পাগলাটে চিন্তাভাবনার মিলই আমাদের অন্তরঙ্গতার অন্যতম কারণ ছিল। হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে বসতো সিধু, পরিণতির কথা না ভেবেই। স্কিন ডিজিজে ভোগা, দেহের নিষিদ্ধ অঞ্চলে দৃষ্টিকটুভাবে সারাদিন ধরে চুলকোতে থাকা নির্মলদাকে জন্মদিনে সেলিকল উপহার দেওয়া অথবা ক্লাসমেট ঋতুপর্ণার দাদার বিয়ের ভোজে আইসক্রিম মনে করে হাত ধোয়ার সাবান জল খাওয়া এবং ক্লাসে সবার সামনে সেটার দুঃসাহসিক স্বীকারোক্তি বোধহয় কেবলমাত্র সিধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। যদিও সাবান জল খাওয়াতে সিধুর পাগলামি মোটেও দায়ী ছিলনা। গ্রামের গন্ধ লেগে থাকা কাটোয়ার মত আধা শহর থেকে আসা একটা ছেলের কাছে সপ্রতিভভাবে বালিগঞ্জের অভিজাত এলাকার ম্যারেজ হলের ক্যাটারার পরিচালিত বিয়ের ভোজ খাওয়াটা, আমার কাছে শোয়েব আখতারের বাউন্সারের মুখোমুখি হওয়ারই সামিল ছিল। সেই সময় আজকালকার মত বিয়ের ভোজ মানেই বুফে সিস্টেম ছিল না। টাই পড়া ছেলেরা সেজে গুজে টেবিল চেয়ারে বসা নিমন্ত্রিতদের খাবার পরিবেশন করত। সিধুও সেদিন অপ্রস্তুত হাতে মেনুকার্ড মিলিয়ে মিলিয়ে একটার পর একটা পদ খেয়ে যাচ্ছিল, পাতে মিষ্টিও পড়ে গেছে শুধু আইসক্রিম দেওয়া বাকী। কিন্তু ক্যাটারারের গর্দভগুলো আইসক্রিমের আগেই প্লাস্টিকের বাটিতে করে হাত ধোয়ার সাবানজল দিয়ে যাবে, সেটা ইতিপূর্বে কেবলমাত্র কাঠি দেওয়া আইসক্রিম খাওয়া সিধুর পক্ষে তো বুঝতে না পারারই কথা। অতএব যা ঘটার কথা ছিল, ঠিক সেটাই ঘটলো, আইসক্রিম মনে করে সাবানজলের বাটি তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ.....

পুজো এলেই আমাদের মেসের রিংমাস্টার বিদ্যুতের ব্যস্ততাটা হঠাৎই ভীষণ বেড়ে যেত। বিদ্যুৎ ছিল পাক্কা ইভেন্ট ম্যানেজার অথবা ট্যুর প্রোগ্রামারও বলা যেতে পারে। পুজোর সময় বর্ধমানে নিজের গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার আগে সবার জন্যে আলাদা আলাদাভাবে গার্লফ্রেন্ড সহযোগে ষষ্ঠীর সকাল থেকে দশমীর সন্ধে পর্যন্ত প্রোগ্রাম সাজিয়ে দিত নিখুঁতভাবে। কোলকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত লাভারস পয়েন্টের প্রতিটি বিন্দু যেন বিদ্যুতের নখদর্পণে। বাবুঘাটের কোন জায়গাটা সবথেকে বেশী নিরিবিলি, সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের কোন বেদীর গার্ড একটু বেশী উদার, ভিক্টোরিয়ার কোন ঝোপে নিশ্চিতভাবে ক্যামেরা বসানো নেই অথবা ঢাকুরিয়া লেকের কোন গাছের আড়ালে বসলে পথচলতি মানুষের নজর এড়ানো যাবে ইত্যাদি টেকনিকাল ব্যাপারে বিদ্যুৎ ছিল গুগলের তৎকালীন সংস্করণ। অতএব পুজোর ঠিক আগের সপ্তাহে কলেজ যাওয়াতো দূরের কথা ঠিক সময়ে স্নান খাওয়াও করতে পারতো না বিদ্যুৎ। সেদিন সন্ধে বেলাতেও চলছে কৌশিকের সাথে বিদ্যুতের বিশেষ সেশন। কৌশিকের আনা ফিল্টার উইলস টানতে টানতে চলছে বিদ্যুতের ক্লাস, মনযোগী ছাত্র কৌশিক আর ওদের ঘিরে অসীম ঔৎসুক্য মাখানো মুখে ঘিরে আছে এই অধমসহ বাকী দশ-বারোজন। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই সিধু উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করল,

- "এবার ভাবছি পুজোর কটাদিন গার্লফ্রেন্ডের সাথে চুটিয়ে প্রেম করব। বিদ্যুৎ, আমার জন্যে একটা রোমান্টিক প্রোগ্রাম বানা তো..."

সবাই হতচকিত হয়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে সিধুকে জায়গা ছেড়ে দিল কৌশিক। অকল্পনীয় টাস্ক পেয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে লাগলো বিদ্যুৎও। ঘন্টাখানেক ধরে একটা গা ছমছমে, রোমান্টিক পরিকল্পনা ছকে দিয়ে গর্বিত মুখে বিদ্যুৎ সিধুকে জিজ্ঞেস করলো,

- "কি বস্, খুশি তো?"

- "কিন্তু একটা প্রবলেম থেকেই গেল.."

বলেই মুখে বিজ্ঞের মত অদ্ভুত একটা ভাব করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো সিধু। আমরা ভরকে গিয়ে সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলাম,

- "কিন্তু প্রবলেমটা কি বলবি তো?

- "বিদ্যুৎ প্রোগ্রামটা চমৎকার হকেছে, আমারতো ভাবলে এখন থেকেই শরীর গরম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাইসব আমার ছোট্ট একটা প্রবলেম আছে। আর সেটা হচ্ছে গিয়ে, আমার গার্লফ্রেন্ডটাই এখনও জোগাড় হয়নি...."

বলেই সামনে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে নিয়ে একটা সিগারেট ফস্ করে জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সিধু....

পরিবেশ পরিচিতি

প্রত্যয়

ফেব্রুয়ারী ৪, ২০১৫

ছোটবেলায় আমার প্রিয় ক্লাস ছিল পরিবেশ পরিচিতি। আমাদের ইস্কুল, অর্থাৎ পাঠভবনে, ছোটবেলায় বিজ্ঞান বলে কিছু পড়ানো হত না। তার বদলে ছিল এই ক্লাস। প্রাইমারি থেকে হাই স্কুলে ওঠার পর "বিজ্ঞান" পড়ানো শুরু হয়। অবশ্য আমাদের ইস্কুলে প্রাইমারি-হাই এর আলাদা কোনো ভাগ ছিলনা, স্রেফ বোঝাবার সুবিধের জন্য বলছি।

শান্তিনিকেতনে যে গাছের তলায় ক্লাস হয় তা অনেকেই জানেন। অনেকে এমনও ভাবেন যে এতে করে নাকি ভাল করে পড়াশুনা করা যায়না। মন অন্যদিকে চলে যায়। আসলে ঠিক উলটো। বাইরের ফ্রেশ হাওয়ায় বসে প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষার এই যে প্রচলন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার জবাব নেই। ঝড়-জল না হলে এর মত সুন্দর ব্যবস্থা হয়না। বিশ্বভারতীতে হাজারটা সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু শিশুদের শিক্ষার যে পরিবেশ সেখানে রয়েছে, তা চমৎকার! বরং পরে যখন অন্য জায়গায় পড়াশুনা করেছি, বদ্ধ ক্লাসরুমের মধ্যে নীলচে কৃত্রিম আলোয় বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে যেত। যাই হোক, সে সব নিয়ে রবি ঠাকুর অনেক অনেক লেখা লিখেছেন, শিক্ষাবিদরাও দিস্তে দিস্তে কাগজ খরচ করে ফেলেছেন। সে নিয়ে নয়, আজ বলব ওই পরিবেশ পরিচিতির কথা।

বিষয়টার নাম শুনেই হয়তো কিছুটা আঁচ করতে পারছেন কি ধরণের জিনিস শেখানো হত। একেবারে ছোটবেলায়, অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান-টু তে গল্পের ছলেই শেখানো হত নানা জিনিস। মাঝে মাঝে শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল বেঁধে ঘোরাতেন আশ্রম চত্বরের বিভিন্ন জায়গায়, চিনিয়ে দিতেন কোনটা দেবদারু গাছ, কোনটাই বা ছাতিম, জারুল, অর্জুন কিম্বা শিশু। বেশ মজার ছিল এই আউটিং গুলো।

খুব সম্ভবত ক্লাস থ্রি নাগাদ প্রথম খোকাদার ক্লাস করি। খোকাদা (ভাল নাম মনোরঞ্জন দা, কিন্তু খোকাদা নামেই সর্বত্র পরিচিত ছিলেন) ছিলেন পরিবেশ পরিচিতির বিখ্যাত শিক্ষক। আসলে কেমিস্ট্রির লোক, কিন্তু তাঁকে বেশি মনে রয়েছে এই ক্লাসের জন্যই। বড়সড় চেহারা, গায়ের রঙ কালো, মাথায় চুলের অভাব, সেই সঙ্গে জাঁদরেল ব্যক্তিত্ব। সব মিলে দেখে একটু ভয় ভয়ই করত। মাঝে মাঝেই মজার মজার কথা বললেও হাবেভাবে আর গম্ভীর গলার আওয়াজে সবসময়ই যেটা থাকত সেটাকে এখন আমরা বলি "অ্যাটিচিউড"। ব্যাটারির মত মোটা মোটা আঙুল ওয়ালা ওই হাতের একটা থাপ্পড় খেলে কি দশা হবে সেই নিয়ে বন্ধুরা বলাবলি করতাম।

এ হেন খোকাদার ক্লাস নেবার কায়দাটা ছিল বেশ অন্যরকম। ক্লাসের মধ্যমণি হয়ে থাকতেন তিনি, আর চারপাশে অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসিয়ে দিতেন ছেলেমেয়েদের। তারপর কুইজের স্টাইলে নানান প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নগুলো হত এই ধরনের - "একটি পাখির নাম লেখো যারা বীরত্ব দেখাতে অনেএএএক উঁচুতে উড়ে যায়, তারপর ডানা বন্ধ করে ধপ করে পড়ে মরে যায়!" কিম্বা "একটি উদ্ভিদের নাম লেখো যারা চলাফেরা করতে পারে"। একটা

করে প্রশ্ন দিতেন, আর ছাত্রদের কাজ ছিল উত্তর লিখে নিয়ে গিয়ে উঠে গিয়ে ওনাকে দেখিয়ে আসা। বেশ খেলা খেলা ব্যাপার ছিল একটা, সবাই উত্তর লিখে হুড়মুড়িয়ে ছুটত খাতা দেখাতে। ঠিক হলে টিক আর ভুল হলে ঘ্যাচাং করে কেটে দিয়ে সবার দেখানো হলে উত্তরটা বলে দিতেন – "যাদের হয়নি, সবাই লিখে নাও..."

খোকাদা মাঝে মাঝে গল্প বলতেন। ওনার গল্প বলার স্টাইল ছিল অনবদ্য। সাধারণত গল্পগুলো হত ভূতের গল্প কিম্বা থ্রিলার। সাধারণ ক্লাসের ঠিক উলটো হত সেদিন। সবাই ওনার বেদীর একদম কাছে ঘনিয়ে এসে বসত। দু হাত নেড়ে গলার মধ্যে অদ্ভুত রহস্য রোমাঞ্চের ছোঁয়া এনে যেভাবে বলতেন, দিনের আলোতেও শুনে গা ছমছম করত। গল্প উনি নিজে থেকেই বলতেন, মাঝে মাঝে আমরা বায়নাও করতাম বটে, তবে ওনার কাছে বেশি ঘ্যান ঘ্যান করার মত সাহস ছিলনা।

পরে একটু বড় হয়ে, যখন প্রথম ডার্টি জোকস ইত্যাদি শিখছি, তখন একটা গল্প শুনেছিলাম। একবার নাকি টীচার্স ডের দিন একটি সিনিয়র ছাত্র বাচ্চাদের ক্লাস নিতে গিয়ে খোকাদাকে নকল করে গল্প বলছিল। ওনার স্টাইলকে নকল করে হাত নেড়ে খিল্লি করাই বোধহয় তার উদ্দেশ্য ছিল। সে নাকি বলেছিল "একটা ব্রিজ... কুয়াশায় ঢাকা... দু দিক থেকে দুটো ট্রেন আসছে একই লাইনে! আরও কাছে আসছে... ব্রিজের মাঝামাঝি এসে দুম করে তাদের মধ্যে ধাক্কা লাগল! ...আর খোকাদার ইয়েটাও দুম করে ফেটে গেল!" সে বেচারা জানতনা খোকাদা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ পিঠে কিল চড়ের বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়! এখন ভাবলে মনে হয় এ গপ্পটা নির্ঘাত আমার ফচকে বন্ধুগুলোর কারুর মস্তিষ্কপ্রসূত, কিন্তু তখন একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হয়নি।

হ্যাঁ, খোকাদা মাঝেমধ্যে কিল চড় লাগাতেন বটে, তবে যতটা গর্জাতেন তত বর্ষাতেন না। মাঝে মাঝেই বলতেন "ধোপার কাপড় কাচা দেখেছ? অ্যাঁ? ওইরকম করে তুলে আছাড় মারব!" তাঁর ধমকানোর আরেকটা প্রিয় ডায়ালগ ছিল "বৃন্দাবন দেখেছ? বৃন্দাবন? এক থাবড়া মেরে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেব!" ওই পাঞ্জা দেখলে মনে হত সত্যি দিলেও দিতে পারেন। আমাদের বন্ধু অর্ণব মিত্র ছিল ভারি ফাজিল। সে একবার "বৃন্দাবন দেখেছ" এর উত্তরে "হ্যাঁ!" বলে উঠেছিল। তারপর এমন ধমক খেয়েছিল যে আর পালানোর পথ পায়নি। আরেকবার পরিবেশ পরিচিতির একটা প্রশ্ন – "একটি প্রাণীর নাম লেখো যারা দল বেঁধে নাচগান করে" – যার উত্তর হবে ডলফিন – এর উত্তরে অর্ণব লিখেছিল "মানুষ"। খোকাদা ধমক দিলেও পরে নিজের প্রশ্নের ফাঁকটা বুঝতে পেরে প্রশ্নটা পালটে নিয়েছিলেন – "...যারা মানুষের মত দল বেঁধে নাচগান করে"।

পরিবেশ পরিচিতির পাট চুকিয়ে হাই স্কুলে ওঠার কিছুদিন পরই অর্ণব আমাদের ছেড়ে চলে যায়। ব্লাড ক্যান্সারে। খোকাদাও চলে গেছেন বেশ কিছুদিন হল। হঠাৎ ভাবতে গিয়ে মনে হল এর মাঝে অনেএএক গুলো বছর কেটে গেছে। এখনকার পাঠভবনে পরিবেশ পরিচিতির ক্লাস কেমন হয় কে জানে?

ভয়

সদাধন খাঁড়া

মার্চ ৭, ২০১৫

কে যে কিসে ভয় পায় বলা খুব মুশকিল। কারো ভয় ভূতে, কেউ ভয় পায় মৃত্যুকে, আবার শুনছি কেজ্রিওয়াল নাকি আজকাল একাধিপত্য হারাবার ভয় পাচ্ছেন।

ভয় দেখানোর ব্যাপারটা আরো মজার। কে কিসে ভয় পাবে সেটা বুঝতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কিল। এই ধরুন বস্টনে বোমা ফেটে দুজন মরার পর লোকজনের যা ভয়, একই দিনে আমেরিকার ড্রোন আক্রমণে জনা তিরিশ মরলেও সে নিয়ে সেরকম ভয় নেই। এখানে অবশ্য ভয় পাওয়া না পাওয়াটা আমাদের উপমহাদেশের লোকের দৃষ্টিতে বলছি। লোকাল লোকেদের কথা বলছিনা, বাড়ির পাশে বোমা ফাটলে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, কেউ মরুক বা না মরুক। টেররিস্টদের সেজন্য অনেক মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়। একদল টেররিস্ট যেমন ইয়েমেনে বিল্ডিং উড়িয়ে দিল কদিন আগে, কিন্তু তারা জানতনা একই দিনে প্যারিসে কার্টুনিস্টদের ওপর গুলি চলবে। বেচারা ইয়েমেনি টেররিস্টরা কোনো ফুটেজই পেল না বাইরের লোকের কাছে। সব ফুটেজ নিয়ে গেল শার্লি এবদো। অথচ, ইয়েমেনে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় দশগুণ!

অর্থাৎ কতটা ড্যামেজ হল সেটা আসল কথা না, কিভাবে ড্যামেজটা করা হচ্ছে সেটাই আসল। আমেরিকানরা মৃদুভাবে ড্রোন দিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকে মারলে সেরকম চ্যাঁচামেচি হয়না, কারণ ওটা তো কোল্যাটেরাল ড্যামেজ, মূল উদ্দেশ্য তো মহৎ। ওয়ার এগেইন্সট টেররিজম! আমাদের মোদিজী যেমন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের নামে বা নিউক্লিয়ার ডীলের নামে সাধারণ মানুষের প্রাণের দামে ডিস্কাউন্ট দিয়ে পয়সাওয়ালাদের কাছে বেচে দিলে সেটাও সেভাবে আমাদের মনে দাগ কাটেনা। কিছু মাকু ফাকুরা একটু দুদিন চ্যাঁচায়, কিন্তু ফাইনালি তারাও কিছু কাজের কাজ করে উঠতে পারেনা। সাদা চামড়ার সায়েবদের দেশে আঁটো সিকিউরিটির মধ্যে ছিদ্র খুঁজে একজন মানববোমা ফাটালে শিউরে উঠি আমরা। আফগানিস্তান কিম্বা ইয়েমেনে তো এসব হওয়ারই কথা, ও নিয়ে আর চাপ নেবার কি আছে? নাকি মোল্লারা মোল্লাদের মারছে, তাই হেলদোল নেই?

এই ভয় পাওয়ানোর সাইকোলজিটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমার তো মনে হয় টেরোরিস্ট হতে গেলে ভয় পাওয়ানোর সেরা উপায় বলে একটা কোর্স করা উচিত। কিভাবে মারলে সবচেয়ে বীভৎস হবে, সবাই শিউরে উঠবে! তা না হলে আর সন্ত্রাস কি হল? সম্প্রতি অভিজিত দা কে মেরে দিয়েছে ওরা। কুপিয়েই মেরেছে, ওটাই বাংলাদেশের জাতীয় পদ্ধতি, খুন করার। বেশ রক্তারক্তি হয়েছে, কিন্তু সেটা আসল কথা না। আসল কথা হল মোটে ওই কদিনের জন্য একবার দেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাবড়ে দিয়েছে, এক মুহূর্ত দেরি করেনি। এই ব্যাপারটা ভাবতেই গা হিম হয়ে আসে!

আমরা অনেকে দেখছি একদল "সাধারণ" মুসলমান এই মৃত্যুকে সেলিব্রেট করছে দেখে শকড হচ্ছি। অথচ আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রিয় শাসকদলের যোগী আদিত্যনাথের সভায় যখন বলা হল মুসলমান মা বোনেদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণ করা উচিত, সে নিয়ে অতটাও গা হিম হল না (সঙ্গে এটাও দেখবেন)। এটা কি শুধুই হিপোক্রিসি? না বোধহয়। আসলে আমরা জানি ওই হিন্দু লোকগুলো যতই মুখে বাতেলা দিক, কাজের বেলায় লবডঙ্কা। খুনোখুনী একেবারে করেনা তা নয়, দাঙ্গাও লাগায় মাঝে মাঝে। কিন্তু দাঙ্গা তো ফেয়ার প্লে, দু দলের লোকেরা একে অপরকে কেলাও। এবার যে কোনো খেলার মতই একদল বেশি শক্তিশালী হবেই। এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। কিন্তু ওই ভীতু হিন্দুগুলো মাঠে নেমে মুসলমানদের লাশ ফেলে দেবে, অতটা ধকও ওদের নেই। তাই আমরা চেয়ারে হ্যালান দিয়ে বসে আছি আপাতত।

অন্যদিকে মুসলমানরা হচ্ছে যোদ্ধার জাত। সত্যি কথা বলতে কোরান লেখাই হয়েছিল যুদ্ধের কথা মাথায় রেখে। যোদ্ধাদের ধর্ম বুক চিতিয়ে খুন করার ধর্ম হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? ওটাকে যে ত্যানা পেঁচিয়ে "শান্তির ধর্ম" এর মোড়কে মুড়ে ফ্যালা গেছে, সেটাই বরং বড় অ্যাচিভমেন্ট। তাই ভয় দেখানোর লড়াইতে "বীর" যোদ্ধার জাত মুসলমানরা এগিয়ে থাকবে এটা সাম্প্রদায়িক মন্তব্য না, ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু, এটা ভুললে চলবেনা, ওই বীরদের বীরত্বের আড়ালে আছে মৃত্যুর পর দোজখের আগুনে পোড়ার ভয়। ভয় দেখানোর সাইকোলজিটা, বুঝলেন দাদা, বড়ই ইন্টারেস্টিং!

দু দিনের ভাল্কি

অতনু

জুন ২৫, ২০১৫

শেষমেষ বেরিয়েই পড়লাম। হানিমুন সেরে আসার পর তিন-তিনটে বেরানোর পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে নানা কারণে। এবার তাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আর কিছু না হোক একটা সপ্তাহান্তিক ট্যুর তো হতেই পারে! কিন্তু সে গুড়ে বালি। শনি-রোববারে বা ছুটির দিনে সর্বত্রই ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই দশা। শীতের ছুটিতে বাঙালীকে ঘরে আটকে রাখে এমন বাপের ব্যাটা কে আছে? তাই কর্মসংস্কৃতিকে চুলোয় তুলে সোমবার দেখেই টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম। গন্তব্য প্রথমে বর্ধমান, তারপর গাড়ী বদল করে মানকর। ঘর তো ফোনেই বুক করা ছিল। স্টেশন থেকে কিভাবে যাব জানতে অরণ্য সুন্দরীর ম্যানেজার মশাই গাড়ীর ফোন নং দিয়ে দিলেন। সেইমত মানকর স্টেশনেই কেষ্টবাবু গাড়ী নিয়ে হাজির।

সেই গাড়ীতে চেপে রাঙামাটির পথ বেয়ে এগিয়ে চললাম। মিনিট কুড়ি যাওয়ার পর চোখে পড়ল বনদপ্তরের সাইনবোর্ড। দুপাশে শাল পিয়ালের জঙ্গলের মাঝে পিচরাস্তা। আরো মিনিট দশেক পর বাঁদিকে টার্ন নিয়ে ঢুকে

পড়লাম অরণ্য সুন্দরীতে। সামনেই একটা কুচকুচে কালো ভালুকের মূর্তি স্বাগতঃ জানালো ভালকি মাচানে। আউশগ্রাম ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি এই গেস্ট হাউসটা তৈরী করেছিল। এখন লীজে দেওয়া আছে। চাকচিক্যর অভাব থাকলেও আতিথেয়তায় একশোয় একশো। জঙ্গলের মাঝে নিরালায় নির্ঝঞ্ঝাটে দুটো দিন কাটানোর পক্ষে আইডিয়াল। এখানে থাকার জায়গা এটাই। ৩ কিমি দূরে যমুনাদিঘি-আম্রোপালি মৎস প্রকল্পের ভেতরেও থাকা যায়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে থাকার মজাটা সেখানে মিলবেনা। তবে বর্ষাকালে, মাছের চারা বোনার সময় ওখানে থাকতে পারেন। আমরা যখন ঢুকছি হোটেলে তখন বেহালা থেকে একটা চল্লিশজনের দল এসেছিল। তাদের হইহুল্লোড়ে জঙ্গল জমজমাট। আমাদের দেখে তো ওদের চোখ কপালে! "এই অজ গাঁয়ে দুজনে কি করবেন মশাই? ও আমাদের পোষায় না। লোক না হলে কথা বলব কার সাথে?"

ঘরে ব্যাগপত্তর রেখেই বেরিয়ে পরলাম। শালবনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে দিব্যি লাগছিল।

নামে ভালকি মাচান হলেও ভালুক কেন কোন জন্তু জানোয়ারেরই দেখা মিলবেনা এক সাপ আর পাখি ছাড়া। অবশ্যি কিছু দুপেয়ে জানোয়ারের দেখা পেতে পারেন। তাঁরা তাঁদের লীলাখেলার স্মারক যেমন কাগজের ডিশ, খাবারের

প্যাকেট, জল আর মদের বোতল চারদিকে ছড়িয়ে অরণ্যের পরিবেশকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে গেছেন। জঙ্গল পেরিয়ে পিচরাস্তায় উঠতেই নজরে পরল রাস্তার ওপারে পোড়া ইঁটের কাঠামো। মাঝখানের সলিড বডি থেকে চারটে পিলার উঠে গেছে। তলার টানেল দিয়ে এদিক থেকে ওদিকে কোমর ভাঁজ করে চলে যাওয়া যায়। মেঝেতে একটা সুরঙ্গের মুখ। এটার অন্য মুখ নাকি আছে বর্ধমানের রাজবাড়িতে। গোয়েন্দা গণ্ডালু থাকলে নিশ্চয়ই ঢাকনা সরিয়ে সুরঙ্গের ভেতর নেমে পরত গুজবের সত্যতা যাচাই করতে। এই পোড়ামাটির কাঠামোটা আসলে একটা ওয়াচ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ। এখানে বসে বর্ধমানের রাজারা ভালুক শিকার করত। আর তাই থেকেই জায়গাটার নাম ভালকি মাচান (Bhalki Machan)। এখন সে রাজাও নেই, সে ভাল্লুকও নেই। তাদের বদলে পেলাম এক যুগলকে ওয়াচ টাওয়ারের সামনে সাইকেল দাঁড় করিয়ে যারা প্রেমালাপে মগ্ন। ওদেরকেই অনুরোধ করলাম আমাদের দুজনের একটা ছবি তুলে দিতে।

"ভালকি" নামটার উৎস সম্বন্ধে অন্যরকম গল্পও চালু আছে।

এরকম একটা গল্প হল এক ভল্লুকী জঙ্গলে একটা মানুষের বাচ্ছাকে কুড়িয়ে পায় ও তাকে মাতৃস্নেহে পালন করে। সেই ছেলেটি পরে রাজা হয়। তাদের বংশই হয়ত ভল্লু রাজবংশ হিসেবে পরিচিত হয় এবং বর্ধমান রাজা নয়, এই ওয়াচ টাওয়ারটা ছিল সেই ভল্লু রাজাদের। আরেকটি বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বলছে একদা এই এলাকায় ঋষি ভল্লুপাদ ঘাঁটি গেড়েছিলেন। তারপর তাঁর আশ্রমকে কেন্দ্র করে ভালকি গ্রাম গড়ে ওঠে।

খিদেয় চুঁইচুঁই পেট নিয়ে যখন ঘরে ফিরলাম বেহালার দল ততক্ষণে চলে গেছে। জঙ্গল আবার ফিরে যাচ্ছে তার শান্ত গাম্ভীর্য্যের ট্রেডমার্কে। দুপুরের খাওয়াটা বেশ ভালোই হল, ভাত, ডাল, আলুভাজা, মাছ, ... বেশ ঘরোয়া রান্না। রাত্তিরে হয়েছিল মুরগীর মাংস। গেস্ট হাউসের সামনেই একটা পুকুরকে ঘিরে সুন্দর ফুল আর নানা গাছের বাগান। বিকেলের দিকে ওখানে বসেই সময় কেটে গেল। কখন যে সুয্যিমামা ডুব দিয়েছে আর ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে খেয়ালই করিনি। মোবাইলের আলোতে ঘরে এলাম। এখানে বিদ্যুৎ নেই। হোটেল চলে জেনারেটরে।

পরদিন ঘুম ভাঙল শিশিরের শব্দে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ছাদে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ফুল সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট চাপিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। চারধার কুয়াশায় ঢেকে গেছে। টুপটাপ করে শিশির পড়ছে। মাঝে মাঝে পাখি ডাকছে। একটাই পাখি। সেও বোধহয় আমাদের মত শহর থেকে হয়ত বা পথ ভুলেই এসে পড়েছে। তাই বাসায় ঘুমিয়ে না থেকে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আনন্দে শিষ দিচ্ছে। আস্তে আস্তে কুয়াশা কাটল, আলো ফুটল, গেস্ট হাউসের লনে লোকের আনাগোনা দেখা গেল। আমরা নামলাম, চানটান করে নিতে হবে, গরম জল চাইলেই মিলবে। লুচি তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারব। তারপর গাড়ী আসবে, একটু এদিক ওদিক ঘুরে ফেরার ট্রেন ধরব।

প্রয়োজনীয় তথ্য - কলকাতা থেকে ভালকির দুরত্ব ১৬০ কিমি। কলকাতা থেকে গাড়ীতে বা ট্রেনে যেতে পারেন। নিকটবর্তী স্টেশন বর্ধমান-আসানসোল লাইনের মানকর। থাকার জায়গা বলতে অরণ্য সুন্দরী (ফোনঃ ৯৪৩৪৫৩৭৫৪৫)। দেখে নিতে পারেন ভালকি গ্রামে কিছু পুরনো মন্দিরের ধংসাবশেষ, যমুনাদিঘী মৎস প্রকল্প, ইছাই ঘোষের দেউল (৬০ কিমি)। চাইলে অরণ্য সুন্দরীর সামনের পুকুরটায় বোটিং করতে পারেন বা আদিবাসীদের নাচ দেখতে পারেন। লজের কর্মীদের বললে তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

দু দিনের ভাল্কি

শোনা ঘটনা

হস্তিমূর্খ

আগস্ট ১, ২০১৫

ছেলেবেলা থেকেই বড় একটা ঝোঁক ছিল না তার কেনাকাটার দিকে। একটি মাত্র জিনিস কেনার জন্যে সে বড় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারত, দিন সপ্তাহ, মাসের গন্ডি ছাড়িয়ে বছরে পা ফেলত, তবু হাল ছাড়ত না, কোনও না কোনও সময়ে ঠিক কিনেই ফেলত। এখনও হয়ত পারে। সবার মতে সে বড় অকাজের জিনিস। কাজের জিনিস সে না চাইতেই যা পেত, তাতেই চলে যেত অনেকদিন। অনেকবার বলার চেষ্টা করেছে তাকে যেন সেই জিনিসটাই উপহার দেওয়া হয় যেটা তার আদত কাজে লাগে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। প্রায় কেউই তার কথায় কান দিত না। এমনকি একদিন যাদের জন্যে সেইসব অকাজের জিনিসের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল তারাও যখন মুখ ফিরিয়ে নিল তখন নিজের ওপরেই ভরসা করে থাকা একমাত্র উপায় হিসেবে বেছে নিল সে। তবু তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। একদিন না একদিন তাকে ফাঁদে পা দিতেই হল। কেজো জিনিস কেনাকাটায় নাম লেখাতে হল।

ঐ যে কাজের জিনিস কেনাকাটা, তার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ কার্যত একা থেকে দোকা হওয়ার বাসনা থেকেই সৃষ্টি। কুঁজোরও তো চিৎ হয়ে শোওয়ার সাধ জাগে। এই ছেলেটির মনেও একইরকম ইচ্ছে জেগে উঠল তার বিয়ের পরে প্রথম পুজোতে। নববিবাহিতা স্ত্রীকে, বিশেষ কিছু নয়, একটি শাড়ি, তবে সে শাড়ি যেন হয় অন্যতম সেরা, কিনে দিতে সে উতলা হয়ে উঠল। শাড়ি সে বিস্তর দেখেছে, একেবারে পাতে না দিতে পারার মত পাতি না হলে অপছন্দ হয়েছে এইরকম কখনও ঘটেনি। এত এত শাড়ি পরে কলকাতা শহরে মহিলাকুল ঘুরে বেড়াচ্ছে সে তো কেউ না কেউ কিনছেই। অনেক চিন্তাভাবনা করে শেষ অবধি সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে এই নতুন ভেঞ্চারটিতে নাম লিখিয়ে ফেলল। তবু প্রথম পদক্ষেপ – একেবারে আনাড়ির মত পা ফেললে বিপদ হতে পারে অতএব ভেঞ্চারটি অচিরেই জয়েন্ট ভেঞ্চারে পরিণত হল।

কোনও এক শনিবার, বিকেল বেলা কলেজস্ট্রিটের মোড়ে ছেলেটির সাথে তার স্ত্রীর দেখা হল। শুভস্য শীঘ্রম, সময় নষ্ট না করে সরাসরি ঢুকে পড়ল একটি শাড়ির দোকানে। মেয়েটি আত্মহারা, ছেলেটির চক্ষু চড়কগাছ। কাউন্টার থেকে প্রথম তিন টিয়ারে তিলধারণের জায়গা নেই, তা সত্বেও, মারধোর খাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটি মেয়েটির পিছু নিয়ে কলকাতা শহরতলীর লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্বল করে সেই চক্রব্যূহ ভেদ করে কোনও রকমে তার স্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে 'ওইটা ওইটা, উঁহু ওইটা নয়, ও-ও ই যে ওইটা', 'দাদা একটু দেখি', 'আচ্ছা এইটার অন্য কোনও কালার' – এইসব নানাবিধ শব্দবন্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থিতু হতে না হতেই এক মহিলা কণ্ঠ – এইটা দেখো তো, ভাল লাগছে? – শুনে তাকিয়ে দেখে – কখন থেকে বলছি তোমায়, শুনতে পাচ্ছ না – কি করে আর বলে নিজের বৌয়ের গলার আওয়াজ বোঝার মত অবস্থায় আর সে নেই, তবু ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলতেই হল – বাঃ বেশ ভাল লাগছে। 'আচ্ছা এইটা?' 'হ্যাঁ, এইটাও ভাল' – আশা, সে ভাল বললে তার অর্ধাঙ্গিনী সেটি নিয়ে নেবে, কিন্তু হায় – আরও একটি শাড়ি তুলে – এইটা দেখো তো। সব ক'টি শাড়িই তার বৌকে খুব মানাচ্ছে এইটা

আশেপাশের মানুষজন কিভাবে নেবে তার চেয়েও বড় কথা তার স্ত্রীর মনে এইরকম একটা সংশয় জেগে উঠতে পারে যে সে আদৌ এই শাড়ি কেনা নিয়ে সিরিয়াস নয়, 'চল দুজনে মিলেই যাই নাহয় শাড়ি কিনতে' এইসব কথা নেহাতই কথার কথা। ফলত দুয়েকটা শাড়ি সম্বন্ধে তাকে এক্সপার্ট কমেন্ট দিতেই হল – নাহ্, এটা তেমন ভাল লাগছে না। এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার স্ত্রী তার পছন্দের ওপর বিশেষ ভরসা না করতে পারলেও অপছন্দের ওপরে দিব্যি ভরসা করে।

একটা সিগারেট খেয়ে এলে কি ভাল হত ? পেছন দিকে তাকিয়ে সে আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হল, বের হলে তো হবে না আবার ঢুকতেও হবে, কাজেই থাক...... একেবারেই না হয় বেরিয়ে দেখা যাবে। পিঠের ওপর উঠে আসা সব রকম চাপ সামলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই দেখল ঘণ্টাখানেক ইতিমধ্যেই কাবার হয়ে গেছে। যাবতীয় সৌজন্য বিসর্জন দিয়ে, সবরকম অনাগত বিপদের সম্ভাবনাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত শাড়িতেই তখন তার বৌকে মেনকা, উর্বশী, রম্ভার ককটেল মনে হতে শুরু করে দিলেও, ঐ যে অপছন্দ একতরফা হলেও চলবে, পছন্দ দু'তরফা হওয়া চাই। এইভাবেই এগোতে এগোতে –এটা তো বেশ ভাল, আর পারা যাচ্ছে না – পর্যন্ত পৌঁছে মির‍্যাকল। তার পছন্দ বৌয়ের পছন্দের সাথে মিলে গেছে, লাফিয়ে উঠতে গিয়েও আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিল। 'দাঁড়াও ভাল করে দেখে নিই' – ম্যাডামের অনুরোধে শাড়ি ভাঁজমুক্ত হল – এ কি! এখানে তো ফেঁসে আছে, ইস এত ভাল শাড়িটা

- নিয়ে নাও, ওটা তো ভেতরের দিকে পড়বে, আর এমন কিছু বেশিও নয়, একটুখানি, রিফু করিয়ে নিও...

মাঝে মধ্যে

শ্রীপাদ

সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫

"ফুল ফুটুক বা না ফুটুক,
আজ বসন্ত............."
মেঘ উঠুক বা না উঠুক,
মাঝে মধ্যে বৃষ্টি ভালো,
ভালো মাঝে মধ্যে , অভিমানী
মনের মৃত্যু মৃত্যু খেলা।
মনে মনে দগ্ দগে ঘা নিয়ে
ঘরে ফিরি প্রতিদিন........
প্রতিদিন দেখি সেই চেনা রোদ,
রোদে পুড়ে রঙ তামাটে,
ক্ষয়াটে শরীরটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
ধ্বংসের বসবাস.........
ধ্বংস হোক বা না হোক ,
মাঝে মধ্যে কষ্ট ভালো,
ভালো মাঝে মধ্যে ,
একা মনের মারিজুয়ানা নেশা।
ইচ্ছে করে ইচ্ছেমতন ডেকে আনি
ধ্বংস মনের ঝড়,
ঝড় উঠুক বা না উঠুক,
মাঝে মধ্যে ব্যথা ভালো।
ভালো মাঝে মধ্যে নিঃস্ব মনের
শেষ সম্বল তোমায় চাওয়া।

রিফিউজি সমস্যা: ইউরোপের রিফিউজাল ও মানুষের হাহাকার

সৌরদীপ

সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৫

ইংরেজি এবং বাংলা কাগজগুলোতে বারবারই একটা সাধারণ ভুল হচ্ছে। দুটি শব্দের। 'রিফিউজি' এবং 'মাইগ্র্যান্টস'।

প্রসঙ্গ অবশ্যই ইউরোপ জুড়ে চলা শরণার্থী সঙ্কট। আর তাতে যত খেলা চলছে, তার আসল ঘুঁটি এই দুই শব্দই। ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকৃত রিফিউজি কনভেনশন 'রিফিউজি' বা উদ্বাস্তু শব্দের মানে হিসেবে জানিয়েছে, যে সমস্ত মানুষের জীবন নিজের দেশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জাতিগত বা ধর্মগত বা সামাজিক পরিচয়ের কারণে বিপন্ন হতে পারে এবং তার জন্য তারা নিরাপত্তার কারণে অন্য দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তারাই রিফিউজি। আর মাইগ্র্যান্টস বা অভিবাসী হল সেই সমস্ত মানুষ, যারা অন্য দেশে যায় আরও উন্নত জীবনযাত্রার খোঁজে। এক কথায়, দুই শব্দের প্রধান পার্থক্যটা হল, রিফিউজিদের অন্য দেশে আশ্রয় না পেলে একটাই ভবিতব্য, মৃত্যু। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাঙালিরা সেটা বেশ ভালমতই জানে।

মাঠের একদিকে রয়েছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান। তাঁর যুক্তি, এই রিফিউজিদের বেশিরভাগই আদতে মাইগ্র্যান্টস, নইলে তারা প্রথম যে দেশ পেত সেখানেই থেকে যেত, জার্মানি বা আরও উন্নততর দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনে লাইন দিত না। পাল্লা নেহাত হালকা নয় তাঁর, পাশে পেয়েছেন মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অনেক প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশকেই। যেমন পোল্যান্ডের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ ডুডা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একহাত নিয়েছেন, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো কিঞ্চিৎ নরম হয়ে বলেছেন, তাঁরা শুধু খ্রিস্টান রিফিউজিই নেবেন, কারণ দেশে একটাও মসজিদ নেই। তালিকায় আরো আছে, এস্তোনিয়ার মানুষ রিফিউজিদের জন্য নির্মিত এক ক্যাম্প পুড়িয়ে দিয়েছেন, লাটভিয়াও গাঁইগুঁই করে বোঝাচ্ছে, মোটেই তারা ইচ্ছুক নয়। গ্রিস তো এমনিতেই আর্থিক সঙ্কটে ধুঁকছে। অস্ট্রিয়ার পুলিশ নাকি রিফিউজিদের আটক করে জেলেও পুরে দিচ্ছে। ফলে দিনের পর দিন কাগজে ছাপা হচ্ছে রিফিউজিদের মর্মান্তিক জীবনযাত্রা, ট্রেনের জন্য, খাবারের জন্য লাইন। এদিকে মানুষ আসারও কমতি নেই। যেন তেন প্রকারে ভূমধ্যসাগর পেরোনোর চেষ্টা তুঙ্গে। ফলে মৃত্যুমিছিলও অব্যাহত। যার জন্য তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এর্দোগান ভূমধ্যসাগরকে রিফিউজি সমাধিক্ষেত্র বলে ইউরোপের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন।

যেখানে জার্মানি, ফ্রান্স বা সুইডেন উদারভাবে রিফিউজিদের নিতে হাত বাড়াচ্ছে, সেখানে পূর্ব ইউরোপের এই কঠোর মনোভাব কেন? খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশগুলোর অনেকেই বর্তমানে নানাভাবে সঙ্কটে। ক্ষমতা কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত, দুর্নীতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, স্বজনপোষণ... কোনও কিছুই বাকি নেই। তার ওপর জুড়েছে আর্থিক সমস্যা। ইউরো ও গ্রিসকে নিয়ে কিছুদিন আগেও ইউরোপের হাওয়া গরম ছিল। তার ওপর এই দেশগুলোয় বৈচিত্র্য খুবই কম, এবং তারা মোটেই পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার 'বিজাতীয়' রিফিউজিদের আশ্রয় দিয়ে দেশের চরিত্র পাল্টাতে আগ্রহী নয়। সাংস্কৃতিক উদারতা একেবারে নেই বললেই চলে, তার ওপর বেশি রিফিউজিকে

আশ্রয় দেবার মত কোনও পরিকাঠামো নেই বলে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করছেন। তাদের মত, মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে ডামাডোলের জন্য আমরা দায়ী নই, ফলে আমরা বেকার চাপ কেন নেব? ফলে রিফিউজিদের প্রতি তাদের মনোভাবও কঠোর হচ্ছে। ভিক্টর অরবানের দাবিকে এইখানেই নস্যাৎ করা যায়। সুইডেন বা ফিনল্যান্ডের মত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে রিফিউজি কমিউনিটির অবস্থা যথেষ্ট ভাল, সমাজকল্যাণমূলক পরিকাঠামো বেশ উন্নত, চাকরিবাকরি পাওয়াও সুবিধের। জার্মানিতেই সেইরকমই ব্যবস্থা আছে, তার ওপর জার্মান চ্যান্সেলর উদারতা দেখানোয় নজির তৈরি করেছেন। ফলে ট্রেনের লাইন ক্রমশই বাড়ছে, সীমান্ত টপকানোর হিড়িকও, যার ফলে শেগেন ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে অনেকের আশঙ্কা।

এই রিফিউজিদের ঢল আজকের নতুন নয়। মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় চলা দীর্ঘকালীন নানা যুদ্ধের ফলে রিফিউজি সঙ্কট বহুদিন ধরেই ইউরোপে ছিল। আজকের এই মানুষের মিছিল নামছে ইউরোপের দেশে দেশে, তার কারণও এটাই, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে চলা নানা ছোটো বড় গৃহযুদ্ধ ও একনায়কয়ন্ত্র। আইএসআইএস, বোকো হারাম ইত্যাদি জঙ্গি সংগঠনের নাম তো সবাই জানে। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, আশ্রয় চাইছে ইউরোপে। তবু এর আগে সেটা এইরকম মারাত্মক আকার নেয়নি, তার কারণ একজন সদাসতর্ক প্রহরী, যিনি মারা যাওয়ার পরেই সব ঝোল ইউরোপের কোলে গড়াচ্ছে, আটকানোর মত কেউ নেই। তিনি আর কেউ নন, লিবিয়ার বিখ্যাত বা কুখ্যাত নেতা, কলোনেল গদ্দাফি!

সে আরেক গল্প, পিছিয়ে যাওয়া যাক আরও কয়েক বছর। ২০০৪ সাল থেকেই গদ্দাফি তাঁর আরো নানা কাজের সাথে ইউরোপের সাথে সুসম্পর্ক বাড়ানোর কাজটিও সুচারুভাবে করে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল মাইগ্রেশন। আর স্লোগান ছিল, 'তোমরা আমাকে পয়সা দাও, আমি এদিকের মাইগ্রেশন রুখব'। ২০১০-এ তৎকালীন ইতালির প্রধানমন্ত্রী বার্লুসকোনির সাথে এক বৈঠকের পর তো গদ্দাফি জানিয়েই দেন, ইউরোপের সাদা থেকে কালো হয়ে যাওয়া আটকাতে একমাত্র তিনিই পারবেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পা বাড়িয়েই ছিল, এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? ভূমধ্যসাগরে আফ্রিকার সবচেয়ে কাছের দেশ ইতালি। কানাঘুষো, রোম গদ্দাফিকে বছরে পাঁচশো কোটি ইউরো দিতে রাজি হয়, বিনিময়ে গদ্দাফি রিফিউজি ও মাইগ্র্যান্টস আটকাতে মাঠে নামেন। ইউরোপ চোখে ঠুলি পরে নিশ্চিন্তে রইল, ওদিকে মিডিয়ায় একের পর এক আসতে থাকে নানা লিবিয়ান ক্যাম্পের খবর, শরণার্থীদের যেখানে আটকে চলত দিনের পর দিন অত্যাচার!

হনিমুন বেশিদিন চলে না। গদ্দাফিরও চলে নি। ২০১১ সাল, শুরু হল লিবিয়ার গৃহযুদ্ধ। তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে কলোনেল গদ্দাফির পতন ঘটল, হঠাত করে খুলে গেল লিবিয়ার সীমান্ত। শরণার্থীরা এমনিতেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আসছিল, এবার সাথে জুড়ল লিবিয়ার সাধারণ মানুষও, গৃহযুদ্ধের পরবর্তী লণ্ডভণ্ড লিবিয়া থেকে যারা পালাতে পারলে বাঁচে! সিরিয়া আর ইরাকেও শুরু হল প্রবল যুদ্ধ, গোকুলে বাড়তে থাকে আইএসআইএস। পাল্লায় হাওয়া দিতে আসরে নামে আরব বসন্ত।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আবেদন, সব দেশ সমানভাবে রিফিউজিদের গ্রহণ করুক। 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-কাগজে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন শুলজ একটা ইহাও-হয়-উহাও-হয় গোছের প্রতিবেদন লিখেছেন, যাতে কি করিতে হইবের থেকেও বেশি ঢোল পিটিয়েছেন কেন ইউরোপের ঘাড়ে দোষ দেওয়া উচিত নয় বলে! কিন্তু অনেকেই

নিজেদের ভাগ নিতে অনিচ্ছুক। আরও সমস্যা বাড়িয়েছে রিফিউজি সংক্রান্ত আইন ডাবলিন রেগুলেশন। এই আইন অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি আশ্রয় চেয়ে প্রথম যে দেশে পা রাখবেন, সেখানে থাকার আবেদন মঞ্জুর হওয়া বা না হওয়া অবধি তাঁকে সেখানেই থাকতে হবে। এতেই চটেছে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দেশগুলি। স্বাভাবিকভাবেই সেইসব দেশেই মানুষ আগে আসছে, তীরবর্তী বলে, তাই তাদের ঘাড়েই বোঝা বাড়ছে। ইতিমধ্যে জার্মানি এর বলবত থাকা স্থগিত করেছে। আবার অনেকেই এটাকে ব্রহ্মাস্ত্র করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বৃহত্তম এই রিফিউজি সমস্যার আশু সমাধানের এখনও কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার মত দুই মহাশক্তিধর দেশ এখনও অবধি জল মাপছে, আমেরিকা সিরিয়ান গৃহযুদ্ধের পর থেকে এখনও অবধি মাত্র ১৫০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। ডেভিড ক্যামেরন আরও এককাঠি সরেস, তিনি মাত্র ২০,০০০ শরণার্থীকে আশ্রয় দেবার জন্য পাঁচ বছরের প্ল্যান হাতে নিতে চান। এদিকে শুধু এই বছরেই এখনও অবধি ভূমধ্যসাগর পেরনোর হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষে। জার্মানি ৯৮,০০০; সুইডেন ৬৪,০০ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, অ্যাঙ্গেলা মের্কেল আরও বেশি লোককে আশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত। বাকিরা জল ঠেলাঠেলি করছেন, ব্রিটেন ফ্রান্সকে বলছে রিফিউজি পাঠিও না, ফ্রান্স ইতালিকে, ইতালি হাঙ্গেরিকে, হাঙ্গেরি গ্রিসকে।

এখন কদ্দিন এটা চলবে, জানা নেই। হয়ত মৃত্যু মিছিলও বাড়বে। হয়ত এটাই তাদের, সেই লাখ লাখ দেশ ছেড়ে আসা মানুষের ভবিতব্য। তোমার লক্ষ্য একটাই। কিভাবে পৌঁছবে তার অপশন অনেক। হয় বোমায়, নয় গুলিতে, নয় ভূমধ্যসাগরের জলে, নয়ত আশ্রয়শিবিরে পুলিশের লাঠিতে। এরই মধ্যে অনেকে হয়ত অন্য দেশে নিজের শিকড় পোঁতার চেষ্টা করবেন। তাঁরা বিভিন্ন দেশের উদারতার কথা বলবেন, তাঁদের নিয়ে বিভিন্ন দেশে রাজনীতিও বাড়বে, হয়ত আরও উগ্রপন্থার জন্ম নেবে, জেনোফোবিয়া বাড়বে। আর কিছু আয়লান কুর্দিদের ছবি হয়ত দিনের পর দিন আমাদের সকালবেলায় চায়ের সাথে খবরের কাগজ হাতে শিউরে তুলবে। আর ভাবতে বাধ্য করবে, আদৌ মানবাধিকার বস্তুটা রাজনীতির সাথে জড়াতে পারে তো?

ঘুটনু কা দর্দ

স্বপন পাল

জানুয়ারী ১৬, ২০১৫

"মাই, এক ট্যাক্সি লে লুঁ?" ভিখুর একহাতে তার মায়ের বাঁহাতখানা আর অন্য হাতে সুদৃশ্য একটি ব্যাগ যাতে তার মায়ের জামা-কাপড় আর আছে শোনপাপড়ি, মোতিচূরের লাড্ডু। এতোয়ারি আজ অনেকদিন পর বোনের বাড়ি যাচ্ছে যে। তার হাঁটুর ব্যথার তেল আনার একটা বিশেষ ইচ্ছাও আছে আজ এই যাওয়ার পিছনে।

ছেলের কথায় এতোয়ারি ঘাড় ঘুরিয়ে ভিখুকে দেখে মন্তব্য করে, "বিলকুল তেরা বাপ পে গ্যয়া, তেরা বাপ ভি না তেরা যেয়সা হি না সমঝ থা। চার পৈসা জেব পে আয়া কি নহি, টেসকি চড়নে চলা", "বেটা লছমি কি মরয়াদা কর্"। বাবার কথা আবছা মনে থাকলেও তার সাথে বাবার মিল-অমিল ভিখুর মনে নেই বিশেষ। সে একটা চুয়ান্ন নম্বরের খোঁজ করছিলো যে বাসটা তাদের ধোপার পুকুর স্টপেজে নামাবে তার মৌসির বাড়ি। সেখানে আছে মৌসি, ছবিয়া আর রামসুরত, ছবিয়ার বর, ঘরজামাই। নইলে মৌসির দুকান সামলাবে কে ? এতোয়ারির ডাকে ঘাড় ঘোরায় ভিখু, "মালিশ কা তেল লেনেকো না ভুলনা"। ভিখু জানে মালিশের তেল নিতে মা নিজেই কখনোই ভুলবে না। আর ভিখু তো মা কে মৌসির বাড়িতে দিয়ে চলেই আসবে ফিরতি বাসে। তার পেরাইভেট ডাক বিলির কাজ আছে না।

ডানহাতে ঝাঁকানি খেয়ে ভিখুর চিন্তার সুতো ছেঁড়ে, দেখে মা এক ভুজিয়াওয়ালাকে দেখিয়ে বলছে, "এ ভিখু মুঁগফল্লি লে লুঁ ? তেরা বাপু ভি বাহর যাতে তো মুঁগফল্লি জরুর লাতে থে"। কি আর করে ভিখু, বলে "কিতনা?" "পানশো", ভিখু বোঝানোর চেষ্টা করে, "খরাব হো যায়েগা মাই, কিড়া পর যায়েগা"। আসলে চিনাবাদাম ভিখুর খুব একটা পছন্দ নয়। "ঢাইশো জরুর লেও", অগত্যা আড়াইশো গ্রাম চিনা বাদামের প্যাকেটেটা মায়ের হাতে দিতেই ছেলেমানুষের মতো এতোয়ারি একমুঠো মুখে পুরে দেয়, আর আধফোকলা দাঁতে চেষ্টা করে চিবানোর। দাম মেটাতেই সামনে চুয়ান্ন নম্বর বাস দেখে ভিখু তড়বড়িয়ে মাকে তাড়া দেয়, "জলদি উঠ মাই", বলেই প্রায় খালি বাসটার ফুটবোর্ডে উঠে পরে। ভুজিয়াওয়ালার পয়সা মেটাতে গিয়ে মায়ের হাত সে আগেই ছেড়েছিলো। এখন বাসে উঠতে না উঠতেই বাস ছেড়ে দিয়েছে দেখে ভিখুর খেয়াল হলো তার বুড়ি মা বাসের অনেক পিছনে প্রায় দৌড়চ্ছে, একটা ছোট্ট বালিকার মতো। এতোয়ারি প্রায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচাচ্ছে, "এ ববোয়া, এ মেরা বেটা......"। বাস আসলে ঠিক মতো স্টপেজে দাঁড়ায়নি। এবার ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে পড়লো। ভিখু তাড়াতাড়ি ফুটবোর্ড থেকে নেমে হাত ধরলো তার মায়ের। মা তার হাঁফাচ্ছিলো কিন্তু এক অদ্ভুত স্বস্তিতে ভরা ছিলো সারা মুখমন্ডল।

হাত ধরেই বাসে ওঠালো ভিখু ওর মাকে। একটা সীট দেখে দু'জনে বসলো। একটু অবাক চোখে মাকে দেখে ভিখু বললো, "তু তো বচ্চিকে মাফিক দৌড় রহি থি, কহাঁ গয়া তেরা ঘুটনু কা দর্দ", প্রায় ফোকলা হাসিতে গাল ভরিয়ে এতোয়ারি তার কাঁধে মাথা রেখে বললো, "মুঁগফল্লি খিলায়া না তু, জোশ মিল গয়া রে ববোয়া"।

ধ্যাৎ

দাদামনি

ফেব্রুয়ারী ৯, ২০১৫

সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'মহাপুরুষ' মনে আছে? শেষের দিকে আগুন লাগার ফলস অ্যালার্ম শুনে বিরিঞ্চি বাবা মুক্তকচ্ছ হয়ে পালাচ্ছেন আর বাড়ির মধ্যে রোমান্টিক নায়ক সতীন্দ্র ভট্টাচার্য কোলে তুলে নিয়েছেন গীতালি রায়কে, আগুন থেকে রক্ষা করতে। সেই অবস্থায় নায়ক, নায়িকার মুখে দিকে তাকিয়ে খুব গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, – এই, আমাকে বিয়ে করবে? নায়কের মুখের দিকে তাকিয়ে নায়িকা খুব কোমল কণ্ঠে বললেন, – ধ্যাৎ।

বড় মিষ্টি শব্দ এই 'ধ্যাৎ'।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। বিবাহ বাসরে প্রবেশ করার আগে একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে আমার সামনে এসে দু-হাত তুলে বলল, – কোলে। খুব মিষ্টি মেয়েটি। কোলে তুলে নিয়ে পাশে দাঁড়ানো নববধূকে জিজ্ঞেস করলাম, – মেয়েটি কে? নববধূ মুচকি হেসে জানালেন, – তোমার শালী।

পরে জানলাম মেয়েটি আমার স্ত্রীর মাসীর মেয়ে, নাম রিঙ্কি। বিবাহোত্তর নানা অনুষ্ঠানে যখনই দেখা হয়েছে রিঙ্কি এসে দাঁড়িয়েছে সামনে এবং দু-হাত ওপরে তুলে বলেছে, – জামাইবাবু কোলে। এ নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কিও কম হত না। সবাই বলত, কি কপাল করে এসেছো, বিয়ের দিন থেকেই শালীকে কোলে নিয়ে... ইত্যাদি।

তারপর কেটে গেছে বহু বছর। চাকরীর সূত্রে একদিন দেশান্তরীও হলাম। অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। সেকালে তো আর ই-মেল, ফেসবুক ইত্যাদির অস্তিত্বই ছিল না।

সম্প্রতি আবার দেখা হল রিঙ্কির সঙ্গে। বেশ গিন্নী-বান্নী চেহারা। একমাত্র মেয়ে কলেজে পড়ে। কিন্তু চেহারায় সেই সারল্য, সেই মিষ্টত্ব আর সেই হাসি। এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেখা। আমাকে দেখে এগিয়ে এল – জামাইবাবু চিনতে পারছেন?

আমি একটু হেসে দু-হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম – কোলে?

এক ঘর লোকের সামনে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল রিঙ্কি, একটু অপ্রস্তুতও বুঝি। মেয়ের দিকে একটু যেন তাকাল আড়চোখে, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বলল, – ধ্যাৎ।

এলোপাথাড়ি

শাক্য মুনি

ফেব্রুয়ারী ১৮, ২০১৫

দুপুরে শুয়ে শুয়ে কত্তার গান শুনছিলাম। কত্তা বলছেন "বনে ফাগুন মনে আগুন"... শুনতে শুনতে একটু উদাস হবার সাধ জাগল। জানলার বাইরে তাকালুম। দেখি আমার বন্ধু শিমুল গাছটা একমুখ হাসি নিয়ে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। তার মাথার ওপরকার একফালি আকাশে আউট অফ ফোকাসে একটা চিল না শকুন কি যেন উড়ছে, সেদিকে খেয়াল নেই! ডালপালা সব ন্যাড়া, ভেতরে ভেতরে ফুল ফোটানোর তোড়জোড় চলছে নির্ঘাত। আমি ছাড়া কেউ জানতেও পারেনা এসব! সবাই মোবাইলের দিকে তাকিয়ে পথ চলছে। এখানে যে একটা গাছ আছে তাই আদ্দেক লোক জানেনা। গাছের ছায়া বিক্রি হয় এখন ইকো পার্কে।

আগেরবার এলোপাথাড়িতে রাজনীতি নিয়ে লিখেছিলাম বলে অনেকে গাল পেড়েছিলো। "যে জিনিস বুঝিসনা সেই নিয়ে আগডুম বাগডুম লেখবার কি দরকার বাপু?" আরে বুঝিনা বলেই তো লেখা, বুঝলে কি আর লিখতে যেতাম? রাজনীতিতেই নামতাম! রাজনীতিতে "নামা" টা ইন্টারেস্টিং। যেমন কারুর প্রেমে "পড়া"। কিম্বা কাউকে ভালো "লাগা"। গোলমেলে ব্যাপার স্যাপার সব। এসবের কোনটাই আমি বুঝিনা। ফ্রী তে লিখতে দিচ্ছে, যা মনে হয় লেখ! কার বাবার কি! পড়বি পড়বি না পড়বি না পড়বি। বয়ে গেল।

এইসব ভাবলেই মনে বড় দুঃখ হয়। বেসিক্যালি যে কোনও কিছু নিয়েই বেশি তলিয়ে ভাবতে গেলে দেখি মনে শেষমেশ বড়ই দুঃখ হয়! বুঝতে পারিনা তো কিছুই, সেই জন্যে হয়ত! অনেকের নাকি শুনেছি ভালো গান টান শুনলে কান্না পায়, সুন্দর সিনেমা দেখলে বা ভালো বই পড়লে কারুর কারুর নাকি চোখের কোণাটা ভিজে ভিজে লাগে। আমার কোনোদিন এসব হয়-টয়-নি! এই ভেবে আরও দুঃখ হয়! জীবনে একটা মাত্র মেয়ে কে হালকা ভালো লেগেছিল, প্রোপজ করেছিলাম, আজ দশ বছর ধরে তার সঙ্গেই আছি। আমার জীবনে একটা ব্যর্থ প্রেম নেই - এটা ভাবলে তো মনটা হু হু করে ওঠে। শিল্পী হতে গেলে যে যে ক্রাইটেরিয়া গুলো নেসেসারি তার প্রধান হচ্ছে ব্যর্থ প্রেম। সে আর আমার হল না! অথচ আমি চেয়েছিলাম শিল্পী হতে। পৃথিবীর তাবড় ব্যর্থ প্রেমের সাহিত্য পড়তে গেলে আমার হাসি পায়! আবার হাসি পাচ্ছে কেন সেই নিয়ে তলিয়ে ভাবতে গেলে আরও দুঃখ হয়। এই পারপেচুয়াল দুঃখানুভূতি কেউ বুঝবে না, কেউ না!

তাই আমি সবার সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে একা একা ঘরে বসে থাকি। শিমুল গাছটার সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু এখন সেও ব্যস্ত তার নিজস্ব সৃষ্টি নিয়ে। সবাই কিছু না কিছু সৃষ্টি করছে। আমিই কেবল হংস মধ্যে বক যথা! বন্ধুরা দেখি কবিতা গল্প উপন্যাস কতকিছু লিখছে। কেউ কেউ আবার গান বাঁধছে, তাতে সুর দিয়ে গাইছে। অনেকে সিনেমা করছে, ফটো তুলছে। সবাই সৃষ্টির সরোবরে এক একটি পদ্ম হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে। কেন চাইছে কে জানে! কেউ কেউ বলে, শুনেছি, "আমার কবিতা পায়", হাগা পাওয়ার মত। আবার অনেক কে বলতে শুনেছি "না লিখে থাকতে

পারিনা”। আরেকজন বলেছিল “সিনেমা না করলে বাঁচবো না।” যেন সে না বাঁচলে দুনিয়ার বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে! এইসব ন্যাকাপনা দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

***

বাঙলায় এতো কবি কেন সেই নিয়ে একটা গবেষণা হয়েছিলো, করেছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার সমাজতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগের বাঙালী অধ্যাপক শ্রী অর্ঘ্যকান্তি জোয়ারদার। তাঁর স্যাম্পেল সার্ভেতে উঠে এসেছিলো একটা বিচিত্র পরিসংখ্যান। দেখা গেসলো ৮২ শতাংশ বাঙালী কবিরা কেউ ভালো করে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু বা বিনয় মজুমদারের কবিতা পড়েননি। এঁদের মধ্যে মাত্র ৫৪ শতাংশ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও জয় গোস্বামীর কথঞ্চিৎ কবিতা পড়ে কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ। ৭৯ শতাংশ কবি মনে করেন যে ভালো কবিতা লেখবার জন্য অন্যদের কবিতা ও কবিতা সংক্রান্ত জটিল ও তাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী পড়াটা জরুরী নয়, যদিও তাঁদের মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ কবির কবিতা কোনও আন্তর্জাতিক মানের ম্যাগাজিনে ছাপাবার যোগ্য। এই সার্ভেতে বাঙালী কবিদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে তাঁরা কবিতা কেন লেখেন, উত্তরে যে যে চিত্তাকর্ষক ও কমন উত্তর গুলি পাওয়া গেছিলো সেগুলোর মধ্যে থেকে আমার পছন্দের পাঁচ টা উত্তর হল, যথা –

১) খিদে পেলে মানুষ খায় কেন? আমার কাছে কবিতা লেখাও সেরকম একটা জৈবিক চাহিদার মত

২) আমার যখন খুব প্রেম পায় তখন আমি কবিতা লিখি

৩) আমার কাছে কবিতা হল আমার স্বপ্ন দেখার ভাষা

৪) কবিতা লেখবার কোনও কারণ হয়না, আমি অকারণেই কবিতা লিখি

৫) কবিতা আমার প্রথম প্রেম ও আমার কফিনের শেষ পেরেক

এইসব সার্ভে রিপোর্ট থেকে গবেষক শ্রী জোয়ারদার এই কনক্লুশান টেনেছেন যে “বাঙালীরা এতই অলস ও জ্ঞানবিমুখ যে তাঁরা পড়াশোনায় উৎসাহী নন। তাই পূর্বজদের রচিত কবিতা পড়ে দেখবার ও তা থেকে কবিতা লেখা সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণে তাঁরা উৎসাহী নন। বরং তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের এই মানসিক সঙ্কীর্ণতাকে সেলিব্রেট করতে বদ্ধপরিকর। ফলে নিজেদের লিখিত কবিতা কোনও ম্যাগাজিনে ছাপা না হলেও এঁরা বিন্দুমাত্র হতাশাগ্রস্থ হন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সেগুলি বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে প্রকাশ করেন ও লাইকের আশায় প্রতি ৪৫ সেকেন্ড অন্তর নিজেদের হোম পেজ রিফ্রেশ করেন। এইভাবে তাঁরা সহজলভ্য ও ক্ষণস্থায়ী প্রশংসায় মগ্ন হয়ে বাঙলা সাহিত্যের আকাশ বাতাস কে প্রতি নিয়ত কলুষিত ও পঙ্কিল করে তুলছেন।... যে দীর্ঘ সময় এঁরা ফেসবুকে অতিবাহিত করেন সেই সময় যদি সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হতেন তাহলে বাঙলা কবিতার আজ এই দুর্দশা হতনা”। [“A Survey on the Bengali Poetry and the Poets in the age of Social Networking” by Shri Arghyo Khanti Joaardar, অনুবাদ- আবু আহমেদ বাচ্চু, নীলমণি প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ]

***

এইসব থিসিস লিখিয়ে বজ্জাৎ বাঙালীগুলোকে দেখলেই ক্যালাতে ইচ্ছে করে। খেয়েদেয়ে কাজ নেই অন্যের পোঁদের গু শুঁকে বেড়াচ্ছে। বাঙালী কবি পড়াশোনা করুক বা না করুক, সে অকর্মণ্য অপদার্থ গবেট হোক বা না হোক, তোর তাতে কি রে মড়া! তুই ব্যাটা মার্কিনীদের কাছে নিজের দেশের কুচ্ছ গেয়ে ডলার কামিয়ে সেই ডলারে পোঁদ মুছবি আর নিজের দেহাতি ভাই বেরাদরদের প্রতি কোনও মায়া দয়া নেই না? এই শিক্ষা! আমার যদি কলমের সেরম জোর থাকতো তো এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শতখানেক কবতে লিখে তোর বাড়ি দেওয়ালে গিয়ে সেঁটে দিয়ে আসতুম। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!

বলে নাকি কেউ পড়াশোনাই করেনা। এদিকে কোলকাতা বইমেলায় কাতারে কাতারে লোক পাগলা কুকুরের মত বই কিনে বেড়াচ্ছে, ছাগল কে খাওয়াবে বলে, নাকি? আমি তো এবার জীবনে প্রথমবার বইমেলা গিয়ে দেখলাম সব স্বচক্ষে। কতরকমের সব বই। রবীন্দ্রনাথ ও ফড়িং, আপেক্ষিকতা সূত্রের আলোকে যৌনতা, ভারতের জাতীয় ইতিহাসে জ্যোতি বসুর অবদান... এরম কতো সব চিত্র বিচিত্র বই! জীবনে এসব দেখতে পাবো ভাবিনি! বইয়ের দামও সেরকম আকাশ ছোঁয়া। পেট্রোলের দামের সঙ্গে নাকি কাগজের কোনও সম্পর্ক নেই, তাই এতো দাম। কে জানে, হবেও বা! আমি গিয়ে এদিক ওদিক খানিক ঘুরে টুরে বেড়ালুম, দু একজন পুলিশ আর বইপ্রেমী কে জিজ্ঞেস করলুম, তারা কেউ কিছু বলতে পারলেন না, অবশেষে একটা ম্যাপ জোগাড় করে অনেক ঘিলু অপচয় করে ফুডকোর্টটা খুঁজে বের করে নিস্তার পেলুম। ও বাবা, ফুডকোর্টে গিয়ে দেখি সেখানেও কি লাইন! সবার হাতে ইয়া মোটা মোটা প্যাকেট আর ব্যাগ ভর্তি বই। দেখে এমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আর অভিমান হল যে ফুলে ওঠা নাকের পেটো আর উপচে পরা ঝাপসা চোখ সামলে এক ছুটে পালিয়ে এলাম। আর কোনোদিন বইমেলা যাবনা ঠিক করেছি।

***

এইসব নানাবিধ দুঃখ কষ্ট চেপেচুপে অলক্ষ্যে সময় কেটিয়ে যাচ্ছি। ফেব্রুয়ারির হলদেটে বিকেলগুলো নদীর ওপর দিয়ে হু হু করে চলে যাচ্ছে একের পর এক। কত কিছু যে বলার ছিল আর করার ছিল, কিছুই গুছিয়ে ওঠা হচ্ছে না ঠিকঠাক। অনেকগুলো অসম্পূর্ণ লেখা জমে আছে, শেষ আর করা হচ্ছে না। নিস্তব্ধতার তিনমাস কেটে গিয়ে স্লো স্পীডে পাখা ঘোরার ঘ্যানঘেনে শব্দে নিমজ্জিত হয়েছে জীবন। শীতের কম্বলে মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে টুক করে কখন দেখি, আরে, বসন্ত এসে গেছে!

কার্নিশের নয়নতারাগুলো রেলিঙ ছুঁইছুঁই হল। মা প্রতিদিন সকালে পুজো করার সময় ফুল তুলে নিয়ে যায়, ওরাও বিনা প্রত্যাশায় ফুল জুগিয়ে চলে প্রতিদিন। কেন কে জানে! আমাদের উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের বাচ্ছাটাও একটু বড় হয়ে গেছে। 'বাচ্ছা' থেকে 'বাচ্ছা মেয়ে'তে রূপান্তরিত হচ্ছে প্রতিদিন একটু একটু করে। আজকাল আর রাত বিরেতে তারস্বরে কাঁদে না। বুদ্ধিসুদ্ধি হচ্ছে মনে হয়। তাকিয়ে দেখি আয়ার দুপুরের আলসেমির সুযোগ নিয়ে গ্রীলঢাকা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একাএকা। সন্দিগ্ধ চোখে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে চারিদিকটা। ওদের ব্যালকনির লাগোয়া আমার প্রিয় বন্ধু শিমুল গাছটার উচ্চতা জরীপ করার চেষ্টা করছে ওর আনকোরা ভাষাহীন চাহনিতে। মেয়ে হিসাবে

বড় হয়ে ওঠার খুঁটিনাটি শিক্ষার বেসিক পাঠ নিচ্ছে বোধহয় সন্তর্পণে। আউট অফ ফোকাসে চিলটা এখনও উড়ছে গোল গোল পাক খেয়ে। সেদিকে কারুরই খেয়াল নেই।

রাজধানী

মধ্যমপুরুষ

জানুয়ারী ৭, ২০১৫

কাপে কাপে গড়িয়ে এসেছে বেলা,
কালো ঠোঁটে পোড়ে
বিষন্ন এসপ্রেসো,
বৃষ্টি ভিজেছে কুয়াশায় রাজধানী,
ক্যাফে আজ ফাঁকা,
তুমিও একলা এসো।

নিজের দিকে তাকাতে চেয়েছ আগে,
বাসে বা স্বপ্নে
বসতে চেয়েছ পাশে,
ওভারকোটের পকেটে উষ্ণ আমেজ,
আরবান কবি,
কবিতা একলা আসে।

মিউজিয়াম এর ফ্রোজেন হলুদ আলোয়,
পুরনো পিকাসো,
আবেগও চিড়িয়াখানায়,
শেষ মেট্রো ছেড়েছে রাজধানী,
প্রেমে – অপ্রেমে,
একাকিত্বের পাড়ায়।

সমাপ্তি

প্রত্যয়

ফেব্রুয়ারী ২৫, ২০১৫

তুষারপাত দেখলেই শুভার কথা মনে পড়ে যায় অনন্তর। ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে যেভাবে শুভার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকত অনন্ত, আর শুভা ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিত ওর মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে... সেরকমভাবেই যেন ওই বরফের নরম স্পর্শ পৃথিবীর ওপর নেমে আসছে। সব ক্লান্তিকে, পাপকে ঢেকে দিতে আসছে... রাশি রাশি শান্তি! সময়ের শুরু বলে কিছু ছিল কিনা জানা নেই, তবে শেষ বুঝি আজই। এরপর আর কিছু নেই! কোনো শব্দ নেই, গন্ধ নেই, রাগ ঘৃণা প্রেম ভালবাসা কিচ্ছু নেই। শুধু অনন্ত আর শুভা চুপচাপ শুয়ে আছে একে অপরকে আলিঙ্গন করে...

আজ বহুদিন পর অনন্তর দিবস্বপ্নের রঙ আবার নীলচে সাদা কালো। ক্লাস এইটে পড়তে পাড়ার সমর্পণ দা এসে "অ্যাই একটা জিনিস দেখবি?" বলে ওকে যেমন নীলচে সাদা চলচ্চিত্র দেখিয়েছিল, সেরকমই এক লজ্জা, কৌতুহল আর অবিশ্বাসে ভরা স্বপ্ন। কলকাতা শহরের জনসমুদ্র থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এক অখ্যাত প্রায়-গ্রামের কাঠের বাড়ির জানালার ধারে বসে আছে সে আজ। নীলাভ শীতল বরফের চাদরের ওপর দু একবার তিড়িংবিড়িং করে ছুটোছুটি করে যাচ্ছে কয়েকটা শীতকাতুরে চড়াই। তারপর আশ্রয় নিচ্ছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। বড় গাছের পাতারা ঝরে গেছে বহুদিন। সেই ন্যাড়া গাছের দলের মধ্যে একটা পাইন কেমন বেমানানভাবে মাথা তুলে আছে। এই সব পেরিয়ে অনন্ত তাকিয়ে থাকেঅনেক দূরের দিকে।

সে সময় কেউ তার চোখের দিকে তাকালে সেখানে দেখতে পেত খরস্রোতা শিহং নদীর জল, তার তীরে বসে নুড়ি-পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা বাচ্চা ছেলে। একটা হলদে নুড়ি তুলে জলের মধ্যে ছুঁড়তেই হঠাৎ থেমে গেল শিহং নদীর স্রোত... নদীর গভীর থেকে কে যেন জলের ভাষায় বলে উঠল "অনেক তো হল বয়ে

চলা, এর কি কোনো শেষ নেই?" তাই শুনে চমকে উঠে পাশে বসা দাদুর হাত চেপে ধরল ছেলেটা... যাকগে যাক। অনন্ত আবার ফিরে আসে বাস্তবে। আবার কালই রোদ উঠবে। আকাশ হবে ঝকঝকে নীল। বরফ গলে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়বে সবুজ ঘাসের আভা। আবার সেই অদ্ভুত ম্রিয়মাণ জীবন ঘিরে ধরবে ওর ইন্দ্রিয়গুলোকে। ভাবতেই কেমন বিচ্ছিরি লাগে। গুটিয়ে শুটিয়ে শুয়ে পড়ে অনন্ত। তার গোটানো দেহটা অনেকটা ওই স্নো-ফ্লেকগুলোর মত ষড়ভুজ হয়ে থাকে।

ভাবো অনন্ত ভাবো। আজ তোমার ভাবার দিন। ওঠো, ওই দেখো কেমন জমে পাথর হয়ে গেছে কাশফুলগুলো। দেখো কেমন সাদাকালো হয়ে গেছে সব। আজই তো তোমার বেঁচে ওঠার দিন! শূন্যতার গান গাইছে পৃথিবী, তুমিও স্তব্ধতায় মুখর হয়ে ওঠো আজ!

পেঁজা তুলোর মত সাদা ধপধপে বরফের মেঘ ওকে কানে কানে ডাক দিয়ে যায়। তাকিয়ে দেখে আকাশ লাল করে সূর্য উঁকি মেরেছে মেঘের আড়াল থেকে। তারও আজকের মত বিদায় নেবার সময়। অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল উত্তাপ গায়ে মেখে গোলাপী রঙে সেজেছে বরফ-ঢাকা গাছের মগডাল। সেই উত্তাপ এসে লাগে অনন্তর গায়েও।

মেঘ গলে গলে জল হয়। সাদা রঙ মুছে গিয়ে পড়ে থাকে একমুঠো "কিছু না"। তার লজ্জা দেখে পাশ থেকে হাসে বাদবাকি মেঘের দল। ধীরে ধীরে উত্তাপ বাড়ে। বরফ ঢাকা গাছের মগডালের রাঙিয়ে ওঠা দেখে অনন্তর মনে পড়ে যায় সেই কাঞ্চনজঙ্ঘার লাজুক ভোর। মনে পড়ে দাদুর কথা, ওর প্রিয় বন্ধু সেই শিহং নদীর কথা, আর হ্যাঁ... শুভা...

সমাপ্তি

আর একটু পর শুভা আসবে। চাদরটা টেনে দেবে ওর ষড়ভুজাকৃতি দেহের ওপর। মিষ্টি করে হেসে তার ঠাণ্ডা হাতটা রাখবে অনন্তর মুখে। ধীরে ধীরে শ্বাস আটকে আসবে ওর। সে কি ভীষণ আনন্দ! জানলা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের লালচে আঁচ এসে লাগবে গায়ে। গলে যাবে অনন্ত। সবটুকু গলে গিয়ে মিশে যাবে বিছানার কোলে। এক অসম্ভব সুখকর দুঃস্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে যাবে সে... যার পর আর বুঝি কিচ্ছুটি নেই...

সমাপ্তি

আলোকপ্রাপ্তি

হযবরল

মে ৭, ২০১৫

শহরে পাশাপাশি ফ্ল্যাটগুলো একে অন্যের ঘাড়ে অসভ্যের মতন নিশ্বাস ফেলে। আগে বুঝতাম না, এখন ফ্ল্যাটগুলোতে এসি চললেই সেই গরম নিশ্বাস হাড়ে হাড়ে টের পাই। উচ্চতাও এক একটার একেক রকম, কোনোটার সিলিং দশ ফুট তো কারো আবার বারো । আমার লেখার টেবিল মানে হালের ভাষায় বৈদ্যুতিন রাইটিং স্টেশনে বসে নিচের দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে পাশের জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলেই উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিটা দেখা যায়। আমি লেখার মাঝে সিগারেট খেতে খেতে দেখতে পাই, সেখানে প্রায়শই সেই ফ্ল্যাটের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা তিন্নি তার পুতুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, বিড়বিড় করে কি সব যেন আপন মনে বলছে, কিম্বা মার কাছে বকা খেয়ে গুম মেরে এক কোণে কনুই গুটিয়ে বসে আছে। ওর কীর্তিকলাপগুলো ভারী মজার ও প্রত্যেকবার নিজের অজান্তেই ওর নতুন একটা কিছু করাটা আমাকে ক্ষনিকের জন্য হলেও, অনেকখানি টাটকা আনন্দ দিয়ে যায়। একদিন হঠাতই ওপরে তাকিয়ে আমার দিকে চোখ পড়তেই দুম করে সে ঘরের ভেতরে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম সে জানলার পর্দা সরিয়ে আমাকে দেখছে, আমি হাসি মুখে ব্যালকনিতে আসার ইঙ্গিত করলাম।

অমনি চলে এলো সে, ও এসেই আলাপপর্ব শুরু করলো প্রশ্ন দিয়ে।

"সিগারেট খেলে কি ক্যান্সার হয়?"

"হয়ত হয়, ঠিক জানি না" আমি বললাম, দেখলাম এখনো কিছুটা ভয় মিশ্রিত সন্দেহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কাক সিগারেট খায় না কেন?" আবার প্রশ্ন।

"ওর ভালো লাগে না হয়ত, তাই খায় না, তোমার কী খেতে ভালো লাগে?"

"আমার শুক্ত খেতে ভালো লাগে না।"

"আচ্ছা কী খেতে ভালো লাগে সেটা শুনি।"

ওদিকে তিন্নির মার চিৎকার শুনলাম, "তুই স্নানে গেলি?"

তিন্নি অমনি হুশ করে ভেতরে চলে গেল। হয়তো স্নান সেরেই শুক্ত দিয়ে ভাত খেতে হবে। ক্রমশ ওর সাথে আলাপ জমিয়ে জানতে পারলাম তিন্নি ক্লাস ফোরে পড়ে। দুটো টিউটর আছে, একজন অঙ্ক ও বিজ্ঞানের ও অন্যজন ইংরিজি,

বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস মানে বাকি সবই পড়ায়। প্রথম জন সপ্তাহে দু দিন আসে ও তার মাইনে ৪৫০ টাকা ও আরেকজন বাকি পাঁচ দিন আসে এবং তার মাইনে ৩০০ টাকা। তিন্নির কাছ থেকে আরো জানলাম যে ওর বাবা ব্যাঙ্কে চাকরি করে ও মা এককালে স্কুলে চাকরি করত, এখন তিন্নির জন্যই নাকি সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

একদিন তিন্নি বারান্দায় আসতেই জিগ্নেস করলাম, "কিরে পরীক্ষা তো এসে গেল!"

মুখটা কিরকম উর্দুর 'ঋ'-এর মতন করে জবাব দিল, "হ্যাঁ, প্রথম পরীক্ষাই অঙ্ক।"

আমি বললাম, "অঙ্ক কে যত ভয় পাবি তত ভুতের মতন চেপে বসবে, চল মুখে মুখে অঙ্ক করি।"

দেখলাম ওর মুখে একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল, বলল, "করো ..করো... "

"তোদের বাড়িতে কজন থাকে ও কে কে?"

"আমি, মা, বাপি, আম্মা ও দাদান... পাঁচ।"

"বেশ, এবার তিনজন গেস্ট এলো, এখন তোদের বাড়িতে কজন হলো?"

"আমাদের বাড়িতে তো গেস্ট আসেনা..."

"আচ্ছা ধরে নে তোর তিনজন বন্ধুই এলো..."

"আমার বন্ধুরা তো অনেক দুরে থাকে... এখানে কখনো আসেনা!"

"বেশ দুধওয়ালা, ধোবি, নিউসপেপারওয়ালা এরা এলো..."

"মা তো এদের ঘরে ঢুকতেই দেয় না, বাইরে থেকেই দুধ, পেপার নিয়ে নেয়।"

আবার তিন্নির মার চিৎকার শোনা গেল, "aunty আসার আগে টাস্ক গুলো সব করেছিস কিনা চেক করে নে .."

এই যাহ, টিউটর দুজন আর কাজের লোক, এই দিয়ে তো আরো তিনজন হয়ে যেত। আমার চিন্তা ভাবনাও দেখছি নেহাতই সাবেকি হয়ে যাচ্ছে, একটা শিশুর মত করে ভাবতে পারছি না। ওঁত পেতে থাকলাম কখন তিন্নি আবার বারান্দায় আসে ও আমি তাকে আবার মুখে মুখে অঙ্ক কষাবো। তিন্নি এলো, এবার বেজায় খুশি!

আমি জিগ্নেস করলাম, "কিরে এত ফুর্তি কিসের?"

তার জবাব, "জানো জানো, মা বলেছে, এবার অঙ্কে ফেল করলে স্যারকে ছাড়িয়ে দেবে আর আমাকেও আর স্কুলে পাঠাবেনা..."

"বটে, তার মানে তুই ফেলই করবি ঠিক করেছিস?"

মিচকে হাসি দিয়ে সে বলল "হ্যাঁ.."

"তা ফেল করে, আবার একই ক্লাসে পড়বি?"

"নাহ, মা বলেছে এইবার ফেল করলে, মিষ্টির দোকানের সামনে যে ওই পাগলটা বসে থাকে না, ওর সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে ..."

"ওহ, আর বাবা কি বলেছে?"

"বাপি বলেছে, ছেলে হলে পান বিড়ির দোকান খুলে দিতাম। তুই মেয়ে, রান্না বান্না ভালো করে শিখে নে, পাগলও তো খাবার খায়!"

"তা পাগলটাকে তুই বিয়ে করবি, সেটা একপ্রকার ঠিকই করে ফেলেছিস আর তার জন্য অঙ্ক আর তোর ভাল্লাগছেনা, তাই তো?"

"নাহ, তুমি ওই মুখে মুখে জিগ্গেস করো, আমি ওই ভাবে অঙ্ক করতে পারি।"

"বেশ, তোর্ টিউটর এলো, এবার বাড়িতে কজন?"

"কোন টিউটর, স্যার না ম্যাডাম?"

"যে কেউ একজন এলো.."

"স্যার তো রাতে আসে তখন বাপি অফিস থেকে ফিরে আসে, তাহলে তখন বাড়িতে ছ-জন। আর ম্যাডাম যখন এমনি দিনে বিকেলবেলাতে আসে তখনও বাপি অফিসে, তার মানে তখন আমাদের বাড়িতে পাঁচ-জন।"

"আর অমনি দিনে যখন তোর্ ম্যাডাম আসে, তখন?"

"শনিবার ম্যাডাম যখন আসে তখন বাপি বাজারে যায় আর দাদান মর্নিং ওয়াকে, তখন আবার বাড়িতে চার-জন!"
"বাহ, এই যে তুই বলছিলিস অঙ্ক কঠিন, দেখ কত সোজা করে দিলাম।"

"ওই দেখো, আবার সিগারেট ধরায়..." বলেই কিরকম মুখ ভেংচে তিন্নি ভিতরে চলে গেল। এইবার কিন্তু ওর মা চিৎকার করে ভেতরে আসতে বলেনি!

আমিও এর মধ্যে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক খেয়াল করিনি কখন তিন্নির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে! রেজাল্টও যে বেরিয়ে গেছে সেটাও ঠাওর করে উঠতে পারিনি। হঠাত কলিং বেল বাজতেই, দরজা খুলে দেখলাম তিন্নির মা এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু লাজুক ভঙ্গিতেই জানালো যে তিন্নি পাশ করেছে , ও অঙ্কে তিরাশি পেয়েছে।

"ও আপনার কথা খুব বলে, বলে কাকুটা জানলা থেকেই কি ভালো অঙ্ক বোঝায়, স্যারের মত ঘরে ঢুকে কথায় কথায় ধমকায় না...."

আমিও আমতা আমতা করে প্যাকেটটা নিয়ে বললাম, "তা ভালো খবর তো, কিন্তু তিন্নিকে তো দেখছি না?"

"আর বলবেন না, মেয়েতো মুখ গোমড়া করে বসে আছে!"

"সেকি, কেন?"

"কি জানি, পাগলি গোছের তো... কি ভর করেছে মাথায়। তা দাদা এবার তো ওর ক্লাস ফাইভ হলো। এবার থেকে একটু বাড়িতে এসে দেখে দিন না, বলেন তো ওকে বিকেলে ঘন্টাখানেকের জন্য পাঠিয়ে দেবখন..."

"নাহ নাহ, আমি ওরকম নিয়ম করে পড়াতে পারি না। ওই ব্যালকনিতে আসলে গল্পগুজব করার ফাঁকে আমি কিছু জিনিস শিখব, ও কিছু শিখবে, ব্যাস এই আর কি.."

তিন্নির মা কি বুঝলো কে জানে, কিন্তু তিনি যে ঠিক হাসিমুখে ফিরলেন না, সেটা বেশ বোঝা গেল। পরে অবশ্য খোজ নিয়ে জেনেছিলাম যে ওর মা যখন নিজেদের ও আসে পাশের ফ্ল্যাটের সবার জন্য মিষ্টির প্যাকেট বানাবার প্ল্যান করছিল, তখন তিন্নি মিষ্টির দোকানের বাইরে বসা পাগলটার জন্যও মাকে একটা প্যাকেট ধরে হিসেব করতে বলে। তাতে ওর মা খেঁকিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ উনি অঙ্কে পাশ করেছে তাই পাগল ফকির সব্বাইকে মিষ্টি বেলাতে হবে! যা না, ব্যালকনি তে যা!"

তিন্নি আর আজকাল ব্যালকনিতে আসে না। ওর নাকি পড়ায় এখন খুব মন হয়েছে, টিউটরও নেই কোনো। শুধু সন্ধ্যে হলেই জানলার ধারে বসলে একটা একঘেয়ে গুনগুন আওয়াজ নিয়ম করে শুনতে পাই!

দায়

তুষার সেনগুপ্ত

আগস্ট ৩, ২০১৫

পুরো সতেরো দিন হয়ে গেল অনির্বাণ ইণ্ডিয়াতে আছে। সাকুল্যে বাইশ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আর মোটে পাঁচটা দিন হাতে আছে। সামনের শনিবারের রিটার্ন ফ্লাইটে টিকিটও কাটা আছে। সামনের মানডেতে জয়েন না করতে পারলে চাকরীটাই বাঁচানো দায় হবে। একেই এই রিসেশনের বাজারে রোজই অফিসে ঢুকে প্রথমেই ডেস্কে চোখ বুলিয়ে নেয় ভয়ে ভয়ে, কার কপালে যে কবে পিঙ্ক স্লিপ জুটবে কে জানে। তার ওপর আবার এই রকম দুম করে পুরো বাইশ দিনের ছুটি নিয়ে ইণ্ডিয়ায় আসতে হল। ছোট মেসোমশাই ফোনে এমন করে খবরটা দিল যে অনির্বাণ নিশ্চিত ছিল দিন পনেরোয় সব ঝামেলা সামলে নিতে পারবে। কিন্তু কোথায় কি? হসপিটালের আই.সি.ইউ-র সামনের ওয়েটিং রুমের সোফায় বসে ডাক্তারের অপেক্ষা করছে অনির্বাণ। মনে মনে ঠিক করল ডাক্তারের কাছে আজ ক্লিয়ার পিকচার চাইবে। ডাক্তার রুটিন চেক-আপ সেরে বেরতেই অনির্বাণ দ্রুত পায়ে গিয়ে ডাক্তারকে ধরল। অদ্ভুত কৌতূহলী স্বরে প্রশ্ন করলো,

- "ডক্টর, মায়ের অবস্থা এখন?"

- "একটু বেটার লাগলো আজকে, তবে বোঝেনই তো ক্যান্সারের পেশেন্ট এবং এডভান্সড স্টেজ, কালও কিছু হয়ে যেতে পারে আবার নেক্সট দশ পনেরো দিনও"....

ডাক্তারের মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই অসম্ভব অসহিষ্ণু গলায় অনির্বাণ বলে উঠলো,

- "ডক্টর! আপনি তো একদিন দুদিন বলে বলে পুরো সতেরোটা দিন কাটিয়ে দিলেন, সামনের শনিবারের মধ্যেও কিছু না হলে? আমায় যে ফিরতেই হবে ফিলাডেলফিয়ায়..."

বনমালী তুমি

থাংকমনি

ডিসেম্বর ৭, ২০১৪

ট্রেন-এ যেতে অঞ্জনের বরাবর ভালো লাগে। দুলুনি এনজয় করে, ঝাল মুড়ি (বড্ড দাম বেড়েছে), ট্রেন এর বাউল দল। সবই মিলে যায়, শুধু এই হিজড়ে বাহিনী বড্ড অসুবিধে করে। এমনিতে সেক্সিস্ট জোকে দলের মহিলা সহযাত্রীদের অসুবিধে হয়, কিন্তু "এদের" ক্ষেত্রে "ছেলেদের" ওইটুকু ছাড় দেওয়া আছে। তার একটা সহজ কারণ এদের দিদিমণিরাও বিশেষ পছন্দ করেন না। তাই শিখন্ডী বাহিনী ট্রেনে উঠলেই তাঁরা একমনে উল বুনতে থাকেন, আর পুরুষ দের সেন্স অফ হিউমার ক্রমশঃ কদর্যতার দিকে হেলতে থাকে।

অঞ্জন বোলপুরের একটা স্কুলে মাস্টারি করে। ট্রেনের এই কামরাটা তাদের ইস্কুল মাস্টারদের ডেলি প্যাসেঞ্জারির বাঁধা ডিব্বা। ওদিকের মুরারই থেকে ওঠেন মিত্রদা। আর নলহাটী থেকে ওঠে সৌমেন। মিত্রদা বেশ সিনিয়ার তবে বেশ রসিক মানুষ, আর সৌমেন ছোকরা রিলায়েন্সের টাওয়ারে কাজ করে। বাকি সহকর্মিনী মানে মালবিকা দি, তপতী সবাই রাজগ্রামের দিক থেকে ওঠে। সব দিন মহিলাকুলের সবাই আসতে পারে না। আজ যেমন মহিলাকুলের কেউ নেই ট্রেনে, সবাই পরের ট্রেনে আসবে মনে হয়। মেয়েদের অনুপস্থিতিতে নিজেকে নিয়ে অতটাও সচেতন না হলেও চলে। অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। অঞ্জন ভাবতে বসে। ভাবাটা তার একটা গোপন বিলাস। এই যেমন আজকাল তার প্রায়শই মনে হয় জীবনটাও ফেসবুক টাইমলাইনের মত। শুধু অ্যাকাউন্ট খুললেই হল না, সেখানে একটা গল্প থাকা খুব জরুরী, প্রকাশ থাকা প্রয়োজন, কিছু প্রিয় বন্ধু থাকুক, কিছু আত্মীয়স্বজন, কিছু ঈর্ষা, কিছু লুকনো প্রেম, কিছু লাইক-ডিস্লাইক ক্ষমতার তর্জা, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি সব মিলিয়ে একটা গল্প হওয়া খুব দরকার। বচ্ছর শেষে যেন একটা ৫ মিনিটের ভিডিওতে জীবনের গল্প কথায় তার পূর্ণতা। নইলে একটা ভার্চুয়াল আস্তিত্ব যতখানি হাস্যকর, "বাস্তব" জীবন-ও ততখানি অর্থহীন। সবাই নিজের মতন করে মানে খুঁজে চলেছে। সক্কলেই নিজের গল্প বুনছে...

ইস্কুল মাস্টারের এতখানি ফিলজফির-র কোনো প্রয়োজন ছিল না। আজ অঞ্জন এই যে জীবন আর ফেসবুকে অন্ত্যমিল খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে তার প্রধান কারণ বাড়ীতে সে বৌ এর কাছে ঝাড় খেয়েছে এবং এই হাফ ইয়ার্লির প্রায় দেড়শ টা খাতা দেখা বাকি। যখনই সঙ্কট অবস্থা এসে উপস্থিত হয়, অঞ্জন বৈরাগী মোডে চলে যায়। তা অঞ্জনের এই বৈরাগী মোড চলবে আজ সারাদিন, কারণ আজ তার কিছুই ভালো লাগছে না।

এমন সময় ট্রেনে আবির্ভাব হিজড়ে বাহিনীর। বাহিনী বলা ভুল। এ একা উঠেছে। চেহারায় কোমলতার আভাস মাত্র নেই। হাত্তালি দিতে দিতে ক্রমশঃ নেমেসিসের মত এগিয়ে আসছে এই কামরায়। কিন্তু আজ তার তত বাজে লাগছে না। বৈরাগী মোডের একটা বড় লক্ষণ দুঃখবিলাস। কেউ জানলো না, কেউ বুঝলো না-এই এক পিস্ ই আমি। এ

মর্মে সেও একপ্রকার অন্ত্যেবাসী জীবন বাঁচে। সে অর্থে এই মানুষটি কে আজ তার কাছের মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য যে কোন দিন সে বিরক্ত হয়।

দু কামরা দূরে হিজড়েটা গান ধরেছে দামড়া গলায় "তুমি আমারই মতন জ্বলিও জ্বলিও বিরহ কুসুম হার গলেতে পরিও" তার গলায় এ গান মানায় না। যেমন চোয়াড়ে দেখতে সেরকম গলা। কিন্তু আজ অঞ্জনের সবই দুঃখের ঠেকছে, সবই ভারী ধূসর। একটা লজিক খাড়া করে মনে মনে - মানুষটার আর্তির কাছে সুর হয়ত বশ মানে নি, কিন্তু কথা গুলো তো অবয়ব ধরেছে। সে নপুংসকের গলায় কষ্ট দেখতে পায়। ভাবতে চেষ্টা করে শ্রী রাধিকার আকুতি। পাশ দিয়ে মুড়িওয়ালা মুড়ি-চানাচুর হেঁকে চলে যায়। হজমি গুলি বিক্রি করতে আসে রোজ দিনকার সুধন দা, বইয়ের পাতা ধরে একটা নতুন ছোকরা ধুতির পাড় গোছাবার মত করে পাতা গুছোতে থাকে। চার্লি চ্যাপলিনের জীবনী থেকে শুরু করে সে বাসর রাতে জামাই ঠকানো প্রশ্নের সম্ভার বিলি করে বেড়ায়। অঞ্জন আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। হিজড়ে জীবন আর পুরুষ জীবন কি এক করা চলে? বাড়ি ফিরে সংসারের সুখ টাও এদের কাছে চরম বিলাসিতা। যৌনতা তার বরাবরি ওভাররেটেড মনে হয়। তবু থাকাটা দরকার। মানুষের সুখ দরকার, মানুষের সংসার চাই, মানুষের স্নেহ চাই, উঠোনে খেলে বেড়াবার মত সন্তান। যারা পায়নি, পাবে না, তারা জানবে না কি হারালো। বৈরাগী মেজাজ আর এই গানে অঞ্জন বিহ্বল হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। আজ আর তার কিছুই ভালো লাগবে না। এমন সময় মিত্র দা বলে উঠলেন "এই মাল টাকে তো আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। সুধন দা, ও সুধন দা, বলি এটা কি এই লাইনে নতুন?" সুধন দা খুচরো পয়সা ফেরত দিতে দিতে "প্রায় এক হপ্তা হয়ে গেল দেখছি। নতুন মনে হয়", বলে অর্থপূর্ণ ভাবে একটা চোখ মারা হাসি দেন। সৌমেন লাই পেয়ে এক গাল হাসি দিয়ে বলে "হে হে হে নতুন? বলেন কি?" বলে সকলে যাতে শুনতে পায় এমন করে গুন গুন করতে থাকে "কাদের কুলের বৌ গো তুমি কাদের কুলের বৌ"। গাইতে গাইতে সৌমেন সবার দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নেয় তার রসিকতা-র সমর্থনের জন্য। সুধন দা চশমার ফাঁক দিয়ে চিলতে প্রশ্রয় দেন।

অঞ্জনের কানের পাশটা চিড়বিড় করতে থাকে। এই বার ভুলভাল ইতরামো শুরু করবে সৌমেন। সে জানে। সৌমেন ছেলেটা ফক্কড় আছে, অনেকেই তাকে বেশ পছন্দ করে মজা করতে পারার জন্য তবু মাঝে মাঝে শালীনতা পেরিয়ে যায়। আজ মহিলাকুলের অনুপস্থিতিতে শালীনতার সীমাটাও অনেকটাই আলগা। এই যে সে এত কিছু ভাবতে পারে, বোলপুরের ইস্টেশানের মোজাইক দেখে গর্ব বোধ করে, এর জন্যে নিজের কাছেই তার নিজের একটা আলাদা স্থান আছে। সৌমেন এর মত ইতরামো করতে তার বাধে। সকলের সাথে সহজ ভাবে কথা বলতে পারে না অঞ্জন-তার একটা জাস্টিফিকেশান পেয়ে আরাম বোধ করে।

তবু হিজড়ে টা একটু দূরে আছে, একটা প্যাসেঞ্জারের গাল ধরে টানাটানি করছে। অঞ্জন সতর্ক হয়। সামনে এলেই টাকা দিয়ে দেবে, আজ আর "এদের" সাথে ছ্যাঁচড়ামো তার পোষাবে না। সৌমেন সিটে একটা রুমাল ফেলে উঠে যায় দরজার দিকে। এখন সে একটা সিগারেট খাবে। অঞ্জন আবার পারিপার্শ্বিকে মনোযোগ দেয়।

এখানকার একটা স্টেশানের নাম আহমদপুর। সুলতানের অমরত্বকে নিজদের মত করে ঘরোয়া করে নিয়েছে। মুখে মুখে নাম হয়েছে আমোদপুর। এদিকে পাকুড় থেকে যত বোলপুরের দিকে আসা যায় কথা হিন্দি ঘেঁষা থেকে

মুর্শিদাবাদ ঘেঁষা হয়ে ক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের সাঁওতালির মিঠে টান ধরে তাতে। ক্রমশঃ বোলপুর পেরলেই চিকন কালো এক মৃদু ভাষী বোষ্টম ওঠেন। গান ধরেন “জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গো-বিন্দ-ও -ও গো-পালো ব-লো রে”। সুরটা ভারি মিষ্টি। অঞ্জনের সুন্দরী দিদার যখন পাগল পাগল অবস্থা তখন তিনিও ফ্যালফ্যাল করে এই গান করতেন, এই সুরেই। আর হাতের থলির জপমালা শিশুর হৃদয়ের মত ধকধক করে নড়ত।

টুকটাক কথাবার্তায় ট্রেন সরগরম। ডিম টোস্ট, ডিমের মামলেট, মুড়ি চপ ৫ টাকা প্যাকেট।

-কুথা গেইছিলি? টেন মাঝখানে দাড়িং আছে। তু খেং লে, আমার দেরি হবে। এক পুরুষ তার ক্ষুধার্ত মেয়ে কে বোঝায়। চায়- লেবান্ডি- চা লেবু- চা -কফি হবে-এ-এ হাঁকতে হাঁকতে চলে যায়। নতুন পড়ুয়া ল্যাপটপ খুলে সিনেমা দেখতে থাকে। বর্ধমান যাত্রী কালো কুলো মুনিষরা উঁকি মেরে সিনেমা দেখার চেষ্টা করে। ট্রেন অনেকক্ষণ বাতাসপুরে দাঁড়িয়ে আছে। সদ্য কেনা ফোনে গেরস্থ মানুষ বাড়িতে খবর দেন... "হেই বাতাসপুরে দাঁড়ায়ঁ আছি, টিটি বুললে টেনের টায়ার বাস্ট হুং গেইছ্যে"। ফোনধারী নিজের রসিকতায় নিজেই মুচকি হাসে।

চমক ভাঙে অঞ্জনের, সত্যিই তো ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে এইখানে। কেউ কারণ খোঁজার চেষ্টা করে মাল গাড়ী পাস করাচ্ছে মনে হয়। বিজ্ঞ ভদ্রলোক এক ঝটকায় উড়িয়ে দেন, না না মালগাড়ী না। মালগাড়ী হলে এতক্ষণ অয়েট করাতো না। ইন্টারসিটি পাস করাচ্ছে, লোকালের মানুষরা তো বানের জলে ভেসে এসেচে। উচ্চারণের পরীশীলতা শুনে অঞ্জন ফিরে তাকায়। কলকাতার মানুষ। দেখেই চেনা যায় এদের। যত্তসব চালিয়াত।

হিজড়ে মানুষটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এই কামরার দিকে। অঞ্জন ঠিক করে নেয় লোকটাকে আজ একটা ৫ টাকার কয়েন দেবে। পকেটে হাত দিয়ে সে বের করে রাখে। অনেক সময় এরা বুঝতে না পেরে এগিয়ে যায়। দেবার ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় দেওয়া যায় না। তাই দিতে চাইলে পকেটে হাত দিয়ে রাখাই শ্রেয়। ট্রেন চলতে শুরু করেছে আবার। সৌমেন আসার আগেই লোকটাকে টাকাটা দিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। এদের মস্করার পর সে যদি একটা হিজড়ে কে যেচে পয়সা দেয় সেটা একরকম সহযাত্রী দের অস্বীকার হবে এমনকি তারা অপমানিতও বোধ করতে পারে। দু একটা খিল্লির মন্তব্য তার দিকেও উড়ে আসতে পারে। অঞ্জন একটু এমনিতেই চুপচাপ। তার ওপর অন্যের দুর্বলতাকে যথেচ্ছ পরিমাণে হেয় করতে না পারা টা তার একটা অযোগ্যতা। লোকে কি ভাববে? যথেষ্ট পরিমাণে সে রসিক নয়। সহযাত্রী মহলে নিজের এই অবস্থান মেনে নিয়ে নিজেকে নিয়ে একটু বিব্রত থাকে সে। হিজড়েটা এগিয়ে আসছে এই কামরায়, সৌমেন-ও এদিক পানে এগিয়ে আসছে গাড়ির দুলুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। গাড়ি নদী পার হল গজগজ করতে করতে। নদী পেলে ট্রেন তখন পাড়ার মাস্তান। তার পার্সন্যালিটি-ই বদলে যায়। জাম্বো জেটের মত সে গুমরোতে থাকে। সৌমেন টলে যায় একটু। নদী পারের গাড়ির চলনে। নদী পার হতেই ক্রসিং। রেল লাইন ক্রসিঙে দাঁড়িয়ে থাকা উৎসুক নারী পুরুষ এক দৃষ্টে দেখে গাড়ীর জানলা গুলোকে। চলমান জীবনরাও গাড়ীর ভেতর থেকে দেখে থমকে যাওয়া সারি। গতি জীবনটাকে বোধহয় সহজ করে দেয়। বেশী ভাবতে হয় না, শুধু গতির সাথে বহতা হলেই চলে।

অঞ্জন টাকাটা বের করতে যাবে, পাশ থেকে সৌমেন এগিয়ে এসে খপ্ করে হিজড়ে টার হাত চেপে ধরে। “বাবলা না? শালা মেকাপ দিয়ে হিজড়ে সেজেছিস?”

আশেপাশের কিছু লোক জন ও সচকিত হয়ে ওঠে। আগের কামরায় একটা ছোকরার সাথে জোর করে টাকা নিয়েছিল মনে হয় সে উঠে আসে ভ্রূ কুঁচকে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই দু চারটে চড় লাথি পড়ে যায় এদিক সেদিক থেকে। ক্রমশঃ অন্য মানুষরাও এগিয়ে আসে হাতের সুখ করতে। অঞ্জনের হাতের তালুতে ৫ টাকার কয়েনটা ঘামতে থাকে।

বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে সৌমেন নিজের সিটে বীরদর্পে এসে বসে। উৎসুক মিত্র দা ও বাকিদের চোখের ওপর চোখ বুলিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলল “মাওয়া, খিক্ ইকি খিকক্ (খিল্লির হাসি) ইয়ে ইয়াকেবারে কেলীইয়েঙ্কারি কান্ড। বুঝলে কিনা...আমাদের পাড়ার বাবলা”। সবাই উৎসুক হয় জানতে, কে বাবলা, কি তাঁর বেত্তান্ত? “হিজড়ে না বাল, মাল্টা তো ছেলে”, সৌমেন বলে যায়, “ইয়াং ছেলে। ছোটতে পাড়ায় পার্ট করত মেয়ে সেজে। এট্টু লায়েক হতেই মাতাল বাপ লাথিয়ে বের করে দিয়েছে। চড়ে অ্যায়। হাল্কা দাড়ি দেখে বোঝেননি? তবে সলিড মেকাপ দিয়েচে, আমি ১০ হাত দূর থেকেই বুঝিনি...”

অঞ্জন ভাবে এই যে বাপ খ্যাদানো মা খ্যাদানো ছেলেটা সেও তো অন্ত্যেবাসী, সেও প্রান্তিক। তবু তারও প্রান্তিকতার অন্য খোলস প্রয়োজন হল। কিছুক্ষণ রসিয়ে রসিয়ে ব্যাপারটা সবাই উপভোগ করল। সৌমেন পিঠ চাপড়ানিও পেলো। অঞ্জন ৫ টাকাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষন ধরে বসে থাকল। কি করবে টাকাটা? দেবে, দেওয়া উচিত হবে, এই কেলেঙ্কারীর পর? পাবলিকের কাঁচা খিস্তি আর চড় থাপ্পরে ছেলেটা মুষড়ে দরজার ধারে জড়সড় হয়ে বসে বসে আছে। ক্যালকাটা 71 এর একটা দৃশ্য মনে পড়ল। তবু সেখানে একটা বিস্ফোরণের আভাস ছিল। দেখে নেওয়ার স্পর্ধা... এ ছেলে ম্যাদামারা। অঞ্জন উঠে গিয়ে ছেলেটার পাশে দাঁড়ায়। চমকে গিয়ে ছেলেটা কুঁকড়ে গেলো। পকেট থেকে একটা ১০ টাকার নোট বের করে অঞ্জন বলে "নে ধর, পকেটে রাখ"।

সবাই দেখল কোঁকড়ানো শরীর টা ক্রমশঃ টানটান হচ্ছে ছেলেটার।

“বাঁড়া, কেলিয়ে এখন ১০টাকা দিতে আসছেন? শালা মায়া দেখাচ্ছেন, মায়া? মাস্টারি করেন বলে দয়া মারাচ্ছেন?” তীব্র শিসের মত হিস হিস শব্দে তার খিস্তি ছুটে আসছিল। আশে পাশের সবাই নাটকের এহেন মোড় পরিবর্তনে বেশ মজা পেয়ে গেল। যে লোকটাকে জনতা বিচার করে শাস্তি দিল, তাকে কেন আবার ঘটা করে মাথায় তুলে আহা উহু করা! বেশ হয়েছে খিস্তি খাচ্ছে মাস্টার। অবতার সাজতে যাওয়া!! এমনিতেই মাইনে বেড়ে এরা সাপের পাঁচ পা দেখে। তাদেরি এক প্রতিনিধি অপমানিত হচ্ছে।

ছেলেটা আস্তে আস্তে ফণা মেলতে থাকে।

"কি করেছিলাম শালা? পেট চলে না বলে দুটো টাকাই তো চাইছি। এমনি এমনি কেউ দেয় না, তাই রঙ মেখেই আসি। ভদ্দরলোক? মুখে পেচ্ছাপ এমন ভদ্রলোকের।"

তার দৃপ্ত ভাষণে গালাগালির ব্যাবহার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, ভাষণে উঠে আসে তার দরিদ্র পরিবার, বঞ্চনা আর অন্যায়ের সত্যি মিথ্যে মাখা তড়কা। সৌমেনও চুপ। বুঝেছে হাওয়া ঘুরছে... সহযাত্রীরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে ছেলেটার কথা। কেউ কেউ অবাক, কেউ মাথা নাড়ায়। অঞ্জন স্পষ্ট দেখে অ্যান্টনি ভাষন দিচ্ছে একটা হিজড়ের শবের সামনে... অঞ্জন কুঁকড়ে যায়। পিছু হটতে হটতে ধপ করে বসে পড়ে নিজের সিটে। ছেলেটার ভাষণ কমে আসে ধীরে ধীরে। সহযাত্রী রা বিভিন্ন ভাবে দুজনকেই দেখতে থাকে।

অনেকক্ষন পরে সবাই চুপচাপ, সামনে স্টেশান আসছে। মিত্র দা মুখ খোলেন "কি দরকার ছিল আপনার টাকা দিতে যাওয়ার?" গলার সুরে সান্ত্বনার আভাস। "জানেন তো যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। শুদুমুদু অপমান হলেন।" সৌমেন বাঁকা হাসি হাসে। অঞ্জন কিছু না বলে মাথা হাতটা হাঁটুর কাছে জড় করে মাথা নামিয়ে থাকে। সামনে প্রান্তিক স্টেশান আসছে, বেশিরভাগ লোক সেখানেই নেমে যাবে আজ।

খুচরো ভালো লাগা

সন্ধ্যাতারা

মার্চ ৯, ২০১৫

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটা নির্দিষ্ট ছন্দ আছে, প্রকৃতির মতো অমোঘ না হলেও মোটামুটি একটা প্রাত্যহিকী আমরা সবাই অনুসরণ করি। এই চলার পথে কখনো একটু ভালো লাগা, কখনও একটু মন্দ লাগা একটু বেশি-ই মন ছুঁয়ে যায়। সেসব কথা হয়ত বা কাউকে বলি অথবা বলি না। যেহেতু এখন কদিন একটু ব্লগিং-এর মন হয়েছে, তাই ভাবলাম এই ঘটনাটি একটু ভাগ করে নিই। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এটি হয়ত খুব সাধারণ, পাঠকের হয়ত মনে হতে পারে এরকম তো আগেও ঘটেছে, ফলাও করে বলার কি হল। আসলে বলার কিছু হয়নি, বলতে ইচ্ছে হল, তাই বললাম। আর ঘটনাটা সত্যি তেমন বড় কিছু নয়, তবু সেই মুহূর্তে আমার বেশ ভালো লেগেছিল, তাই লিখছি।

কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করার হাজারো সমস্যা। বাস পাওয়া যায় তো সে বাস এমন ঢিকঢিকিয়ে চলে, গন্তব্যে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যায়। ট্যাক্সি যদিও তাড়াতাড়ি যাবে তবে সে পাওয়া যায় না; ট্যাক্সি পাওয়া যায় তো সে ট্যাক্সি আমার গন্তব্যে যাবে না। আমার গন্তব্যে যাবে, তাড়াতাড়িও যাবে অটো পাওয়া যায়, তবে বড় লাইন পড়ে; লাইন দিয়ে এসে যাও বা ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, 'দিদি খুচরো দেবেন কিন্তু'। খুচরো না থাকলে? বলা যায় না, হয়ত মারধোরও খেয়ে যেতে পারেন। ভাগ্য অতোটা খারাপ না হলেও চালকের চোখরাঙানিতেই ছাড় পাবেন। এর থেকে ভালো কিছু কেউই আশা করেন না।

আমি অবশ্য এ কদিন বাসেই চড়ছি, কিন্তু আদতে কলকাতা আর আমার রোজকার শহর নয়; বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছি, সুতরাং নিজের পার্স খোলার দরকার পড়ছে না তেমন; কাজেই বাসে উঠে প্রায় দিনই একশ/পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিচ্ছি। বেশিরভাগ সময়েই পরিচালক-দাদার বিরক্ত মুখ দেখতে হয়। সাধারণত বিকেলের দিকেই চেষ্টা করি, কাচুমাচু মুখ করে 'দাদা, সারাদিন তো খুচরো পেয়েছেন, একটু যদি দয়া করে..."। সেদিন যেমন দেখলাম পরিচালক দাদা পকেট থেকে বের করে গোছা গোছা খুচরো নোট গোনা শেষ করে ভাড়া চাইতে এসে অম্লানবদনে বললেন "খুচরো নেই"। কথা বাড়াইনি। মনটা ভার হল একটু। পকেটে থাকতেও মিছে কথা! জানি অবিশ্যি খুচরো পয়সার একটা সমান্তরাল বাজার আছে, যাদবপুর থানার সামনে দেখেছি গাদা গাদা রেজগি সাজিয়ে বসে থাকতে, দর শুনেছি। ৮৫ টাকার কয়েন/১০০ টাকা। যাকগে মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই, বাস্তব সমস্যা হল আর ৩/৪ টেই দশটাকার নোট থাকল, কালকে সকালে আবার ভাঙ্গানোর চেষ্টা করতে হবে।

পরের দিন সকালে প্রথম বাসটাতেই চেষ্টা করে যথারীতি বিফল হলাম, আরও একটা দশ টাকার নোট ফুরোলো তার মানে। দ্বিতীয় বাসের ভাড়া চোদ্দ টাকা। ১০০ টাকাটা বাড়িয়ে দিতেই পরিচালক দাদা নোটটা নিয়ে নিলেন, আনন্দে মনটা ভরে গেল, অনুভব করলাম ডাক শুনে যখন মা কালী বেড়া বান্ধতে এয়েছিলো রামপ্রসাদের মনের

অবস্থাটা কি হয়েছিল। বুদ্ধি করে একটা সেলফি তুলে রাখলে আপনাদের দেখাতে পারতাম ভগবান নিজে হাতে প্রসাদ খেয়ে গেলে ভক্তের কি অবস্থা হয়। তখন অবিশ্যি সেলফি তোলার থেকে জরুরি কাজটা মনে পড়ে গেল; বললাম "দাঁড়ান দাদা, ৪ টাকা খুচরো দিচ্ছি।" জবাব পেলাম "লাগবে না, আমার কাছে আছে তো, দিচ্ছি!!!" ... স্বপ্ন দেখছি নাকি, এও হয়!! কলকাতা শহরে বাস কন্ডাক্টর খুচরো দিতে বিরক্ত বোধ করছেন না, ঝাঁঝিয়ে কথা বলছেন না। এই দুনিয়ায় ভাই সবই সম্ভব। আর সম্ভব বলেই না আমরা বেঁচে আছি, ভালো আছি। কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো একটু ভালো হয়ে ওঠে। তাই তো এ কলকাতা, বা শুধু কলকাতাই বা কেন, এ বিশ্ব আজও বাসযোগ্য। পাঠক কি বলেন?

তুহুঁ মম

স্বপন পাল

জানুয়ারী ৩, ২০১৫

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলে, তাল না তমাল তাও দেখিনি।

এমনি কোন নিরেট সাঁঝে, মন্ত্র ফুঁকে না আলোকের

হিসহিসানি ফিসফিসানি, জটিল অঙ্ক কষতে চাওয়া।

বাঁচা মরার মধ্যিখানে এইটুকু ফাঁক, যোজন যোজন দূরত্বকে

লাফিয়ে ধরা। ইঁটের পাঁজায়-খড়ের গাদায় পরের সকাল

দেখবে যে কার লাশ ছোপানো লালের রঙে। সূর্য দেখবে

সূর্যতনয়, ঘোমটা টেনে সরসরিয়ে সরে যাওয়া গোখরো

সাপের। সিরসিরানো হাওয়ায় হাওয়ায় লাট খেয়েছে,

বুকের ওপর মাওয়ের সেলাম, তাল-তমালের গবেষণায়

বুক ফাটানো কান্না থামার ওষুধ-বিষুদ কি সে নিদান।

সোনার সকাল-সিঁদুর বিকেল এমনি আমরা কাটিয়ে ছিলাম

তাল বা তমাল গাছের নীচেও, খড়ের গাদায়-ইঁটের পাঁজায়

গা ছুঁই ছুঁই সাপ গিয়েছে, মরণ তখন শ্যামের মতোই।

দায়

ব্যাকরণ শিং

জুলাই ৩, ২০১৫

১

ফ্রিজ থেকে দুপুরে রান্না হওয়া মাংসটা বের করে মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে গণেশ একবার উঁকি মেরে ড্রয়িং রুমের দেওয়াল ঘড়িটাতে সময় দেখে নিল। দশটা বাজতে তিন। এতক্ষণে তো দাদাবাবুর নীচে এসে যাবার কথা। প্রতিদিনই দাদাবাবু পৌনে দশটা নাগাদ নীচে চলে আসেন। কিছুক্ষণ টিভিতে খবর টবর দেখে দশটায় ডিনার করতে বসে যান। সাধারণত এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় না।

তবে আজকের কথা একটু আলাদা। সন্ধ্যায় যখন দাদাবাবু কাজ থেকে ফিরলেন, তখনই তাঁকে দেখে গণেশের মনে হয়েছিল ওনার মেজাজটা আজ খুব একটা ভালো নেই। সবাইকে শুধুশুধু বকাবকি করলেন। তারপরে বললেন ফ্রিজ থেকে মদের বোতলটা আর গ্লাস দিয়ে যেতে। সেই থেকে হয়ত সমানে ড্রিঙ্ক করে যাচ্ছেন। তারপরে তো যা কাণ্ড হল। প্রায় পনের বছর হয়ে গেল দাদাবাবুর এখানে কাজ করছে সে। কিন্তু কোনোদিনই দাদাবাবুকে এতটা রেগে যেতে দেখেনি। আজ হয়ত এসব কারণেই দাদাবাবুর দেরী হচ্ছে।

মাইক্রোওয়েভটার আওয়াজ শুনে আবার সম্বিত ফিরল গণেশের। মাংসটা বের করে ডাইনিং টেবিলে রাখতে এসে দেখল দশটা বেজে গেছে। রাখালের মা স্যালাড কাটছিল। গণেশ তাকে বলল, – দাও দিদি, আমি বাকিটা কেটে দিচ্ছি। তুমি বরং গিয়ে দাদাবাবুকে একবার ডাক দিয়ে এস।

রাখালের মার আবার দোতলায় ওঠার ইচ্ছে ছিল না। বেজার মুখে বলল, – আবার ডাকতে হবে কেন, ও এমনিই এসে যাবে। ছাইপাঁশ গিলে রয়েছে এখন। আমি যেতে পারবনি। তুই যা।

গণেশ বলল, – তুমি যাও না। আমি এই ফাঁকে ডালটা গরম করে নিই।

রাখালের মা মাইক্রোওয়েভ চালাতে পারে না। কাজেই অনিচ্ছাসহকারে গেল ডাকতে। গণেশ ডালটা গরম করতে দিয়ে বাকী স্যালাড কাটতে শুরু করল।

হঠাৎ একটা তীব্র চিৎকার শুনে চমকে গিয়ে গণেশ আর একটু হলে নিজের আঙ্গুলটাই কেটে ফেলছিল। রাখালের মার গলা। কি হল রে বাবা? দৌড়ে বেরল রান্নাঘর থেকে। দেখে নিজের ঘর থেকে কেশববাবুও চিৎকার শুনে বেরিয়ে

এসেছে। ওপর থেকে এসেছে আওয়াজটা। একসাথে দুতিনটে করে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় পৌঁছে দেখল দাদাবাবুর ঘরের দরজার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে রাখালের মা।

তাকে ডিঙ্গিয়ে দাদাবাবুর ঘরের ভিতর ঢুকতেই একটা তীব্র মিষ্টি অথচ ঝাঁঝাল গন্ধে মাথাটা একটু টলে গেল গণেশের। কোনওভাবে নিজেকে সামলে সামনে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

বিছানার ওপর দাদাবাবু চিত হয়ে শুয়ে আছে। গলার নলিটা কাটা, একেবারে হাঁ হয়ে রয়েছে। বিছানার সাদা চাদরটা চাপ চাপ রক্তে লাল হয়ে গেছে। সারাটা ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

অচিন্ত্য সরকার যে আর বেঁচে নেই সেটা বোঝার জন্যে কোনও ডাক্তারী ডিগ্রি থাকার দরকার নেই। খালি চোখে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহুক্ষণ হল অচিন্ত্য মারা গেছে।

২

সকালের মর্নিং ওয়াকটা সেরে ফেরার সময় অনিকেত দেখলেন গেটের বাইরে একটা লাল রঙের টাটা ইন্ডিকা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে কেউ এসেছে দেখা করতে। একটু অবাকই হলেন তিনি। সবে সাড়ে সাতটা বাজে। এত সকালে আবার কে দেখা করতে এলো?

দীর্ঘ ছত্রিশ বছর সিবিআই তথা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনে দাপটের সাথে চাকরী করে সবে চার মাস আগে রিটায়ার করেছেন অনিকেত স্যান্যাল। একদম জুনিয়র অফিসার হিসেবে জয়েন করে ধীরে ধীরে নিজের যোগ্যতায় উন্নতি করতে করতে অবসরের দেড় বছর আগে সিবিআই-এর ডিরেক্টর পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন তিনি। অবসরের পর দিল্লী থেকে কোলকাতায় ফিরে রিটায়ার্ড লাইফের বৈচিত্রহীন নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় এখনও সেইভাবে মানিয়ে উঠতে পারেননি। সেই সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণ, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করে পত্রিকা পড়া, তারপরে চান সেরে কিছুক্ষণ টিবি দেখে দুপুরের খাওয়া, ভাতঘুম, আবার বিকেলে একটু ঘুরতে যাওয়া, ফিরে এসে আবার টিভি, ডিনার সেরে আবার ঘুমোতে যাওয়া – দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। একঘেয়ে জীবনটার প্রতি একরকম বিরক্তিই এসে গিয়েছিল তার। এরকম অবস্থায় কেউ দেখা করতে এলে তাও কিছুটা সময় কাটে। তাই আগ্রহ সহকারে পা চালালেন তিনি।

ঘরে ঢুকে দেখলেন গৌতম এসেছে। সোফায় বসে আজকের পেপারটা নাড়াচাড়া করছে। তাকে দেখে মেজাজটা একটু খুশী হয়ে গেল অনিকেতের। এই ছেলেটাকে বেশ ভালো লাগে তাঁর। নিজের ছেলের মতই দেখেন। লালবাজারে হোমিসাইড স্কোয়াডের একজন সিনিয়র ইনস্পেক্টর গৌতম। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই কঠোর পরিশ্রম আর বুদ্ধির দৌলতে বেশ উন্নতি করে ফেলেছে। সৎ পুলিশ অফিসার হিসেবে অল্প বিস্তর নামডাকও হয়েছে। গৌতমের বাবাকেও

এককালে চিনতেন তিনি। একই স্কুলে পড়তেন তাঁরা দুজন, যদিও ভিন্ন ক্লাসে। এখনও কাছাকাছিই থাকেন। বাজারে বা পাড়ার কোনও অনুষ্ঠানে দেখা সাক্ষাৎও হয়ে যায় কালে ভদ্রে।

তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে গৌতম সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। বলল, – গুড মর্নিং স্যার! কেমন আছেন?

– গুড মর্নিং! এই তো ফার্স্ট ক্লাস আছি। কিন্তু গৌতম, আমি তো তোমাকে অনেকবার বলেছি তুমি আমাকে স্যার নয়, জ্যেঠু বলে ডাকবে। তুমি তো বাবলুরই বয়সী।

বাবলু অনিকেতের ছেলে। সে বেঙ্গালুরুতে চাকরী করে। বয়স গৌতমেরই মত। গৌতমকে এত স্নেহ করার পিছনে এটাও একটা কারণ।

– ঠিক আছে জ্যেঠু। গৌতম হাসল।

– ভেরি গুড! যাই হোক এবার বল তুমি কেমন আছ? বৌমা কেমন আছে? বাবা মা ভালো আছেন তো?

– হ্যাঁ, আমরা সবাই ভালই আছি।

– বল এবার সাত সকালে কি মনে করে? দাঁড়াও চা বলি। সোফায় বসে বললেন অনিকেত।

– চা এসে গেছে, ব্যস্ত হতে হবে না। ট্রে হাতে ঘরে ঢুকে বলল দময়ন্তী, অনিকেতের অর্ধাঙ্গিনী। সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্ত্রীকে দেখলেন অনিকেত। সত্যিই দময়ন্তীকে কিছু বলে দিতে হয় না। অনিকেতের মনের কথা ঠিক ম্যাজিকের মত বুঝে যায় সে। নয় নয় করে তেত্রিশটা বছর কেটে গেল বিয়ে হবার পর, অনিকেতকে কখনই কোনও জিনিসের অভাব বুঝতে দেয়নি সে। যখনই যে জিনিসটা চাই তাঁর, ঠিক হাতের কাছেই পেয়ে গেছেন তিনি। এমন স্ত্রী পাওয়াটা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

টী–পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল দময়ন্তী, – গৌতম অনেকদিন বাদে এসেছ। কোনও কথা শুনব না। ময়দা মাখতে বলে এসেছি। একেবারে ব্রেকফাস্ট করে তারপরে যাবে।

গৌতমের মৃদু আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে তার কাপে পরিমাণ মত দুধ চিনি দিয়ে আর অনিকেতের জন্যে লিকার চা বানিয়ে দিয়ে দময়ন্তী বলল, – নাও! এবার তোমরা কথা বল। আমি গিয়ে লুচিগুলো ভাজতে শুরু করি।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে গৌতম ইতস্তত করছে দেখে অনিকেত বললেন, – আমি বুঝতে পারছি তুমি কিছু একটা বলতে চাইছ, কিন্তু বলতে পারছ না। কি বলতে চাইছ, সেটাও হয়ত আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। নাও চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে ফেল কি বলতে চাও।

একটু হেসে গৌতম বলল, – আপনি ঠিকই ধরেছেন জ্যেঠু। কথাটা কিভাবে আপনাকে বলব ভেবে পাচ্ছি না।

– ডোন্ট ওয়রি! মাই ডিয়ার বয়! নির্দ্বিধায় বল।

গৌতম এবার একটু সহজ হল, – আপনি নিশ্চয়ই পেপারে অচিন্ত্য সরকারের মৃত্যু সম্বন্ধে পড়েছেন। আমি সেই ব্যাপারে আপনার সাথে একটু কথা বলতে এসেছি।

– হুম্! তাহলে আমি ঠিকই গেস করেছিলাম। এত বড় একটা মার্ডার মিস্ট্রি যখন সব জায়গায় লোকের মুখে মুখে ঘুরছে, তখন লালবাজার হোমিসাইডের ডাকসাইটে অফিসার সাত সকালে এমনি এমনি জ্যেঠুর সাথে কুশল বিনিময় করতে আসবে এটা একটু অবাক করার মত। তাই নয় কি? অনিকেত মিটিমিটি হাসলেন, – তবে আমি আগে থেকে কিছু বলতে চাইনি, কেন জান? গোয়েন্দার কাছে কেউ দেখা করতে এলে সে নিজে থেকে শার্লক হোমসের মত সব বলে দেবে, এই ব্যাপারটা না একদম ক্লিশে হয়ে গেছে। ঠিক কি না, বল?

তাঁর কথা বলার ধরনে গৌতমের মুখেও হাসি ফুটল, – আমিও বুঝেছিলাম আপনি আন্দাজ করে ফেলেছেন।

– যাই হোক। হ্যাঁ আমি পড়েছি খবরটা। কিন্তু পেপারে যে পড়লাম পুলিশ অলরেডি কাকে জানি গ্রেপ্তার করেছে।

– হ্যাঁ। অচিন্ত্য সরকারের ছেলে সৈকতকে বাবাকে হত্যার দায়ে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আর এই জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি জ্যেঠু।

অনিকেতের ভুরুতে ঈষৎ ভাঁজ পড়ল। – কেন? তুমি কি মনে কর সে খুনটা করেনি?

– হ্যাঁ, জ্যেঠু। আমি মনে করি সে খুনটা করেনি। গৌতমের গলায় দৃঢ়তা, – ওর শিক্ষা, স্বভাব, চরিত্র এসব সম্বন্ধে জানলে আপনিও মেনে নিতে পারতেন না যে সে খুন করছে। আমি ছেলেটাকে পার্সোনালি চিনি। আমার এক মামাতো ভাই ওর ক্লাসমেট ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। ওর কাছে শুনেছি যে সৈকত নাকি খুব ভালো কবিতাও লেখে। আপনিই বলুন জ্যেঠু যে ছেলে কবিতা লেখে, সে কি খুন করতে পারে?

– গৌতম, একথা ভুললে কিন্তু চলবে না যে তোমার আমার প্রফেশনে কিন্তু ইমোশনের কোনও জায়গা নেই। অনিকেত বোঝাতে চাইলেন, – আমি আমার চাকরী জীবনে অনেক ভালো ভালো কবির সাথে পরিচিত হয়েছি যারা সন্ত্রাসবাদের মত ঘৃণিত কাজের সাথেও যুক্ত।

– সে আমি জানি জ্যেঠু! কিন্তু তাও আমার সিক্সথ সেন্স বলছে যে আমরা ভুল করছি।

– ছেলেটা কি বলছে?

– আরে, সেটাই তো মুশকিল হয়েছে। ছেলেটা মুখই খুলছে না। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ওর বিরুদ্ধে। এমনকি খুনটা যে ঘরে হয়েছে সেই ঘরে ওর লাইটার পাওয়া গেছে, সেটাতে ওর হাতের ছাপ স্পষ্ট। এত কিছু স্বত্বেও ও কিছুতেই সব কথা খুলে বলছে না। ওর বয়স কম। তাছাড়া ওর অ্যাকাডেমিক রেকর্ড বিচার করে এখনও ওকে থার্ড ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে না। একবার সেটা শুরু হয়ে গেলে ও আর সহ্য করতে পারবে না। খুনটা না করলেও দোষ স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে। আমি সেটা চাইছি না।

– তুমি তাহলে কি চাইছ? প্রশ্ন করলেন অনিকেত।

– আমি চাইছি আপনি যদি এই কেসটাতে আনঅফিসিয়ালি আমাকে একটু গাইড করেন। কাতর আবেদন গৌতমের।

ভিতরে ভিতরে খুশী হলেও অনিকেত বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না। গলায় একটা মেকি চিন্তার ছাপ ফেলে বললেন, – কিন্তু আমি তো রিটায়ার করেছি। তাছাড়া এটা কোলকাতা পুলিশের জুরিসডিকশনে পড়ে...

– ও নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না জ্যেঠু। আমি সব সামলে নেব। অনিকেতকে কথা শেষ করতে দিল না গৌতম। – আপনি এই কেসে একেবারে স্বাধীনভাবে তদন্ত করবেন। আপনার যা দরকার হবে, ফোর্স বা ইনফরমেশন, সব আপনি আমাকে বলবেন। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। আমি খালি চাইছি আপনি আপনার এক্সপার্টাইজ কাজে লাগিয়ে একবার তদন্ত করে দেখুন যে আমরা ভুল করছি না ঠিক। আমি চাইনা পুলিশের রুটিন ইনভেস্টিগেশনের জন্যে কোনও নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পাক।

– কিন্তু তোমার ডিপার্টমেন্ট কি মেনে নেবে, আমার মত একজন আউটসাইডার...

আবার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল গৌতম, – আপনি যে এই কেসে তদন্ত করছেন, সেটা আমি ওপরমহলে জানাব না। আপনি তদন্ত করে সত্যিটা বের করলে আমি অ্যাকশন নেব। কোনও অসুবিধা হবে না।

হায় রে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। তোরা আর বদলালি না। তদন্ত করে অপরাধীকে সনাক্ত করে দেব আমি, আর তোরা তাকে অ্যারেস্ট করে ফিতে কাটবি। মনে মনে ভাবলেও মুখে এসব প্রকাশ করলেন না অনিকেত। গৌতমকে তিনি ছোট থেকে চেনেন। সে হয়ত সরল মনেই কথাগুলো বলছে। তাছাড়া তিনি ভিতর ভিতর দারুণ উত্তেজিতও। অনেকদিন বাদে একটা কিছু করার সুযোগ এসেছে। নিজের কর্মজীবনে অনেক ধরনের কেসের তদন্ত করেছেন তিনি। করাপশন, টেররিজম এবং আরও অনেক রকম। ডিরেক্টর থাকাকালীন বেশ কিছু হাই প্রোফাইল মার্ডার কেসেরও নিয়মিত আপডেট আসত তাঁর টেবিলে। কিন্তু সরাসরি হোমিসাইড বা খুনের তদন্ত করার ইচ্ছে থাকলেও কোনদিন সেই সুযোগ তাঁর হয়নি। ছোটবেলা থেকেই ডিটেকটিভ গল্পের পোকা ছিলেন তিনি। হোমস, পোয়্যরো থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ, ফেলুদা সবই তাঁর গুলে খাওয়া। তাই তাঁর বিশ্বাস তিনি পারবেন। ডিটেকশন এবং ডিডাকশনের ক্ষমতার জন্যে এককালে বেশ সুখ্যাতিও ছিল তাঁর।

এরকম সময়ে ঘরের হেল্পিং হ্যান্ড সহদেব এসে বলল যে ব্রেকফাস্ট রেডি। দময়ন্তী ডাকছেন।

অনিকেত বললেন, – চল গৌতম, ব্রেকফাস্ট সেরে কেসটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

৩

লুচি আর আলুর দম দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে সোফায় ফিরে একটা ক্লাসিক আলট্রা মাইল্ডস ধরিয়ে অনিকেত বললেন, – নাও গৌতম। এবার শুরু কর তোমার কাহিনী।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে গৌতম শুরু করল, – ফিল্ম প্রোডিউসার অচিন্ত্য সরকারের নাম হয়ত আপনি শুনেছেন। টলিউডের অন্যতম বিখ্যাত প্রোডাকশন হাউস 'সরকার ফিল্মস' এর কর্ণধার অচিন্ত্য সরকার। ইদানীং কালের বেশ কিছু বিগ বাজেটের সুপারহিট সিনেমা ইনি প্রোডিউস করেছেন। এই অচিন্ত্য সরকারকে কেউ বা কারা পঁচিশে এপ্রিল মানে গত বৃহস্পতিবার তার আলিপুরের বাসভবনে হত্যা করেছে। রাত দশটা নাগাদ মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করে তার বাড়ির মেড সারভেন্ট রাখালের মা। তার আগে সন্ধ্যে সাতটায় অচিন্ত্য যখন অফিস থেকে বাড়ি ফেরে তখন সে খুবই উত্তেজিত ছিল। বাড়ি ফিরেই অহেতুক সবাইকে বকাবকি করে। তারপরে মদ্যপান করতে শুরু করে। আটটা নাগাদ তার সাথে দেখা করতে আসে তার ছেলে সৈকত। সৈকত অচিন্ত্যর প্রথম পক্ষের সন্তান। সৈকতের সাথে অচিন্ত্যর তুমুল বাদানুবাদ হয়। অচিন্ত্য রেগে ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তারপরে সে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে ফিরে যায়। দশটা নাগাদ রাখালের মা তাকে ডিনারের জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখে অচিন্ত্যকে কেউ গলার নলি কেটে খুন করে গেছে।

এতটুকু বলে গৌতম একটু থামল। অনিকেত একমনে শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, – বাড়িতে তখন কে কে ছিল?

– বাড়িতে ছিল রাখালের মা, বাড়ির কুক গণেশ আর অচিন্ত্যর সেক্রেটারি কাম ম্যানেজার কেশব দেবনাথ। রাখালের মা আর গণেশ মণ্ডল অনেক পুরনো লোক। অত্যন্ত বিশ্বাসী। তারা এক অপরের সাথেই ছিল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত। ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না এইসব করছিল। কেশব দেবনাথের বাড়ি আসানসোলে। কোলকাতায় অচিন্ত্যর বাড়িতেই থাকে। খাওয়া দাওয়াও এখানেই। ঘটনার দিন কেশব অচিন্ত্যর সাথেই ফেরে অফিস থেকে। বাড়ি ফেরার পরে অচিন্ত্যর মেজাজ খারাপ ছিল। তাই কোনও কারণে কেশবকে খুব বকাঝকা করে। তারপর তাকে কিছু ইম্পরট্যান্ট ডকুমেন্ট বানানোর কাজ দেয়। সেই সব কাজই করছিল সে দশটা পর্যন্ত। রাখালের মার চিৎকারে ওপরে গিয়ে দেখে অচিন্ত্য মরে পড়ে আছে। সারা সন্ধ্যে সে বাড়িতেই ছিল। কিন্তু তার কোনও সাক্ষী নেই।

ধোঁয়ার একটা রিং ছেড়ে অনিকেত প্রশ্ন করলেন, – আর কে কে থাকে বাড়িতে?

একটু দম নিয়ে গৌতম বলল, – এরা ছাড়া অচিন্ত্যর সাথে থাকে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নন্দিতা আর তার সৎ বোন অরুণিমা। নন্দিতাও ফিল্ম লাইনেই আছে। বয়স তার নিজের বয়ান অনুযায়ী থার্টি ওয়ান। বেশ কয়েকটা ফিল্মে হিরোইনের রোলে অভিনয় করেছে। আগে মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ ছিল। থিয়েটারের সখ ছিল। থিয়েটার করতে করতে এক মেগা সিরিয়ালের ডিরেক্টরের চোখে পড়ে। সেই সূত্রে একটা মেগা সিরিয়ালে অভিনয়ের সুযোগ পায়। সৌন্দর্য আর অভিনয় ক্ষমতার জোরে কিছুদিনের মধ্যেই ফিল্মে চান্স পেয়ে যায়। প্রথম দুতিনটে সিনেমা হিট করে যেতে অল্প সময়ের মধ্যেই ছোট পর্দা এবং বড় পর্দার খুবই পরিচিত মুখ হয়ে ওঠে। এরকম সময়ে অচিন্ত্যর সাথে পরিচয়। অচিন্ত্য তখন প্রথম স্ত্রীর সাথে ডিভোর্স করে সিঙ্গল ছিল। তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপরে নন্দিতা তার প্রথম স্বামীকে ডিভোর্স করে দুই বছর আগে অচিন্ত্যকে বিয়ে করে। গত বৃহস্পতিবার সকালে নন্দিতা বেরিয়ে যান শুটিং-এ। ফেরেন বিকেল সাড়ে ছটায়। তারপরে সাতটায় অচিন্ত্য ফেরার একটু আগে আবার বেরিয়ে যান একটা পার্টি অ্যাটেন্ড করতে। তাজ বেঙ্গলে। সেখান থেকে ফেরেন সাড়ে দশটায় স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে।

অনিকেত চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন। চোখ না খুলেই বললেন, – আর অরুণিমা?

– অরুণিমা পেশায় ডাক্তার। গাইনোকলজিস্ট। কোলকাতায় বেশ কয়েকটা নার্সিংহোমের সাথে যুক্ত। বয়স তেত্রিশ, অবিবাহিত। অচিন্ত্যর সাথেই থাকে। আসলে অচিন্ত্যর ফিল্ম প্রোডাকশনের ব্যবসা তার বাবার আমলে শুরু। অচিন্ত্যর বাবা অমূল্য সরকারও ছিল বাংলা ছবির নামকরা প্রোডিউসার। বাড়িটা তাঁরই তৈরি। অরুণিমা অমূল্যবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। অমূল্যবাবু মারা যাবার সময় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অচিন্ত্যকে দিয়ে যান এই শর্তে যে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অরুণিমার সব দায়িত্বভার অচিন্ত্য নেবে। সে জন্যেই অরুণিমা এখন দাদার সাথে আলিপুরের বাড়িতেই থাকে। যাই হোক, ঘটনার সময় তিনিও বাড়িতে ছিলেন না। ক্যামাক স্ট্রিটের নাইটিংগেল হসপিটালে ডিউটিতে ছিলেন। তার আগে দুপুর বেলা ডিউটিতে ছিলেন রুবি হসপিটালে। সেখান থেকে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। আবার আটটায় বেরিয়ে যান নাইটিংগেলে। বাড়ি ফেরেন দাদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে।

অনিকেতের চোখ এখনও বন্ধ। ঘুমচ্ছেন না বোঝা যাচ্ছে কারণ মাঝে মাঝে সিগারেটটা টেনে ছাই ফেলছেন অ্যাশট্রেতে। গৌতম সামনে রাখা বোতলটা থেকে একটু জল খেয়ে আবার শুরু করল, – রাত আটটায় সৈকত আসে অচিন্ত্যর সাথে দেখা করতে। একতলায় স্টাডি-রুমে কথা বলতে বলতে বাপ ছেলেতে তুমুল ঝগড়া হয়। অচিন্ত্য অলরেডি নেশার ঘরে ছিল। ধাক্কা দিয়ে ছেলেকে বের করে দেয় ঘর থেকে। সৈকতও রেগেমেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ঘড়িতে তখন বাজে সাড়ে আটটা। ঝগড়ার পর অচিন্ত্য চলে যায় দোতলায় শোবার ঘরে। তখনই অচিন্ত্যকে শেষ বারের মত জীবিত দেখা গেছে। সৈকত সাড়ে আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও, মেনগেটে সিকিউরিটি জগন্নাথ পাল জানায় যে সৈকত তখনই গেট থেকে বেরয়নি। সে কম্পাউন্ডের ভিতরেই কোথাও একটা ছিল। তারপরে হঠাৎ নটা বাজার কয়েক মিনিট আগে পুরো বাড়ির পাওয়ার কাট হয়ে যায়। কিন্তু পাড়ায় বাকী সব বাড়ি বা দোকানপাটে কারেন্ট আছে দেখে জগন্নাথের সন্দেহ হয়। সে জেনারেটর কাম মিটার রুমে গিয়ে দেখে মেন ইলেকট্রিক লাইনের সার্কিট ব্রেকারটা ট্রিপ করে গেছে। লাইন সারাই করে সিকিউরিটি রুমে ফেরার পথে জগন্নাথ দেখে সৈকত খুব তাড়াহড়ো করে গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুধু জগন্নাথই নয়, রাখালের মা আর গণেশও কারেন্ট আসার পরে সৈকতকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নামতে দেখেছে।

এবার অনিকেত চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, – সৈকত এ ব্যাপারে কি বলছে?

– সৈকতের বক্তব্য সে বাবার কাছে এসেছিল কিছু টাকা চাইতে। সে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে এবছর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে। মাস্টার্সের জন্যে বিদেশে পড়তে যেতে চায়। খুবই মেধাবী ছাত্র সে। কিন্তু বিদেশে পড়তে গেলে যে পরিমাণ খরচ সেটা বহন করা তার মায়ের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে বাবার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। কিন্তু তার বাবা মায়ের ডিভোর্সের সময় যে রকম তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৈকত যে সে সময় মায়ের পক্ষ নিয়েছিল সেটা অচিন্ত্য ভোলেননি। ছেলেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। অপমানিত হয়ে সৈকতও বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। তারপরে বাইরে এসে বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায় কিছুক্ষণ। তার মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে সে আবার বাবার সাথে কথা বলতে বাড়ির ভিতরে ঢোকে। এমন সময় পাওয়ার কাট হয়ে যায়। সে এই

বাড়িতে অনেক বছর ছিল। তাই স্টাডিরুমে বাবাকে না পেয়ে দোতলায় ওঠে বাবাকে খুঁজতে। কিন্তু দোতলায় উঠে আবার তার মত পরিবর্তন হয়। সে বাবার সাথে দেখা না করেই আবার ফিরে যায়।

– লাইটারটা অচিন্ত্যর ঘরে কি করে পাওয়া গেল এই ব্যাপারে সে কি বলছে? অ্যাশট্রেতে শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনিকেত। – সে কি ঘরে ঢুকেছিল?

– না। সৈকত বলছে ওটা প্ল্যান্টেড। সে নাকি দোতলার করিডোর থেকেই ফিরে গিয়েছিল। ঘরে ঢোকেনি। লাইটারটা সিগারেট ধরানোর সময় হয়ত বাগানে তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। কেউ সেটা তুলে নিয়ে তাকে ফাঁসানোর জন্যে ওই ঘরে রেখে এসেছে।

– হুম্, ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা এই অচিন্ত্য লোকটা কেমন ছিল? মানে প্রথম স্ত্রী বা ছেলের সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল? প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন অনিকেত।

– ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে লোকেরা যেমন হয়, সেরকমই। বাবা প্রোডিউসার ছিলেন। প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছিলেন। অল্প বয়সে প্রথম বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী সুরমা মধ্যবিত্ত ভালো পরিবারের মেয়ে কিন্তু খুব দৃঢ়চেতা। ফিল্ম লাইনের স্বামীর বেহিসাবি জীবনযাপন, রাতবিরেতে পার্টি, নিত্যনতুন মহিলাসঙ্গ এইসব সহ্য করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও ছেলের কথা ভেবে প্রায় পনের বছর বিয়েটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। লাগামছাড়া হয়ে যাওয়ায় আট বছর আগে ডিভোর্সের জন্যে মামলা করেন। অচিন্ত্যও কন্টেস্ট করে। ভীষণ তিক্ততার মধ্যে দিয়ে বিয়েটা শেষ হয়। এককালীন একটা মোটাসোটা অ্যালামনি দিতে হয় অচিন্ত্যকে। সেই থেকে স্ত্রী আর ছেলের সাথে তিনি কোনও সম্পর্ক রাখতেন না।

– এখন সুরমা কোথায় থাকেন?

– সুরমা ছেলেকে নিয়ে গড়িয়ায় একটা ছোট ফ্ল্যাটে থাকেন। কাছাকাছি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ান।

– বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলা কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন খোঁজ নিয়েছ?

– হ্যাঁ! ওইদিন সারা সন্ধ্যে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তবে তার কোনও উইটনেস নেই। তিনি জানতেনই না যে সৈকত বাবার সাথে দেখা করতে গেছে।

অনিকেতের ভুরুতে চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। নীরবতা ভেঙ্গে অনিকেত বললেন, – এনি ওয়ে! তোমরা ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেট করে কি কি পেলে বল।

– হ্যাঁ বলছি। দশটার কিছুক্ষণ পরে কেশববাবু লোকাল থানায় ফোন করে প্রথম খবরটা জানায়। পুলিশ এসে দেখে দোতলায় নিজের বেডরুমের বিছানায় অচিন্ত্যর বডিটা পড়ে আছে। ক্ষুর জাতীয় কোনও প্রচণ্ড ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলার নলিটা কাটা। ক্লিন সিঙ্গল কাট। দেখে মনে হয় কোনও পেশাদার হাতের কাজ। ও হ্যাঁ! মারার আগে অচিন্ত্যকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও এটা কনফার্মড হয়েছে।

এবার অনিকেত একটু নড়েচড়ে বসলেন, – ক্লোরোফর্ম! স্ট্রেঞ্জ! তোমরা সৈকতকে সন্দেহ করছ। কিন্তু একবারও ভেবে দেখছ না যে সে ক্লোরোফর্ম পাবে কোথায়?

– জ্যেঠু। সৈকত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্টুডেন্ট। যে কোনও কেমিস্ট্রি ল্যাবেই ক্লোরোফর্ম পাওয়া যায়। তাই না?

– হ্যাঁ তা যায়। কিন্তু কেউ বাবার কাছে টাকা চাইতে আসার সময় ক্লোরোফর্ম নিয়ে আসে না। অনিকেতের গলায় শ্লেষ।

গৌতম শ্লেষটা গায়ে মাখল না। বলল, – কারেক্ট! আর ঠিক এই জন্যেই আমি মানতে পারছি না যে সৈকত খুনটা করেছে। কিন্তু কি জানেন, অচিন্ত্য সেলিব্রিটি। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী আমলা বা মন্ত্রীর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তাই সরকারের তরফ থেকে তাড়াতাড়ি অচিন্ত্যর খুনিকে ধরার জন্যে প্রচুর চাপ আসছে। এরকম পরিস্থিতিতে তদন্ত প্রভাবিত হতে বাধ্য। সবাই এখন তাড়াতাড়ি করে একজনকে ধরে তাকে খুনি সাব্যস্ত করে দিয়ে হাত পা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। তাই বলির পাঁঠা করা হচ্ছে সৈকতকে।

– হুম্! বাই দ্য ওয়ে! মার্ডার ওয়েপনটা পাওয়া গেছে?

– না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেটা পাওয়া যায় নি।

এতক্ষণে অনিকেতকে দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি কিছুটা উৎসাহ পেয়েছেন। বললেন, – যাই হোক। তারপরে বল।

– হ্যাঁ! তো পুলিশ এসে ডেডবডি পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও জানা যায় যে অচিন্ত্যর মৃত্যু হয়েছে রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে। ঘরের ভিতর ধস্তাধস্তির তেমন কোনও চিহ্ন ছিল না। খালি অচিন্ত্যর গ্লাসটা ঘরের মেঝেতে ভাঙ্গা অবস্থায় পরে ছিল। ঘরের লাগোয়া ব্যালকনি গ্রিল দেওয়া। সেই গ্রিলে ফায়ার এস্কেপের জন্যে যে প্রভিশনটা আছে, সেটাও ভিতরের দিক থেকে তালা দেওয়া। চাবি ঘরের ড্রয়ারে পাওয়া গেছে। তারমানে খুনি সামনের দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছে। ঘরে একটা হুইস্কির বোতল আর বরফের ট্রে পাওয়া গেছে। সেগুলোতে অচিন্ত্য ছাড়া আর কারোর হাতের ছাপ নেই। আগেই বলেছি সৈকতের লাইটারটা ঘরের ভিতরে পাওয়া গেছে। সেটা পড়ে ছিল মেঝেতে ওয়ার্ডরোবের সামনে।

– ওয়ার্ডরোবটা কি লক করা ছিল?

– হ্যাঁ। ওয়ার্ডরোবটা লক করা ছিল। চাবিটা ছিল সেম ড্রয়ারে। কিন্তু পরে নন্দিতা কনফার্ম করে যে ওয়ার্ডরোবে আশি হাজার মত ক্যাশ ছিল। আর ছিল কিছু সোনার গয়না। এক দেড় লাখের হবে। সেগুলো মিসিং।

– আশি হাজার টাকা ক্যাশ বাড়িতে ছিল?

– হ্যাঁ! ইন্ডাস্ট্রিতে সব লেনদেন তো আর সাদা টাকায় হয় না। প্রচুর কালো টাকা ওড়ে। এটা হয়ত সেরকমই কোনও কারণে রাখা ছিল।

– হুম্। কোয়াইট ন্যাচারাল। মাথা নাড়লেন অনিকেত, – এটা একটা মোটিভ হতে পারে। সৈকতের বাড়ি সার্চ করা হয়েছে?

– হ্যাঁ! কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। না টাকা না গয়না!

– এক্সপেক্টেড! কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কি জানি ভাবলেন অনিকেত। তারপরে বললেন, – নন্দিতা আর অরুণিমার অ্যালিবাই ক্রসচেক করেছ?

– হ্যাঁ! দুজনেরই অ্যালিবাই ফুলপ্রুফ। তাছাড়া দুজনেই বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখন অচিন্ত্য জীবিত। আর বাড়ি ফেরে অচিন্ত্যর মৃত্যুর পরে। আর মেন গেটে ডিউটিতে থাকা জগন্নাথ নিশ্চিত ভাবে জানিয়েছে যে আপনাকে যা যা বললাম এরা ছাড়া ওইদিন বাড়িতে আর কেউ ঢোকেনি বা বেরয়নি। জগন্নাথের চোখ এড়িয়ে বাড়িতে ঢোকা বা বেরনো অসম্ভব কারণ পুরো বাড়িটা সাত ফিট উঁচু দেওয়াল আর দেওয়ালের ওপরে কাঁটাতারের জাল দিয়ে ঘেরা। অতএব কোনও আউটসাইডার যে এই কাজ করেনি সে ব্যাপারে আমরা শিয়োর।

– আর কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ল্যু?

কিছুক্ষণ চিন্তা করল গৌতম। তারপরে বলল, – ক্ল্যু বলতেও পারেন আবার নাও বলতে পারেন। তবে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট একটা আছে। আমরা প্রত্যেকের মোবাইল কললিস্ট চেক করেছিলাম। সবারই মোর অর লেস নর্মাল। তবে নন্দিতার কললিস্টে দেখা গেছে নন্দিতা একটা নাম্বারে গত ত্রিশ দিনে তেইশটা কল করেছে। সেটা ওর এক্স-হাসব্যান্ড তন্ময় ঘোষের নাম্বার। নন্দিতাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলছে তার এক্স-হাসব্যান্ডের সাথে আবার তার লাস্ট পাঁচ ছয় মাস হল যোগাযোগ শুরু হয়েছিল। নন্দিতার সাথে অচিন্ত্যর বিয়েটা সাকসেসফুল হয়নি। দে ওয়্যার নট অ্যা হ্যাপি কাপল। এই ক্রাইসিসের মধ্যে তার আগের স্বামী তন্ময়ের সাথে তার যোগাযোগ হয়। তারা প্যাচ-আপ করে নেয়। দুজনে আবার বন্ধুর মত একে অপরের সাথে মিশতে থাকে।

– বাঃ বেশ ভালো! তো এই তন্ময় করে কি?

– তন্ময় বজবজে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির সেলস ম্যানেজার। নন্দিতার সাথে ডিভোর্সের পর থেকে সে একাই থাকে শ্যামবাজারের কাছে একটা ভাড়া বাড়িতে। ঘটনার দিন সরাইঘাট এক্সপ্রেসে করে গৌহাটি যাচ্ছিল। ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং ছিল সেখানে। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটেয় ট্রেনে ওঠে। পরের দিন সকাল সাড়ে নটায় গৌহাটি পৌঁছয়। শুক্রবার মিটিং সেরে শনিবার ফেরার ট্রেনে উঠে রোববার মানে গতকাল কোলকাতা ব্যাক করে। গৌহাটিতে থাকাকালীন পেপারে সে অচিন্ত্যর মৃত্যুর খবরটা শোনে। গতকাল ফেরার পরেই আমরা তার সাথে কথা বলেছি।

– তার অ্যালিবাই ভেরিফাই করা হয়েছে। অনিকেত একটু সন্দিহান।

– হ্যাঁ। সে বৃহস্পতিবার অফিসে না গিয়ে সরাসরি বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন যায়। সেখানে তাকে কিছু ডকুমেন্টস দেবার জন্যে তার অফিসের এক কলিগ গিয়েছিল। আমরা সেই কলিগকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে তন্ময়কে ট্রেনে

সি-অফ করে তারপরে বাড়ি ফেরে। গৌহাটিতে ক্লায়েন্টের তরফ থেকে তন্ময়কে স্টেশন থেকে পিক-আপ করতে লোক গেছিল। সেও তন্ময়কে গাড়ী থেকে নামতে দেখে। তাছাড়া আমরা তন্ময়ের আশেপাশের যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের মধ্যে একটা ফ্যামিলি ছিল। স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা। সেই ভদ্রলোকও আইডেন্টিফাই করেছেন তন্ময়কে।

– তারমানে অকাট্য অ্যালিবাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন অনিকেত। – কোনও উইল করে গেছে কি অচিন্ত্য?

– না। এখনও পর্যন্ত কোনও উইলের সন্ধান আমরা পাইনি। সম্ভবত তিনি কোনও উইল করে যাননি।

– হুম্! সেক্ষেত্রে তার সমস্ত সম্পত্তি পাচ্ছে তার বর্তমান স্ত্রী নন্দিতা। শ্রাগ করলেন অনিকেত।

গৌতম নীরবে সম্মতি জানাল। কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। ওয়ালক্লকটার টিক টিক ছাড়া ঘরে আর কোনও শব্দ নেই। গৌতম অপেক্ষা করতে লাগল অনিকেত কি বলেন সেটার জন্যে। উনি তার প্রস্তাবে রাজী হবেন এই আশা নিয়ে সে এত সকালে ছুটে এসেছে। একমাত্র উনিই পারেন সৈকতকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে। তার নিজের হাত পা বাঁধা। পুলিশের চাকরী করা মানে একরকম নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ওপরওয়ালার হাতের পুতুলের মত তাদের হুকুম তামিল করা। ইচ্ছে থাকলেও সিস্টেমের বাইরে বেরতে পারবে না সে।

তানিয়াকে কথা দিয়েছে সে। সৈকতকে যেভাবেই হোক এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। তানিয়া গৌতমের স্ত্রী। তিনমাসও হয়নি বিয়ে হয়েছে তাদের। অনিকেতকে সব কথা সে বলতে পারেনি। সৈকত যে তানিয়ার মাসতুতো ভাই এই তথ্যটা সে চেপে গেছে। তানিয়ার মত সেও অবাক হয়ে গেছে সৈকত এব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায়। এই কদিনের পরিচয়ে সেও বুঝে গেছে মানুষ খুন করা তো দূরের কথা সৈকতের মত এত নরম স্বভাবের ছেলে একটা মশা মারার আগেও দশবার ভাববে। অথচ এত অভিমানী ছেলেটা যে প্রিয় গৌতমদার কাছেও সব কথা খুলে বলছে না। মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে।

– ওকে! আয়্যাম গেম। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে অনিকেত বললেন, – মনে হচ্ছে কেসটায় কিছু ম্যাটার রয়েছে। আমি দেখি তদন্ত করে সত্যিটা বের করতে পারি নাকি।

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল গৌতমের মুখ। জ্যেঠুর ওপর তার অনেক ভরসা। ছোটবেলা থেকে অনিকেতের সুনাম, তাঁর সাফল্য, তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা শুনে এসেছে সে। সে নিশ্চিত এবার সৈকতের আর কোনও ভয় নেই। অনিকেত নিশ্চয়ই আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবেন। স্ত্রীর কাছে দেওয়া কথাটা রাখতে পারবে সে।

৪

কোলকাতার রাস্তায় গাড়ী চালানোটা দিনকে দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। একে তো হকারদের জ্বালায় পথচারীরা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তাটাকেই হাঁটার জন্যে ব্যবহার করছে। তার ওপর গাড়ীর সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সবথেকে

বেপরোয়া হল অটো চালকেরা। তাদের অটো চালানোর ধরণ দেখলে মিশন ইম্পসিবলের টম ক্রুজও বোধহয় লজ্জা পেয়ে যাবে। কোলকাতার তুলনায় দিল্লীতে গাড়ী চালানো অনেক সহজ ছিল।

নিজের আই টোয়েন্টিটা গ্যারেজে ঢোকাতে ঢোকাতে ভাবছিলেন অনিকেত। দময়ন্তী আর তিনি আজ গিয়েছিলেন তাঁর এক প্রাক্তন কলিগের ছেলের বিয়ের রিসেপশনে। কিন্তু সারাদিন ধরে তাঁর মাথায় অচিন্ত্য সরকারের মৃত্যুরহস্যটাই ঘুরপাক খাচ্ছে। গৌতম চেয়েছিল আজকেই তাঁকে নিয়ে একবার অচিন্ত্যর বাড়িতে গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। কিন্তু সন্ধেবেলা নিমন্ত্রণ ছিল বলে তিনি আজকে যাননি। কথা দিয়েছেন কাল যাবেন। গৌতম সাথে করে প্রত্যেকের জবানবন্দীর কপি, আর অন্যান্য কিছু ডকুমেন্টস নিয়ে এসেছিল। সেগুলো দিয়ে গেছে তাঁকে পড়বার জন্যে। কিন্তু তিনি সময় পাননি চোখ বোলানোর। ঠিক করেছেন রাতে শোবার আগে ওগুলো নিয়ে বসবেন।

দময়ন্তী ঘরে ঢুকে গেছেন। তার মেজাজটা আজ একটু চড়া। হওয়ারই কথা। একে একে তাদের পরিচিত সবার ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বাবলুর বন্ধু বান্ধবরাও সবাই আস্তে আস্তে বিয়ে করে সংসারী হয়ে যাচ্ছে। শুধু তার স্বামী আর পুত্রেরই টনক নড়ছে না। বহুদিন ধরে বলতে বলতে তিনি ক্লান্ত। যতগুলো সম্বন্ধ তিনি খুঁজে নিয়ে আসেন বাবলুর সেগুলো পছন্দ হলে অনিকেত তাতে কোনও না কোনও খুঁত বের করেন। আর অনিকেত কোনওভাবে রাজী হলে বাবলুর সেগুলো বাতিল করে দেয়। আর এই করতে করতে ছেলের বয়স বেড়ে বেড়ে ত্রিশে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ বাড়ি ফেরার পথে সারা রাস্তা এই নিয়ে তিনি গজ গজ করতে করতে এসেছেন। অনিকেত পাল্টা কোনও কথা বলেননি। কথা বললেই আগুনে ঘি পড়বে। তাই চুপ করে থাকাটাকেই বেছে নিয়েছেন। আসলে বাইরে অনিকেত যতই দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসার হন না কেন, হোমফ্রন্টে সবসময় শেষ কথাটা দময়ন্তীই বলেন। মাঝে মাঝে তিনি অবাক হয়ে ভাবেন তাঁর স্ত্রী দুনিয়ার সবকিছুকে ভয় পেলেও তাঁকে একেবারেই ভয় পায় না। আর তিনি, পৃথিবীতে কাউকে ভয় পান না, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে একটু সমঝে চলেন।

ঘরে ঢুকে দেখলেন দময়ন্তীর মেজাজ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে দময়ন্তী চলে গেল শুতে। তিনি বসলেন গৌতমের রেখে যাওয়া জবানবন্দীর ফাইলটা নিয়ে।

একঘন্টা লাগল সবার জবানবন্দী পড়ে ফেলতে। যা যা গৌতম বলে গেছে তার থেকে নতুন কিছুই পেলেন না। সাথে রেখে যাওয়া অন্যান্য কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তন্ময়ের ট্রেনের টিকিট, হোটেলের কাগজপত্রের ফটোকপি আরও কিছু ডকুমেন্টস। তৎকালের টিকিট। হোটেল রিজার্ভেশনের কাগজগুলো দেখে দেখলেন সবই ঠিকঠাক। কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। কিন্তু তাও তাঁর মনে একটা খটকা থেকে গেল। কি খটকা সেটা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু কিছু একটা তাঁর মনে এসেও আসছে না। বয়স থাবা ফেলেছে তাঁর মনে। মাথাটা আগের মত শার্প নেই আর, এই ভেবে মনে মনে একটা আক্ষেপ হতে লাগল তাঁর।

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ল্যাপটপটা টেনে নিয়ে গুগলে নন্দিতার নামে সার্চ করলেন। অনেকগুলো লিঙ্ক এলো। উইকিপিডিয়ায় গিয়ে পড়লেন তার সম্বন্ধে। গতানুগতিক লেখা, কবে জন্ম, কি কি ফিল্মে অভিনয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও কিছু এদিক ওদিক ব্রাউজ করার পরে হঠাৎ নিউজ সেকশনে একটা খবর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আড়াই

বছর আগেকার একটা খবর। নন্দিতা তখন লাগাতার তৃতীয় সুপারহিট ছবিটা করে আলোচনার তুঙ্গে। এইরকম সময় নন্দিতার তন্ময়ের সাথে ডিভোর্স আর অচিন্ত্যর সাথে সম্পর্কের মুখরোচক খবর নিয়ে মিডিয়া উত্তাল। সেই সময় কোর্টে ডিভোর্সের মামলা চলাকালীন উত্তেজিত হয়ে তন্ময় মিডিয়ার সামনে নন্দিতাকে মারবে বলে তেড়ে আসে। অকথ্য গালিগালাজের সাথে সে নন্দিতাকে খুন করে ফেলবে বলে হুমকিও দেয়। ডিভোর্স পাওয়ার জন্যে নন্দিতা তন্ময়ের বিরুদ্ধে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের অভিযোগ এনেছিল। হয়ত অভিযোগটা সর্বৈব মিথ্যে ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে নন্দিতার পক্ষে রায় দিতে বিচারকরা আর কোনও সময় নষ্ট করেননি।

মানুষের মন কি বিচিত্র। সে আড়াই বছর আগে সর্বসমক্ষে যাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়, সময়ের সাথে সাথে তার সাথেই আবার বন্ধুত্ব করে নিতে বিন্দুমাত্র সময় নেয় না। অবাক হয়ে ভাবলেন অনিকেত।

এবার অচিন্ত্য সম্বন্ধে গুগল করলেন অনিকেত। তার সম্বন্ধে বিভিন্ন আর্টিকল পড়লেন নেটে। নামকরা প্রোডিউসারের ছেলে। বাবার নাম ভাঙ্গিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ। কয়েকটা ভালো সিনেমা বানালেও বাবার মত সাফল্য পাননি। তাছাড়া অল্প বয়স থেকেই প্রচুর পয়সা হাতে আসায় তুমুল বোহেমিয়ান জীবনযাপন করেছেন। বিয়ে করা সত্ত্বেও বিভিন্ন অভিনেত্রীদের সাথে বারবার স্ক্যান্ডালে জড়িয়েছেন। অন্যান্য প্রোডিউসারদের সাথেও যে খুব ভালো সম্পর্ক, তা নয়। রাজনৈতিক পালাবদলের পরে তড়িঘড়ি নিজের ভোল পাল্টে ক্ষমতাসীন দলের সুনজরে চলে আসেন। ইদানীং হাঁটুর একটা সমস্যায় ভুগছিলেন। ট্রিটমেন্টের জন্যে লন্ডন গিয়েছিলেন মাস তিনেক আগে। সেখানেই প্রায় দুমাস থেকে হাঁটুতে সার্জারি করিয়ে দিন পনের কুড়ি হল দেশে ফিরেছিলেন।

ল্যাপটপটা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালেন অনিকেত। আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হলেও আসলে কেসটা বেশ জটিল। তাঁরও মনে মনে বিশ্বাস সৈকত খুনটা করেনি। সে এসেছিল বাবার সাথে কথা বলতে। রাগের মাথায় খুন করলে সে ক্লোরোফর্ম পেল কোথায়? সে ছাড়া আর কেই বা খুনটা করতে পারে? কেশব? তার মোটিভ কি? যাঁর কাছে চাকরী করে, তাঁকে খুন কেন করবে সে? গণেশ, রাখালের মা? তারা তো অনেকদিন ধরে আছে এই বাড়িতে। অত্যন্ত বিশ্বাসী। তাহলে কি বাইরের কেউ? জগন্নাথ হলপ করে বলছে যে আর কেউই বাড়িতে ঢোকেনি বা বেরয়নি।

অনিকেত উঠে গিয়ে ডেস্ক থেকে একটা খালি ডাইরি নিয়ে এলেন। কর্মজীবনে তিনি যখনই কোনও কেসের অনুসন্ধান করতেন, যে সব তথ্য বা নোটস উল্লেখযোগ্য বলে মনে হত, সেগুলো লিখে রাখতেন ডাইরিতে। এভাবে লিখে রাখলে পরে অনেক জট ছাড়াতে সুবিধে হয়। ডাইরিটা খুলে তিনি এখনও পর্যন্ত এই কেসে জড়িত প্রত্যেকের সম্বন্ধে যা যা জেনেছেন বা বুঝেছেন সব লিখতে শুরু করলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ভেবেচিন্তে সবটা লেখার পরে প্রথম থেকে একবার পড়তে শুরু করলেন। লেখাটা এইরকম।

অচিন্ত্য সরকার – বয়স একান্ন বছর। প্রচুর সম্পত্তি। লোক হিসেবে সুবিধের নয়। মৃত্যুর দিন কোনও কারণে উত্তেজিত ছিল (কি কারণ?)। ছেলে টাকা চাইতে এলে রেগে মেগে বের করে দেয়। সাড়ে আটটায় শেষ বার জীবিত

দেখা যায় তাঁকে। দশটার সময় তাঁর ডেডবডি আবিষ্কার করে রাখালের মা। ক্লোরোফর্মড, গলার নলি কাটা। ক্লিন সিঙ্গল কাট। মার্ডার ওয়েপন পাওয়া যায়নি। আলমারি থেকে টাকা ও গয়না মিসিং (এটাই কি মোটিভ?)।

নন্দিতা সরকার – অচিন্ত্যর বর্তমান স্ত্রী। বয়স একত্রিশ বছর। ঘটনার সময় তাজ বেঙ্গলে পার্টিতে ছিল। স্ট্রং অ্যালিবাই । খুনের সুযোগ নেই। কিন্তু মোটিভ আছে। স্বামীর মৃত্যুতে সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

সৈকত সরকার – অচিন্ত্যর ছেলে (প্রথম পক্ষের)। বয়স বাইশ বছর। মেধাবী ছাত্র, কবিতা লেখে। খুনের দিন বাবার কাছে টাকা চাইতে এসেছিল। সাড়ে আটটা থেকে নটা পর্যন্ত কোথায় ছিল বা কি করছিল তা পরিষ্কার নয়। খুনের মোটিভ টাকাও হতে পারে। আবার রাগের মাথায় খুনও হতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে হাতের ছাপ সমেত লাইটার পাওয়া গেছে। তার মানে বাবার শোবার ঘরে সে ঢুকেছিল। যদিও মুখে অস্বীকার করছে। অ্যালিবাই নেই।

অরুণিমা সরকার – অচিন্ত্যর সৎ বোন। বয়স তেত্রিশ। অবিবাহিত, ডাক্তার। ঘটনার সময় বাড়িতে ছিল না। খুনের মোটিভ নেই। সুযোগও নেই। অ্যালিবাই পাক্কা।

কেশব দেবনাথ – অচিন্ত্যর ম্যানেজার কাম সেক্রেটারি। বয়স ছেচল্লিশ। অচিন্ত্যর বাড়িতেই থাকত। ঘটনার দিন অচিন্ত্য কোনও কারণে বকাঝকা করে। খুনের সময় বাড়িতেই ছিল, কিন্তু কোনও অ্যালিবাই নেই। খুনের সুযোগ আছে। মোটিভ তদন্ত সাপেক্ষ।

সুরমা সরকার – অচিন্ত্যর প্রথম স্ত্রী। বয়স সাতচল্লিশ। খুনের সময় গড়িয়ায় নিজের ফ্ল্যাটে ছিল। কোনও অ্যালিবাই নেই। মোটিভ স্বামীর প্রতি পুরনো রাগ হতে পারে। কিন্তু খুনের সুযোগ নেই।

তন্ময় ঘোষ – নন্দিতার প্রথম পক্ষের হাসব্যান্ড। বয়স চৌত্রিশ। নন্দিতাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল। আবার এখন তার সাথেই বন্ধুত্ব। মাসে তেইশটা কল (?)। অ্যালিবাই পাক্কা। মোটিভ নেই। সুযোগ নেই।

রাখালের মা ও গণেশ – বাড়ির হেল্পিং হ্যান্ড আর কুক। বয়স যথাক্রমে আটান্ন আর একচল্লিশ। খুনের সময় বাড়িতেই ছিল। কিন্তু মোটিভ নেই। একে অপরের অ্যালিবাই।

সবটা পড়ে ফেলার পর হঠাৎ অনিকেত খেয়াল করলেন রাত দেড়টা বেজে গেছে। কাল আবার সকাল সাড়ে নটায় গৌতম চলে আসবে। অচিন্ত্যর বাড়িতে নিয়ে যাবে। বেশী রাত করলে সকালে উঠতে দেরী হয়ে যাবে। তাই আর দেরী না করে অনিকেত শুয়ে পড়লেন। গরমটাও পড়েছে প্রচণ্ড। এসির ঠাণ্ডায় আর সারাদিনের ক্লান্তিতে শুতে না শুতেই ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন ঠিক নেই। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে ভোর রাতের দিকে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নে তিনি দেখলেন কোনও একটা মস্ত বড় হলে সিনেমা দেখছেন তিনি। একজন সাদা পোশাক পড়া লোক এসে তার কাছে টিকিট দেখতে চাইল। তিনি তাঁর প্রত্যেকটা পকেটে মরিয়া হয়ে খুঁজছেন টিকিটটা। কিন্তু কোথাও পাচ্ছেন না। সারা জীবন নিয়ম মেনে চলে এসেছেন তিনি। টিকিটটা না পেয়ে লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে। আশেপাশের লোকেরা

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় তিনি খেয়াল করলেন যারা যারা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের গলায় একটা মস্ত কাটা দাগ। রক্ত চুইয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় উঠে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন তিনি। পাশে দময়ন্তী তখনও গভীর ঘুমে। মোবাইলটাতে দেখলেন সবে পাঁচটা একুশ বাজে। কাল রাতে এত ভারী খাওয়া দাওয়া হয়েছে। নির্ঘাত পেট গরম হয়ে গেছে। তার ওপর সারাদিন অচিন্ত্যর মৃত্যু মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। সবকিছুর যোগফল এই বিদঘুটে স্বপ্নটা।

এসিটা একটু কমিয়ে দিয়ে আবার একবার ঘুমনোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু চেষ্টাটাই সার হল। বাকী সময়টা খালি বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেই কেটে গেল। ঘুম আর এল না।

৫

আলিপুর কম্যান্ড হসপিটালটা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রায় পঁচিশ কাঠা আয়তাকার জমির ওপরে তৈরি অচিন্ত্যর বাড়িটাকে বাড়ি না বলে বাংলো বা ভিলা বলাটাই বেশী উচিত হবে। তাঁকে নামিয়ে দিয়ে গৌতম যখন গাড়ীটা গ্যারেজে পার্ক করছে, অনিকেত তখন সেই সুযোগে চারপাশটা ভালো ভাবে জরিপ করে নিচ্ছিলেন। মস্ত বড় লোহার গেট পেরিয়ে ঢুকতে হয় কম্পাউন্ডটাতে। গেটের পরে বাঁদিকে সিকিউরিটি রুম রেখে পাশাপাশি দুটো গাড়ী যেতে পারে এমন চওড়া একটা রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তার ওপর সাহেবি ডিজাইনের একটা পোর্টিকো। তারপরেও রাস্তাটা আরও কিছুদূর এগিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে আরও ত্রিশ মিটার মত গিয়ে গ্যারেজে এসে শেষ হয়েছে। গ্যারেজটা বেশ বড়। প্রায় চার পাঁচটা গাড়ী অনায়াসে রাখা যায়। অনিকেত দেখলেন সেখানে তাঁদের গাড়ীটা ছাড়াও আরও দুটো গাড়ী পার্ক করা। একটা কালো রঙের মার্সিডিজ বেঞ্জ আর একটা লাল রঙের মারুতি এইট হান্ড্রেড। কোলকাতার রাস্তায় মার্সিডিজের দেখা খুব বেশী পাওয়া যায় না। অচিন্ত্যর বিত্তের যে কোনও অভাব ছিল না, তার গ্যারেজে পার্ক করা এই মার্সিডিজটাই সেটার প্রমাণ। গ্যারেজের লাগোয়া আরও দুতিনটে ঘর। সেগুলোর দরজা বন্ধ। পুরো রাস্তাটার দুধারে নানা ধরণের ফুল আর পাতাবাহার গাছের বাগান। দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত বাগানটার যত্ন নেওয়া হয়। গেট দিয়ে ঢোকার পরেই ডানদিকে সবুজ মখমলের মত ঘাসে ঢাকা একটা লন। সেখানে একটা শেডের তলায় দু তিনটে সাদা শৌখিন চেয়ার আর একটা সেন্টার টেবিল। শীতকালে মিঠেকড়া রোদে বাগানে বসে চা খাবার জন্যে। পাশে একটা কাঠের বেঞ্চ আর একটা দুজন বসার মত শৌখিন সুইং চেয়ারও চোখে পড়ল। লনের পিছনের দিকটাতে বড় গাছের সারি। আম, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু ছাড়াও আরও নানা ধরণের গাছ। পুরো কম্পাউন্ডটা প্রায় সাত ফিট উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের ওপরে রয়েছে কাঁটাতারের ফেন্সিং। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে রয়েছে বড় ছোট নানা ধরণের গাছগাছালি। সব মিলিয়ে এই বাড়িতে থাকলে অক্সিজেনের অভাব কোনদিনই যে হবে না একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

পোর্টিকোটার একদিকে দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে মূল বাড়িতে ঢোকার সদর দরজা। দরজাটা খোলাই রয়েছে। গৌতমের সাথে ঘরে ঢুকতেই অনিকেত দেখলেন ডানদিকে একটা ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে ঘরে তালা লাগাচ্ছে। ছিপছিপে চেহারা। মধ্যবয়স্ক। মাথায় কোঁকড়ান কাঁচা পাকা চুল। ফর্মাল শার্ট প্যান্ট পরনে। পিঠে ব্যাকপ্যাক। পায়ে একটা চামড়ার চপ্পল। লোকটা তাঁদের লক্ষ্য না করে তালা লাগাতেই ব্যস্ত। অনিকেত আড়চোখে গৌতমের দিকে তাকাতে গৌতম অস্ফুট স্বরে বলল, – কেশব দেবনাথ।

কেশব তালাটা লাগিয়ে দুএকবার টেনে টেনে পরীক্ষা করে দেখল ঠিকঠাক লাগান হয়েছে কিনা। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁদের দেখে যেন প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে একগাল হেসে তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, – গুড মর্নিং স্যার! সকাল সকাল এখানে, কোনও বিশেষ দরকার ছিল নাকি?

– গুড মর্নিং কেশববাবু। গৌতম প্রত্যুত্তরে বলল। তারপর অনিকেতকে দেখিয়ে বলল, – এনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন মিঃ অনিকেত স্যান্যাল। দিল্লীতে সিবিআই এর ডিরেক্টর ছিলেন। সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। উনি এই কেসটার তদন্তে লালবাজারকে সাহায্য করছেন। তাই এঁকে একবার নিয়ে এলাম ঘটনাস্থলটা দেখাতে।

– অ্যাঁ সিবিআই! চোখ কপালে উঠে গেল কেশবের। – স্যারের কেসটা কি এখন সিবিআই হ্যান্ডল করছে?

– আরে না না! একটু বিরক্তই হল গৌতম। – আসলে উনি আমার পরিচিত। তাই একবার সবকিছু বুঝেশুনে, সবার সাথে কথাবার্তা বলে একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দেবেন বলেই উনি এসেছেন।

– আমি জানি এই সময়টা আপনাদের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে মুখ খুললেন অনিকেত। – আসলে খুনের তদন্ত তো। বুঝতেই পারছেন। একটু কষ্ট করতে হবে।

– না না! ছি ছি। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেল কেশব, – একশ বার কথা বলবেন। কষ্ট কেন হবে? আমরা সবাই তো চাই স্যারের খুনি যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়। কিন্তু মুশকিল হল সবার সাথে তো কথা বলতে পারবেন না, কারণ নন্দিতা ম্যাডাম তো কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেলেন। আউটডোর শুটিং আছে বোধ হয়। ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

– কি আর করা যাবে! যারা বাড়িতে আছেন তাঁদের সাথেই পরিচয়টা সেরে নেই তাহলে। অনিকেত বললেন। – তা আপনি কোথাও বেরচ্ছিলেন মনে হয়। আপনার সাথেই কথা বলে নেই প্রথমে?

– হেঁ হেঁ! ঠিকই ধরেছেন। আসলে এখানকার পাট তো চুকল। যিনি দানা যোগাতেন তিনিই আর রইলেন না। কিন্তু পেট তো আর মশাই সেকথা বুঝবে না। খোলসা করে বলল কেশব। – দেখি অন্য কোথাও কিছু অন্নসংস্থান করা যায় কিনা। মানে একটা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।

– হুম্! বেশ বেশ! তো আপনি কি বরাবরই কোথাও বেরোলে দরজায় তালা লাগিয়ে যান? আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়লেন অনিকেত।

– অ্যা! না... মানে হ্যাঁ। থতমত খেয়ে গেল কেশব। – আসলে কি জানেন তো এই কদিনে এত লোক আসছে তো বাড়িতে। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। তাই আর কি।

– হ্যাঁ, তা তো বটেই। চলুন সোফায় বসে কথা বলা যাক। বলে অনিকেত এগিয়ে গেলেন ঘরের মাঝে রাখা সোফাসেটটার দিকে।

সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনিকেত প্রশ্ন করলেন, – তা কেশববাবু, কতদিন হল অচিন্ত্যবাবুর এখানে কাজ করছিলেন?

– তা হয়ে গেল বেশ কদিন স্যার! কেশব যেন বিনয়ের অবতার। – এই তো সামনের জুলাই মাসে দুবছর পুরো হত!

– আপনার বাড়ি তো আসানসোলে। তাই না? কে কে থাকে ওখানে?

– আমার স্ত্রী আর ছেলে। সংক্ষিপ্ত জবাব কেশবের।

– তা ওদের নিয়ে আসেন না কেন কোলকাতায়?

– কি করে নিয়ে আসব বলুন স্যার। এমন কি আর কাজ করি যে বউ ছেলেকে নিয়ে কোলকাতায় বাড়িভাড়া করে থাকব? নেহাত স্যার থাকতে দিতেন তাই থাকা খাওয়ার খরচটা লাগত না। নাহলে এই সামান্য বার হাজার টাকা মাস মাইনের চাকরীতে নিজের হাত খরচাটুকু বাদ দিয়ে প্রতিমাসে পাঁচ ছয় হাজার টাকাও হয়ত বাড়িতে পাঠাতে পারতাম না। কেশবের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল।

– আচ্ছা অচিন্ত্যবাবু লোক হিসেবে কেমন ছিলেন। মানে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর কোনও শত্রু টত্রু ছিল কি? সামনে রাখা অ্যাশট্রেতে ছাইটা ঝেড়ে বললেন অনিকেত।

– কেমন করে বলি বলুন, তিনি ছিলেন আমার অন্নদাতা। তিনি কেমন লোক ছিলেন এটা বিচার করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। তবে এটা বলতে পারি ইন্ডাস্ট্রিতে কেউই কারোর বন্ধু হয় না। সবাই সবাইকে বাঁশ দেবার জন্যে সবসময় রেডি। বলে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল কেশব।

– তার মানে বলতে চাইছেন বাইরের কেউও এই খুনটা করতে পারে। ভুরু কুঁচকলেন অনিকেত।

– এমা ছি ছি! জিভ কাটল কেশব। – সে কথা কখন বললাম? তাছাড়া পুলিশ যখন ওঁর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে, তখন বুঝেই করেছে নিশ্চয়ই। তবে...

– তবে?

– না মানে, ছেলেটাকে দেখে মনে তো হয় না যে সে এই কাজ করতে পারে। কিন্তু বলা যায় না, আজকালকার ছেলে তো। আবেগের বশে চলে সবসময়। তাছাড়া স্যার সেদিন এত রেগে ছিলেন, দিয়েছিলেন দুচার কথা শুনিয়ে। তাই পাল্টা রেগে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় হয়ত...। কথাটা শেষ করল না কেশব।

– অচিন্ত্যবাবু সেদিন এত রেগে ছিলেন কেন কারণটা জানেন?

একটু ভেবে উত্তর দিল কেশব, – দেখুন, স্যারের এত বড় বড় লোকের সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা। আমি সামান্য মানুষ। আমি কি করে জানব? আদার কারবারি কি আর জাহাজের খবর রাখে? তবে ছোট মুখে একটা বড় কথা বলি? মনে হয় রাগটার পিছনে কোনও পারিবারিক কারণ জড়িত।

– এরকম মনে হবার কারণ? তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন অনিকেত।

– বিষ্যুদবার বিকেলে স্যার আমাকে কয়েকটা চিঠি টাইপ করার জন্যে ডিকটেশন দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে একটা ফোন আসে। চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গলার স্বরটাকে একদম খাদে নামিয়ে বলল কেশব, – ফোনে কথা বলতে বলতে স্যার বেশ কয়েকবার নন্দিতা ম্যাডামের নামটা উচ্চারন করেন। ফোনটা রেখে দেবার পর থেকেই দেখি তাঁর মেজাজ খারাপ। অকারণে চেঁচামেচি করছেন। যাকে তাকে ঝাড়ছেন। ডিকটেশনটাও শেষ করলেন না। বললেন এক্ষুনি বাড়ি যাবেন। তাই মনে হল আরকি।

– এই কথাগুলো আপনি আগে বলেননি তো? আকাশ থেকে পড়ল গৌতম।

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল কেশব, – আগে তো জিজ্ঞেস করেননি স্যার!

আবার রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল গৌতম। কিন্তু তাকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন অনিকেত, – সেদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পর ঠিক কি কি হয়েছিল একবার ডিটেলে বলুন তো।

একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে জবাব দিল কেশব, – সেদিন বাড়ি ফেরার পর স্যার আমাকে চিঠিগুলো মেল করে দিতে বলেন। গাদাগুচ্ছের মেল। আরও বেশ কিছু কাজও দিলেন। আসলে বহুদিন তো স্যার দেশে ছিলেন না। অনেক কাজ পেন্ডিং হয়ে ছিল। তো যাই হোক একমনে কাজগুলো করছিলাম, এদিক ওদিক তাকানোর ফুরসৎ ছিল না আমার। হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে বাইরে এসে দেখি, স্যার চিৎকার করতে করতে তাঁর ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছেন।

– কি বলছিলেন তিনি।

– এই যেমন, 'তোমরা মা ছেলে মিলে অনেক টাকা শুষেছ', 'আর এক পয়সাও দেব না', 'রাস্তায় ভিক্ষে কর গিয়ে' এইসব আর কি।

অচিন্ত্যর স্বভাবচরিত্রটা একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছিল অনিকেতের কাছে। জানতে চাইলেন, – আর সৈকত, সে কি বলছিল?

– সত্যি বলতে কি, ছেলেটাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল স্যার। এত মিষ্টি মুখটা। দুঃখে অপমানে লাল হয়ে গেছিল। মনে হচ্ছিল কেঁদেই ফেলবে। মুখটা করুণ হয়ে এল কেশবের। – বেচারা, মন খারাপ করে চুপ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

– তারপর?

– তারপর আর কি? সৈকত বেরিয়ে যাবার পরে দাপাদাপি করতে করতে স্যার উঠে গেলেন দোতলায়। আমি ঘরে ফিরে আবার কাজগুলো নিয়ে বসলাম। সৈকত কখন আবার ঘরে ঢুকেছে বা বেরিয়েছে টের পাইনি। একদম দশটার সময় রাখালের মার চিৎকারে ওপরে উঠে দেখি এই কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিকেত বললেন, – ঠিক আছে কেশববাবু আপনাকে আর আটকে রাখব না। আপনার হয়ত দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনার কাছ থেকে যা জানার ছিল জেনে নিয়েছি। আপনি এবার আসতে পারেন।

গদগদ ভাবে উঠে দাঁড়াল কেশব। বলল, – ঠিক আছে স্যার। আমি যাই একবার গণেশকে বলে দিই অরুণিমা ম্যাডামকে খবর দিতে। উনিও হয়ত বেরিয়ে যাবেন ডিউটিতে।

অনেকক্ষণ ধরেই একটা লোক দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কেশব তার কাছে গিয়ে তাকে কিছু নির্দেশ দিতে শুরু করল। সেই দিকে তাকিয়ে গৌতম রাগত স্বরে বলল, – আচ্ছা ধড়িবাজ লোক তো! দিব্যি ডাহা মিথ্যে কথা বলে চলে গেল। বিশ্বাস করুন জ্যেঠু আমি নিজে ওকে এই প্রশ্নটা আগে করেছি। তখন ও বলেছে যে ও এব্যাপারে কিছুই জানে না। আর এখন বলছে ওকে নাকি আগে জিজ্ঞেসই করা হয়নি। কোলকাতা পুলিশ যে এতটা অকর্মণ্য নয় এটা প্রমাণ করতে যেন বদ্ধপরিকর গৌতম।

– রিল্যাক্স গৌতম! আই ট্রাস্ট ইউ! আশ্বস্ত করলেন অনিকেত। – শোন! কেশব হল গভীর জলের মাছ। আমি শিয়োর ও আগে ইচ্ছে করেই তোমাদের এই কথাগুলো বলেনি। কেন বলতো? আমার মনে হয় ও এই কথাগুলো গিয়ে নন্দিতাকে বলেছিল। ওর ইচ্ছে ছিল নন্দিতাকে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা হাসিল করা। সিম্পল ব্ল্যাকমেলিং আর কি! কিন্তু নন্দিতা মনে হয় পাত্তা দেয়নি। তাই রেগে মেগে এখন আমাদের কাছে সবকথা উগড়ে দিল। দেখলে না কেমন কায়দা করে নিজে থেকে প্রসঙ্গটা তুলল। হাসতে হাসতে বললেন অনিকেত।

গৌতম চোখ দিয়ে তাঁকে থামতে ইশারা করল। কেশব ফিরে আসছে। অরুণিমাকে খবর দিতে গণেশ উঠে গেছে দোতলায়। । কেশব এগিয়ে এসে তাঁদের বলল, – তাহলে আমি আসি স্যার! গণেশকে বলে দিয়েছি। ও ম্যাডামকে ডেকে দেবে। বলে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গৌতম সামনের সেন্টার টেবিলে রাখা একটা ফিল্মি ম্যাগাজিন তুলে পাতা ওলটাতে শুরু করল। তিনি এই অবসরে উঠে দাঁড়িয়ে সারা ঘরটাতে একবার চোখ বোলালেন। ঘরে ঢুকেই প্রথমেই একটা বিশাল লিভিং রুম। এত বড় যে অনায়াসে ফুটবল খেলা যাবে। সামনে থেকেই বড় ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ডানদিকে একটা বড় ঘর। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরটা যতটুকু দেখা যাচ্ছে মনে হয় সেটা স্টাডিরুম কাম লাইব্রেরী। বড় একটা মেহগনি কাঠের

টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে। পুরো ঘরের দেওয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক। তাতে সারি সারি বই সাজানো। পাশে আরও দুএকটা ঘর। এরমধ্যেই একটা ঘর কেশবের, যেটায় এখন তালা ঝুলছে। লিভিং রুমের সামনের দিকটায় রয়েছে একটা সুদৃশ্য সোফাসেট যেখানে তাঁরা এখন বসে আছেন। সোফাসেটের সামনে একটা সেন্টার টেবিল। নীচে লাল রঙের টার্কিশ কার্পেট। মাথার ওপরে বিশাল একটা ঝাড়লণ্ঠন। তার সামনে একটা ওয়াল ইউনিটে অত্যাধুনিক এলইডি টিভি আর হোম থিয়েটার। পাশে একটা শোকেসে অনেকগুলো ট্রফি, পদক ইত্যাদি সাজানো। সোফাসেটের পিছনের দিকে আবার দুধাপ সিঁড়ির পরে ডাইনিং স্পেস। সেখানে একটা মস্ত কাঠের তৈরি ডাইনিং টেবিল। তারও পিছনে ওপেন মডিউলার কিচেন। ঘরের সব দেওয়ালেই ঝুলছে বিভিন্ন বাংলা ছবির বড় বড় পোস্টার। অধিকাংশই 'সরকার ফিল্মস' এর প্রযোজিত সিনেমা। ঘরের সবকিছুতেই বৈভবের ছাপ সুস্পষ্ট।

একটু বাদেই গণেশ নীচে নেমে এসে খবর দিল যে অরুণিমা তাঁদের ওপরে নিজের ঘরে ডাকছেন। অনিকেত গণেশকে ডেকে বললেন, – তুমি গণেশ, তাই তো। চল ম্যাডামের সাথে কথা বলার আগে তোমার সাথে আলাপটা সেরে নিই।

গণেশের মুখেচোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। আতঙ্কিত স্বরে বলল, – আমি কিছুই জানি না বাবু!

কিন্তু কিছু লাভই হল না গণেশকে প্রশ্ন করে। যাই প্রশ্ন করা হয় গণেশের বাঁধাধরা একটাই জবাব। সে কিছুই জানে না। নতুন কিছুই জানা গেল না তার কাছ থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাল ছেড়ে দিয়ে অনিকেত বললেন গৌতমকে, – চল অরুণিমার সাথে দেখাটা সেরে আসি।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ডানদিকে একটা করিডোর। করিডোরটার একপাশে সারিবদ্ধ কয়েকটা ঘর। তারই মধ্যে একটা ঘর অরুণিমার। অরুণিমা রেডি হয়ে ছিল কোথাও বেরোবে বলে। খাটের ওপরে একটা ল্যাপটপ খুলে কাজ করছিল। তাঁদেরকে দেখে ল্যাপটপটা লক করে ঘুরে বসে দেওয়ালের ধারে রাখা ছোট বেতের সোফাসেটটায় তাঁদের বসতে বলে বলল, – আমি খুবই দুঃখিত, আপনাদের বেশীক্ষণ সময় হয়ত দিতে পারব না। আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে। আমি আসলে আমার ড্রাইভারের জন্যে ওয়েট করছি। সে যে কোনও সময় এসে গেলে আমাকে কিন্তু বেরিয়ে যেতে হবে।

অনিকেত ভালো করে লক্ষ করলেন অরুণিমাকে। মাঝবয়সী। খুব সুন্দরী হয়ত নয়, কিন্তু চেহারায় একটা চটক রয়েছে। ধীর স্থির। প্রসাধনহীন মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কাঁধ পর্যন্ত স্টেপ কাট চুলে হালকা রঙের আভাস। শাড়ির ওপর একটা ডাক্তারদের সাদা অ্যাপ্রন পড়া। গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলছে। দাদার মৃত্যুতে খুব একটা শোকাতুর বলে মনে হল না।

প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষ হলে অনিকেত প্রশ্ন করলেন, – আপনার কি মনে হয় মিস সরকার। আপনার দাদাকে কে হত্যা করেছে?

মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে উত্তর করল অরুণিমা, – দেখুন সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স অনুযায়ী তো মনে হয় বাপ্পা মানে সৈকতই কাজটা করেছে। কিন্তু তাও জানেন মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। আসলে বাপ্পাকে তো ছোটবেলা

থেকেই দেখছি। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসত। দাদা যখন বৌদির সাথে মানে ওর মার সাথে ডিভোর্স করল, ভিতর ভিতর ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল ছেলেটা। হাসব্যান্ড বা বাবা হিসেবে দাদা তো কোনওকালেই খুব একটা আদর্শবান ছিল না। হয়ত এইসব ব্যাপারগুলো থেকে ওর মনে একটা চাপা ক্ষোভ বহুদিন ধরেই জমে ছিল। হঠাৎ করে সেটা আউটবার্স্ট করেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অরুণিমা।

– অচিন্ত্যবাবুর বর্তমান স্ত্রী মানে নন্দিতার সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল? অনিকেত জিজ্ঞাসা করলেন।

উত্তর দেবার আগে আবার সময় নিল অরুণিমা, – সাধারণত কারোর পার্সোনাল ব্যাপারে আমি নাক গলাই না, তাও বলছি, দাদা মানুষটাই এমন ছিল যে ওর সাথে সুখে সংসার করাটা যে কোনও মহিলার পক্ষেই বেশ কঠিন ব্যাপার। বৌদি মানে বাপ্পার মা, তাঁর মত ধৈর্যশীল মহিলাও যেখানে পারেননি সেখানে নন্দিতা এত কম বয়সে কি করে সব সহ্য করবে। আমি নন্দিতাকে দোষ দিচ্ছি না। তবে আমার মনে হয় তারও আর একটু ম্যাচিওরিটি দেখানো উচিত ছিল।

– ঠিক কি বলতে চাইছেন একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি?

– স্যাঙ্গুইন না হয়ে কিছু বলাটা আমার প্রফেশনাল এথিক্সের বিরুদ্ধে। একটু কেটে কেটে বলল অরুণিমা, – তাও এইটুকু বলতে পারি আমি ডাক্তার। আমার চোখে অনেক কিছুই ধরা পরে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে চট করে বোঝা সম্ভব নয়। আয়্যাম সরি। এর থেকে বেশী আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

এমন সময় খাটের ওপর রাখা অরুণিমার মোবাইলটা বেজে উঠল। সেটার কলার আইডিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে অরুণিমা বলল, – আমার ড্রাইভার। মনে হচ্ছে এসে গেছে। আমাকে এবার উঠতে হবে। আয়্যাম অলরেডি রানিং লেট। সো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড...

অরুণিমার ঘর থেকে বেরিয়ে অনিকেত গৌতমকে কাছে ডেকে কিছু একটা নির্দেশ দিলেন। গৌতম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপরে অনিকেত প্রস্তাব দিলেন, – দোতলায় উঠেই যখন পড়েছি, চল একসাথে অকুস্থলটাও ঘুরে আসা যাক।

অরুনিমার ঘরের দুটো ঘর পরেই অচিন্ত্যর বেডরুম। সেটা লালবাজার সিজ করে রেখেছিল। গৌতম চাবি এনেছিল সাথে। চাবি খুলে তাঁরা ভিতরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে দেখা গেল বেশ সাজানো গোছানো একটা ঘর। একটা কিং সাইজের ডাবল বেড ঘরের মাঝখানে। দুপাশে বেডসাইড টেবিলে নাইটল্যাম্প। দরজার পাশেই একটা টেবিল। টেবিলে একটা ডেস্কটপ। একটা রাইটিং প্যাড। একটা পেনস্ট্যান্ডে কয়েকটা কলম রাখা। টেবিলের সাথে রিভলভিং চেয়ার। একদিকের দেওয়াল জুড়ে একটা মস্ত হালফ্যাশনের এমডিএফ ওয়ার্ডরোব। অন্যদিকের দেওয়ালে ছোট একটা এলসিডি। ঘরের একপাশে কাঁচের স্লাইডিং ডোরের পরে একটা ইস্ট ফেসিং ব্যালকনি। সূর্যের আলোয় গোটা ঘরটা উদ্ভাসিত।

অনিকেত তীক্ষ্ণ চোখে পুরো ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘরে ঢোকার মুখে রাখা পাপোশটার দিকে এগিয়ে গেলেন। উবু হয়ে বসে একদৃষ্টিতে কিছু একটা দেখতে শুরু করলেন। তাঁকে দেখে গৌতমও কৌতূহলী হয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল। সাধারণ একটা পাপোশ। সবার ঘরেই যেরকম থাকে। উজ্জ্বল হলুদ রং। তার ওপরে কালো রঙে লেখা 'ওয়েলকাম'। গৌতম অনিকেতের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল পাপোশের ওপরে একটা সরু লম্বাটে দাগ। কালচে মেরুন রঙের। খুব খেয়াল করে না দেখলে চোখে পড়ে না। দাগটার থেকে চোখ না সরিয়েই অনিকেত প্রশ্ন করলেন, – আচ্ছা গৌতম, অচিন্ত্যর পায়ে কি কোনও কাটা দাগ টাগ ছিল?

গৌতম একটু চিন্তা করে বলল, – না জ্যেঠু। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ছিল না। তাছাড়া অটপ্সি রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে যে একমাত্র গলার কাটা দাগটা ছাড়া অচিন্ত্যর শরীরে আর কোনও নতুন বা টাটকা ক্ষতচিহ্ন ছিল না।

অনিকেত মন দিয়ে শুনলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। যেন কিছু একটা খুঁজছেন। একবার টেবিল আর খাটের তলাটাতেও উঁকি মেরে দেখলেন। কিছু খুঁজে না পেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে পেয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। করিডোরে একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট রাখা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটার কাছে গিয়ে উল্টে দিলেন সেটাকে। বেশ কিছু পুরনো কাগজ বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। অধিকাংশই বিল জাতীয়। ইলেকট্রিক, পেপার বা রেস্ট্যুর্যান্টের বিল। এছাড়াও কিছু খালি হয়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট, একটা জেমস ক্লিপ, আরও কিছু জিনিস বেরিয়ে এল। সেগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে অনিকেত কিছু একটা দুই আঙ্গুলে ধরে বের করে আনলেন। মুখে একটা হারিয়ে যাওয়া অমূল্য রত্ন খুঁজে পাওয়ার হাসি। গৌতম অবাক হয়ে দেখল একটা চৌকোণ পাতলা কাঁচের টুকরো। ইঞ্চি খানেক লম্বা, আধ ইঞ্চি মত চওড়া। এবার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে কাঁচের টুকরোটাকে রুমালে সাবধানে পেঁচিয়ে আবার রেখে দিলেন পকেটে।

অবাক হয়ে গৌতম জিজ্ঞেস করল, – ওটা কি পেলেন, জ্যেঠু?

অনিকেত উত্তর করলেন, – বলছি, দাঁড়াও! আগে সবটা দেখে নিই। বলে আবার ঘরে ঢুকে সোজা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। গ্রিলের ঠিক ওপারেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। থোকা থোকা লাল ফুলে ভরে আছে। অনিকেত হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরে তার ছোট ছোট পাতাগুলো ছিঁড়লেন। তারপরে হাতের তালুতে পাতাগুলো রেখে গ্রিলের বাইরে ফুঁ দিয়ে পাতাগুলো উড়িয়ে দিলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল শিশুদের মত অকৃত্রিম এক হাসি। গৌতমকে ডেকে বললেন, – জান গৌতম। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির কাছেই এরকম একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। সেটার পাতাগুলো নিয়ে এরকম ফুঁ দিয়ে ওড়াতে আমার খুব ভালো লাগত। সেই থেকেই কৃষ্ণচূড়া গাছ আমার খুব প্রিয়। ফুলসমেত এই গাছটা দেখলেই আমার গীতা দত্তের ওই গানটা মনে পড়ে যায়। ওই যে 'কৃষ্ণচূড়া আগুন তুমি'। তুমি শুনেছ গানটা, গৌতম?

কয়েকদিন আগে যে ঘরে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে এরকম কাব্য করতে দেখে গৌতম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অনিকেতের দিকে।

<u>৬</u>

কিছু কিছু লোক আছে যাদের সীতার পাতাল প্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন করলে তারা হরধনু ভঙ্গ থেকে বলতে শুরু করে। জগন্নাথ পাল যে এদেরই মত একজন সেটা একটু দেরীতে বুঝলেন অনিকেত। অচিন্ত্যর বাড়িতে ঢোকার সময়ই গেটের বাইরে বসে থাকা সিকিউরিটি গার্ডটাই যে জগন্নাথ গৌতম সেটা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল। তখনই অনিকেত ঠিক করে নিয়েছিলেন ফেরার পথে ওর সাথে একটু কথা বলবেন। তাই গৌতমকে গাড়ীটা বের করতে বলে তিনি নিজে এগিয়ে গিয়েছিলেন জগন্নাথের সাথে আলাপ করতে। বছর ষাট বাষট্টির লোকটা তখন গেটের বাইরে ছায়ায় একটা টুলে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে একমনে খৈনি ডলছিল। বয়সের ভারে একটু দুর্বল হলেও এখনও বেশ টানটান শরীর। মাথার কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। মুখে একটা বলিষ্ঠ গোঁফ। গৌতম প্লেন ড্রেসে এসেছে বলে চিনতে না পারলেও তাঁদের গাড়ীতে লাল বাতি দেখে সে হয়ত আন্দাজ করে নিয়েছিল এরা বেশ কেউকেটা হবে। তাই তাঁকে হঠাৎ সামনে দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একটা স্যালুট ঠুকে হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুলের ফাঁকে খৈনিটা নিয়েই দাঁড়িয়ে রইল। ভাবটা এমন যে খৈনিটা ফেলতেও পারছে না আবার মুখেও ঢোকাতে পারছে না।

দোষের মধ্যে অনিকেত ভুল করে তাকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন যে বৃহস্পতিবার রাতে সেই ডিউটিতে ছিল কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে সে, অশোক আর সজল বলে তিনজন অচিন্ত্যর বাড়ি পাহারা দেয়। দিনে আট ঘণ্টা করে ডিউটি। অশোক তার ভাইপো আর সজল অশোকের বন্ধু। দুই সপ্তাহ আগে সে বাজার থেকে কুড়ি টাকা কিলো দরে হিমসাগর আম পেয়েছিল। সেগুলো লোভে পড়ে বেশী খেয়ে ফেলায় তার পেট খারাপ হয়েছিল। তাই কেশববাবুকে বলে সে একবেলা ছুটি নিয়েছিল। তার জায়গায় সেদিন সজল ডিউটি দিয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার তার ডিউটি ছিল সকাল ছটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা সজলের বউকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। তাই সজল তাকে রিকোয়েস্ট করে সে যেন সেদিন সজলের হয়ে সন্ধ্যের ডিউটিটাও দিয়ে দেয়। ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে সেদিন দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটিটাও তাকেই করতে হয়। একে তো তার নিজের বয়স হয়েছে। তাছাড়া তার শরীরটাও পুরোপুরি সারেনি। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা যে এসব বুঝতেই চায় না এই বলে সে যখন তার বক্তব্য শেষ করল ততক্ষণে গৌতম গাড়ী নিয়ে এসে গেছে।

লোকটাকে কথা বলার সুযোগ দিলে সে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল করে দেবে। তাই পরের প্রশ্নটা করার আগে অনিকেত সতর্ক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, – সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রথমে নন্দিতা ম্যাডাম এসেছিলেন, তাই না?

শেষ পর্যন্ত খৈনিটা ফেলেই দিয়ে জগন্নাথ বলল, – হ! সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টাই তাইনেই প্রথম আইলেন। আমি তো মেলা অবাক হইলাম তাঁরে দেইখ্যা। এমনিতে তো তাইন রোজ রাত নয়টা দশটার আগে আয়েনই না। পরে পল্টু কইল সেইদিন কোনও পার্টি আসিল নাকি। তাই এত সকাল সকাল...

– এক মিনিট! পল্টু কে? বাক্যস্রোতে আগল দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনিকেত।

– পল্টু হইল ম্যাডামের ড্রাইভার। এখানে হক্কলেরই ড্রাইভার আসে। স্যারের গাড়ী চালায় বিকাশ। পল্টুর কথা তো কইলামই। আর অরুণিমা ম্যাডামের গাড়ী চালায় শ্যামল।

– ও আচ্ছা। তা নন্দিতা ম্যাডাম তো কিছুক্ষণ পরেই আবার বেরিয়ে গেলেন, তাই না?

– হ! আধঘণ্টাও হইব না। পল্টু গাড়ী রাইখ্যা আইয়া টিফিন করতে আসিল। সেই টিফিনও তার শেষ হইল না, ম্যাডামের ফোন আইল। আবার বাইর হইতে লাগব। আমি তো কই, এই ফোন থাকনটা হইল মহা সমস্যার ব্যাপার, বুঝলেন না। ইটার জ্বালায় শান্তিতে একমিনিট শ্বাস ফালানো যায় না...

– হুম্‌! ঠিকই বলেছেন। যাই হোক তারপরে অচিন্ত্যবাবু এলেন, তাই তো? অনিকেত যতটা সম্ভব নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছিলেন যাতে জগন্নাথকে দিয়ে কথা কিছু কম বলানো যায়।

– আইজ্ঞা! ম্যাডাম যাইবার লগে লগে তিন মিনিটও হইব না, স্যার আইলেন। আমি পরে ভাবলাম, আহা রে! স্যার যদি পাঁচ মিনিট আগে আইতেন, তাইলেই ম্যাডামের সাথে দেখাটা হইয়া যাইত। কে জানত পরে আর দেখাই হইব না। মুখটা দুঃখী দুঃখী করে লম্বা একটা শ্বাস ছাড়ল জগন্নাথ।

অধৈর্য হয়ে গৌতম নেমে এল গাড়ী থেকে। তাকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে অনিকেত পরের প্রশ্ন করলেন, – এরপর অরুণিমা ম্যাডাম কখন এলেন?

– তা ধরেন আরও আধা ঘণ্টা বাদে। আমি তো শ্যামলরে দেইখ্যা প্রথমে চিনছিলামই না। পরে খেয়াল কইর‍্যা দেইখ্যা চিনলাম। তারে কইলাম, কিতা রে ব্যাটা। বেশ তো ছুটি কাটাইলে তিনদিন। কর, ভালা কইর‍্যা মজা কর।

– শ্যামল ছুটিতে ছিল কেন?

– ক্যান আবার? ম্যাডামের গাড়ী গ্যারাজে গেসল না। ছারভিসিং-এ। ব্যাটা তিনদিন মাগনা ছুটি কাটাইল। হেইদিনই কাজে যোগ দিল। দিতে না দিতেই আবার ছুটি।

– আবার ছুটি?

– হ! ম্যাডাম হেইদিন তাড়াতাড়ি ছাইড়্যা দিসলেন তারে। নিজেই গাড়ী চালাইয়া বারইলেন পরে।

– হুম্‌! তারপর সৈকত কখন এল?

– অরুণিমা ম্যাডাম বাইর হইবার পাঁচ সাত মিনিট পরেই। আহা রে! বড় ভালা আসিল পোলাটা। ছোটবেলা, আমার কোলে আইয়া বইয়া থাকত। কি যে মাথার দোষ হইল, বাপরেই জানে মাইর‍্যা দিল। আপনারে আগেই কইলাম না, আজকালকার পোলাপানরা কিছুই বুঝতে চায় না। যেটা তারার মাথাত একবার ঢুকে...

– লোডশেডিংটা হল কখন?

– আর কইয়েন না। কয়টা হইব তখন। রাত নয়টাও হয় নাই। সবে রাতের খাবারটা লইয়া বইসি। টিফিন বাক্স খুইল্যা দেখি সেই রুটি আর আলুর তরকারীই দিসে। সাথে দুইটা কাঁচালঙ্কা আর এক টুকরা পেঁয়াজ। মেজাজ গেল গরম হইয়া। কতবার কইসি বৌরে আমার পেট এখন ঠিক হইয়া গেসে। তাও কথা কানে লয় না। কন দেখি রোজ রোজ রুটি খাইতে ভাল্লাগেনি কারুর? তো যাই হউক, সবে এক গ্রাস মুখে দিসি, সব বেবাক অন্ধকার হইয়া গেল। খাওয়া মাথাত উঠল। তার উপরে দেখি কি বাকী হক্কল জায়গায় লাইট জ্বলে। তাই জেনারেটর চালাইতে গিয়া ভাবলাম, দেখি তো একবার কি বিষয়। দেখি, যা ভাবসি তাই, লাইন টিরিপ হইসে।

– তাই নাকি? আচ্ছা জেনারেটর রুমটা কোথায় বলুন তো?

– ওই তো গ্যারেজের পাশেই। এইটা আরেক মুশকিল হইসে এখন। রাতবিরেতে কারেন্ট গেলেই ফোন আয়, 'জগন্নাথ, জেনারেটর চালাও'। আর আমারে এতটা পথ হাইট্যা যাইতে লাগে। আগে যখন জেনারেটর আসিল না, এই ঝামেলাটা...

– আচ্ছা ঠিক আছে জগন্নাথ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আজ আসি, কেমন? পরে একদিন এসে তোমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প করে যাব। কথাগুলো বলে তড়িঘড়ি পা চালালেন অনিকেত।

গাড়ীতে উঠে গৌতম বলল, – বাপরে বাপ। বকে বকে কানের পোকা বের করে দিল লোকটা। কি করে জানি আপনি সহ্য করছিলেন?

অনিকেত স্মিত হেসে বললেন, – সহ্য করতে হয়, গৌতম। সহ্য করতে হয়। আমাদের অনেক সিনিয়র, একজন কিংবদন্তী বেলজিয়ান ডিটেকটিভ কি বলে গেছেন জান? বলেছেন এইসব অবান্তর কথাবার্তাকে ইগনোর করতে নেই। কারণ এর মধ্যে থেকেই এমন সব সূত্র বেরিয়ে আসে যেগুলো পরে রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

– হুম্, তা কি এমন সুত্র বেরোল জগন্নাথের সাথে কথা বলে?

রহস্যময় হাসি হাসলেন অনিকেত, – জানা গেল যে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও জগন্নাথের বৌ তাকে রাতের বেলা টিফিনে কেবল রুটি আর আলুর তরকারীই দেয়।

বহুদিন বাদে হা হা করে হেসে উঠল গৌতম। সত্যি পুলিশের চাকরীতে এমন অনাবিল হাসির মুহূর্ত খুব একটা সহজলভ্য নয়।

***

রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে দুপুরে একটা সলিড ঘুম দিয়ে উঠে অনিকেত দেখলেন মোবাইলে গৌতমের দুটো মিসড কল। সাধারণত ঘুমনোর সময় কোনও ব্যাঘাত পছন্দ করেন না বলে শোবার আগে নিজের মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে রাখাটা তাঁর বরাবরের অভ্যাস। এর ফলে গভীর রাতে সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানিগুলোর প্রমোশনাল কলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোন যায়। এতে অবশ্য কিছু সমস্যাও আছে। অনেক সময়ই কোনও

দরকারি ফোন এলে সেটা মিস হয়ে যায়। যেমন এখন গৌতমের কলগুলো ধরতে পারলেন না। সকালে দেখা হবার পরেও যখন দু দুটো মিসড কল, তার মানে নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসে কলব্যাক করলেন গৌতমকে।

যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। ফোন ধরেই উত্তেজিত গলায় বলল গৌতম, – জ্যেঠু। এক্ষুনি আমি আবার ফোন করতে যাচ্ছিলাম। নতুন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। খুব ইম্পরট্যান্ট। পুরো ব্যাপারটাই ঘেঁটে গেছে।

শান্ত গলায় বললেন অনিকেত, – তাই নাকি? বল কি কি খবর।

– একটা নয় তিন তিনটে নতুন ক্লু। প্রথমটা হল আপনার কথামত আমি নন্দিতার পার্সোনাল ডক্টরকে খুঁজে বের করে তাঁর কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছেন যে নন্দিতা প্রেগন্যান্ট। সেকেন্ড মান্থ চলছে। ব্যাপারটা প্রচণ্ড সিক্রেট। তিনি প্রথমে জানাতে চাননি। কিন্তু মার্ডার কেস বলে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হেল্প করতে সম্মত হয়েছেন।

– হুম্‌, অরুণিমা তাহলে ঠিকই নোটিশ করেছিল। ওর কথাতে আমি এরকমই কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম। ওকে! নেক্সট ওয়ান!

– পরের খবরটা একটা রিউমার বা গসিপও হতে পারে। সত্যি কি মিথ্যে জানি না। ব্যাপারটা হল বেশ কদিন ধরেই ইন্ডাস্ট্রিতে কানাঘুষোয় একটা খবর শোনা যাচ্ছে। নন্দিতা নাকি রিসেন্টলি শাক্যর সাথে একটা রিলেশনে জড়িয়ে পড়েছে।

– শাক্য! সে আবার কে?

– শাক্য হল বাংলা সিনেমার একজন হিরো। টালিগঞ্জের উদীয়মান তারকা বলতে পারেন। ডেব্যুতেই মারকাটারি হিট দিয়ে সবার নজরে এসেছিল। পরের দুটো ছবি অতটা হিট না হলেও বক্স অফিসে ভালই বিজনেস করেছিল। এরই মধ্যেই প্রচুর ফ্যান ফলোয়িং ছেলেটার। তার কারেন্ট ছবির হিরোইন নন্দিতা। লাস্ট তিন চার মাস ধরেই ওদের মধ্যে বেশ ভাব ভালবাসা চলছিল। প্রথমে ব্যাপারটা গোপনই ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে ওদের নিয়ে লোকমুখে নানারকম চর্চা শুরু হয়েছে। এখন পুরো ব্যাপারটাই ফিল্মের একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিও হতে পারে। তবে যা রটে তার কিছুটা তো বটে। তাই না?

– ইন্টারেস্টিং! তার মানে মঞ্চে নতুন অভিনেতার আগমন। পান ইন্টেন্ডেড। হালকা হেসে বললেন অনিকেত।

– একদম তাই! গৌতমও সায় দিল। – তাছাড়া জ্যেঠু হয়ত সেইদিন এই রিউমারটাই অচিন্ত্যর কানে এসেছিল। তাই সে এত ক্ষেপে ছিল।

– অস্বাভাবিক নয়। অনিকেত সিরিয়াস। – এনি ওয়ে! তৃতীয় খবরটা?

– তিন নম্বর খবরটাই সবচেয়ে হার্ডহিটিং। বিশ্বস্ত সুত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, নন্দিতা গত বৃহস্পতিবার তাজ বেঙ্গলের পার্টিতে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সারাক্ষণ সেখানে ছিল না। সে সাতটার একটু পরে পার্টিতে ঢোকে। কিন্তু কিছুক্ষণ

পরে সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। আবার আন্দাজ নটা সাড়ে নটার ভিতরে ব্যাক করে। কোথায় গিয়েছিল কেউ জানে না। তার মানে ওইটুকু সময় তার কোনও সুনির্দিষ্ট অ্যালিবাই নেই।

– গ্রেট! কাহানি মে টুইস্ট। এখন পুরো জিনিসটা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। অনিকেত একটু গম্ভীর। – বাই দ্যা ওয়ে! নন্দিতাকে এ ব্যাপারে ক্রস করেছ?

– না! এখনও করা হয়নি। আজ তো নন্দিতার ফিরতে রাত হয়ে যাবে। ভাবছি কাল একবার কথা বলব।

– ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ক্যান আই টেক দিস রেস্পন্সিবিলিটি? ও জেনেশুনে আগে পুলিশকে বলেনি কথাগুলো। সেলিব্রিটি তো। হয়ত মিডিয়ার ভয়ে এবারও বলতে চাইবে না। তোমার জায়গায় আমি যদি গিয়ে কথা বলি তাহলে মনে হয় সে অনেক খোলা মনে কথা বলবে।

– ওহ শিয়োর। নো ইস্যুজ অ্যাট অল। গৌতম এককথায় রাজী। – আপনি ঠিক বলেছেন! আমার মনে হয় আপনি কথা বললেই বেটার হবে। আমি এক কাজ করছি। আমি কাল সকালে নটায় নন্দিতার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখছি। সাথে আপনার একটা ইন্ট্রোডাকশনও দিয়ে দিচ্ছি।

– দ্যাটস বেটার! বললেন অনিকেত। – সাথে একবার ওই শাক্য ছোকরাকেও বলে রেখ। দরকার পড়লে ওর সাথেও একবার কথা বলতে হতে পারে।

– নো প্রবলেম। নিশ্চিন্ত করল গৌতম। – তো আজকে সন্ধ্যেবেলা আপনার প্ল্যান কি? দুপুরে বলছিলেন সৈকতের সাথে কথা বলবেন। আসবেন নাকি একবার এদিকে?

– হ্যাঁ আসব। কিন্তু তার আগে একবার যাব গড়িয়ায়। বিশদ করলেন অনিকেত। – সুরমা সরকারের সাথে একবার কথা বলতে চাই। সেখান থেকে ফেরার পথে ঢুঁ মারব তোমার ওখানে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গৌতম বলল, – ওকে, আমিও আসছি তাহলে। মানে পরিচয় দেবার জন্যে...

– আরে না না! তোমাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। বাধা দিয়ে বললেন অনিকেত। – ডোন্ট ওয়রি। আই উইল ম্যানেজ।

– ঠিক আছে! আমি তাহলে এক কাজ করছি, একবার ওঁকে ফোন করে আপনার আসার কথাটা বলে দিচ্ছি। নাছোড়বান্দা হয়ে বলল গৌতম। – ওকে জ্যেঠু! ছাড়ছি তাহলে?

– অ্যাজ ইউ উইশ! চল, সি ইউ লেটার!

অনিকেতের মনে হল ফোনটা যেন একটু তাড়াহুড়ো করেই রেখে দিল গৌতম।

***

তৃপ্তি করে চা টা শেষ করে কাপটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অনিকেত। অনেকদিন এরকম ভাল চা খাননি তিনি। সুন্দর একটা ফ্লেভার ছিল সেটাতে। হয়ত এলাচের। কিন্তু শুধু এলাচের জন্যে নয়, বানানোর সময় দুধ, চিনি, চা পাতার সাথে আন্তরিকতা আর যত্নটাও উপযুক্ত পরিমাণে মিশেছে বলেই চায়ের স্বাদটা আরও বেড়ে গেছে।

তাঁর সোফার উল্টো দিকে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছেন সুরমা। মুখে বয়সের ছাপ পড়লেও লাবণ্য এখনও যায়নি। দেখেই বোঝা যায় যে এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে দেখে অনিকেতের একটু খারাপই লাগল। কোথায় থাকতে পারতেন সাতমহলা রাজপ্রাসাদের রাজরানী হয়ে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আজ রয়েছেন গড়িয়ার ছোট্ট দুই বেডরুমের এই ফ্ল্যাটে। তবে ছোট হলেও পরিপাটি করে সাজানো এই ফ্ল্যাটটার সবকিছুতেই রুচির ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। খুবই ছোট ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুমটায় একটা টু সিটার সোফা আর একটা ডাইনিং টেবিল রাখার পর জায়গা আর প্রায় নেই বললেই চলে। ফ্রিজটা একটা বেডরুমে যাবার দরজাকে আধাআধি ব্লক করে রাখা। একটা ছোট টি টেবিল। সেটার ওপর সুন্দর হাতে ফেব্রিক করা একটা টেবিলকভার। একটা র‍্যাকে একটা ফুলদানীর সাথে গীতবিতান, সঞ্চয়িতা আর কিছু অন্যান্য বই সাজিয়ে রাখা। দেওয়ালে ঝোলানো কয়েকটা ফটোফ্রেমে ফ্যামিলি মেম্বারদের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত বন্দী করে রাখা। দরজার ঠিক ওপরে ঝুলছে একটা মানিপ্ল্যান্ট। সব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই বাড়ির বাসিন্দাদের স্বাচ্ছন্দ্য খুব বেশী না থাকলেও সুখের কোনও অভাব নেই।

তবে অনিকেত যতটা ভেবেছিলেন, আচমকা বিপদে ততটা ভেঙ্গে পড়েননি সুরমা। আসলে আগজীবনের এত ঝড়ঝাপটাই হয়ত তাঁর চরিত্রে এই বিপদে অটল থাকার মনোভাবটা এনে দিয়েছে। তাঁর স্থির বিশ্বাস আগের মত এই বিপদটাও তাঁরা সামলে নেবেন। এই কথাগুলোই বলছিলেন তিনি অনিকেতকে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলে এমন কাজ করতেই পারে না। এই শিক্ষা তিনি তাঁর সোনার টুকরো ছেলেকে দেননি। আর তাঁর ছেলে যখন এমন কাজ করেইনি, তখন ভগবান নিশ্চয়ই সৈকতকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি জানালেন সৈকত তাঁকে ছেড়ে বাইরে পড়তে যেতে চায়নি। তিনিই জোর করেন, বলেন এত ভাল সুযোগটা হাতছাড়া করাটা ঠিক হবে না। কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি যে সৈকত মার ওপর যাতে চাপ না পড়ে সে জন্যে বাবার কাছে টাকা চাইতে যাবে। জানলে তিনি এমনটা কখনই হতে দিতেন না।

অনিকেত জিজ্ঞেস করলেন, – অচিন্ত্যর ওপর আপনার রাগ হত না?

– নাহ! আগে খুব রাগ হত। কিন্তু আজকাল আর হত না, বিশ্বাস করুন। ওঁকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরমা বললেন, – খালি মনে মনে ভাবতাম এই একটা লোকের জন্যে কতগুলো মানুষ কষ্ট পেল। নিজের কথা বলছি না। আমার তো বয়স হয়েছে, আজ আছি কাল নেই। খারাপ লাগে বাপ্পার জন্যে। বাবা ছিল ওর হিরো। ও যে কতটা কষ্ট পেয়েছে সেটা কেবল আমিই জানি। খারাপ লাগে পিঙ্কির মানে অরুণিমার জন্যে। কতটুকুই বা ছিল ও যখন আমি বিয়ে করে এসেছিলাম। নয় কি দশ হবে। সদ্য মা মরা মেয়েটা আমাকে মার মতই দেখত। অচিন্ত্যর সাথে আমার বিচ্ছেদটা মনে মনে মেনে নিতে পারেনি। একটু থেমে আবার যোগ করলেন, – আর খারাপ লাগে তন্ময়ের জন্যে। তন্ময় ঘোষ। নন্দিতার আগের স্বামী। বেচারা। নিজে সাফার করেছি তো, তাই ঘর ভাঙ্গার

যন্ত্রণাটা বুঝি। নন্দিতা তো ছিল বোকা। কম বয়স। ওকে দোষ দিই না। আমার মতই কষ্ট পেয়েছিল তন্ময়। এখন অচিন্ত্য নেই। আশা করি এবার ওরা সুখী হবে।

তাঁর গলার স্বরে এমনই একটা বিষণ্ণতা ছিল যে ঘরে যেন একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল।

৭

সকাল সকাল মেজাজটা তেতো হয়ে গেল। এসি মেকআপ ভ্যানে বসে একটা কোক খেতে খেতে এটাই ভাবছিলেন অনিকেত। তিনি এসেছেন টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়াতে শাক্যর সাথে দেখা করতে। শাক্য ছেলেটাকে আগে থেকে বলাই ছিল। তার এখন শুটিং চলছে বলে সে তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছে। হঠাৎ অনিকেতের মনে হল গৌতমকে একবার সকালে নন্দিতার সাথে যে কথাবার্তা হল সেই সম্বন্ধে একটু আপডেট করা দরকার। তাই মোবাইলটা বের করে একটা টেক্সট করলেন গৌতমকে। – নন্দিতা টার্নড আপ হসটাইল! ওয়েটিং টু মিট শাক্য।

অথচ এরকমটা হবে আশা করেননি অনিকেত। নন্দিতার সাথে কথা বলার জন্যে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী পৌঁছে গিয়েছিলেন অচিন্ত্যর বাড়িতে। নন্দিতাও শুটিং পিছিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। কফি, চানাচুর দিয়ে আপ্যায়নও করেছিল। কথাবার্তা শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক সুরেই। নন্দিতাকে দেখে বেশ শোকসন্তপ্ত লাগলেও এর অনেকটাই যে অভিনয় সেটা ধরে ফেলতে অভিজ্ঞ অনিকেতের খুব বেশী সময় লাগেনি।

প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পরে অনিকেত প্রশ্ন করেছিলেন, – আচ্ছা মিসেস সরকার, মূলত যে কারণে আপনার সাথে দেখা করতে আসা, আপনি আপনার জবানবন্দীতে পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে বৃহস্পতিবার রাত্রে আপনি সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাজ বেঙ্গলে একটা পার্টিতে ছিলেন। কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি যে সেদিন আপনি কিন্তু সারাক্ষণ সেই পার্টিতে ছিলেন না। মাঝে প্রায় এক দেড় ঘণ্টার জন্যে আপনি পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমি জানতে চাই ওই সময়টা আপনি কোথায় ছিলেন?

শোনামাত্র একটু চমকে উঠেছিল নন্দিতা। এতক্ষণ মুখে একটা করুণ হাসি ফুটিয়ে রেখেছিল। নিমেষে সেটা মিলিয়ে গেল। একটু সময় নিয়ে বলল, – আমি জানি না কি করে আপনারা এই খবরটা পেলেন। কিন্তু পেয়েই যখন গেছেন, তখন আমি অস্বীকার করব না। সত্যিই আমি সেদিন পুরোটা সময় ওই পার্টিতে ছিলাম না। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য নই সেদিন আমি কোথায় গেছিলাম। আয়্যাম সরি, মিঃ স্যান্যাল।

গম্ভীর গলায় বলেছিলেন অনিকেত, – কিন্তু মিসেস সরকার। আপনি বুঝতে পারছেন না, দিস ইজ আ মার্ডার ইনভেস্টিগেশন। এই ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করাটা আপনার কর্তব্য। অ্যাট লীস্ট আপনার নিজের স্বার্থে।

কোমল মুখটা পাথরের মত হয়ে গেছিল নন্দিতার। – আমার পার্সোনাল ব্যাপারে কেউ ইন্টারফেয়ার করুক এটা আমি পছন্দ করি না।

– অ্যাজ অ্যা ওয়েল উইশার আপনাকে বলছি, পুলিশের কাছে কিন্তু কিছুই গোপন থাকে না, মিসেস সরকার। আজ না হোক কাল পুলিশ ঠিক খুঁজে বের করবেই সেই সময়টুকু আপনি কোথায় ছিলেন বা কি করছিলেন? ফর ইয়োর ইনফো তাজ বেঙ্গল থেকে আপনার বাড়িতে আসতে কিন্তু দশ মিনিটও সময় লাগে না। আপনি যতটা সময় অনুপস্থিত ছিলেন সেটুকু সময়ের মধ্যে খুব সহজেই পার্টি থেকে বেরিয়ে বাড়িতে এসে একটা মার্ডার করে আবার পার্টিতে ফিরে যাওয়া যায়। কঠিন স্বরে বলেছিলেন অনিকেত।

– আপনি এবার আসতে পারেন, মিঃ স্যান্যাল। কেটে কেটে উচ্চারন করেছিল নন্দিতা।

– কাজটা আপনি ঠিক করলেন না, মিসেস সরকার। পুলিশের সন্দেহের তালিকায় কিন্তু আপনিও আছেন। শাক্যর সাথে আপনার মেলামেশার কথাটা পুলিশ জানে। তাছাড়া পুলিশ এটাও জানে যে আপনি প্রেগন্যান্ট। এবং সেটা এমন এক সময় যখন আপনার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে ছিলেন। দিস ক্যান বি অ্যা পোটেনশিয়াল মোটিভ ফর দিস মার্ডার। গলাটা যথাসম্ভব নরম করে বলেছিলেন অনিকেত, – আমি আপনাকে সাহায্য করতেই এসেছিলাম। আমাকে সব কথা খুলে বললেই ভাল করতেন।

বলে গট গট করে অনিকেত বেরিয়ে এসেছিলেন। পিছনের দিকে আর ফিরেও তাকাননি। তাকালে দেখতে পেতেন দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল নন্দিতা। সেটা ছিল সত্যিকারের কান্না। কোনও অভিনয় ছিল না তাতে।

অনিকেতের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। দরজা ঠেলে ভ্যানে ঢুকল একটি বছর সাতাশ আঠাশের ছেলে। ছ ফিটের কাছাকাছি হাইট। পেশীবহুল সুঠাম শরীরে একফোঁটা অতিরিক্ত মেদ নেই। দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত জিম করে। কালো রঙের একটা স্কিন টাইট টি-শার্ট আর ফেডেড জিনস পড়া। পায়ে সাদা স্নিকার্স। ঘাড় অব্দি লম্বা চুলে ভরা মাথায় একটা ব্যান্ডানা। গ্রীক দেবতাদের মত ফর্সা সুন্দর মুখে মিষ্টি একটা হাসি। হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে বলল, – হাই মিঃ স্যান্যাল। দিস ইজ শাক্য হিয়ার। সরি আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হল।

বেশী কথা বলার মুডে ছিলেন না অনিকেত। হ্যান্ডশেক করে ভণিতা ছেড়ে সরাসরি তাকে প্রশ্ন করলেন নন্দিতার সাথে তার সম্পর্কের ব্যাপারে। কিন্তু তাঁকে অবাক করে কোনও রকম লুকোছাপার মধ্যে দিয়ে গেল না শাক্য। গাঢ় স্বরে বলল, – ওহ ইয়েস! আপনি ঠিকই শুনেছেন। উই লাভ ইচ আদার! নন্দিতা আর আমি একে অপরকে ভালোবাসি। উই আর গোইং টু গেট ম্যারেড সুন।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন অনিকেত ছেলেটার আত্মবিশ্বাস দেখে। বয়সে নন্দিতার থেকে ছোটই হবে, তার ওপরে নন্দিতা কয়েকদিন আগেও বিবাহিত ছিল। তাও কেমন অবলীলায় স্বীকার করে নিল সম্পর্কের কথাটা। অচিন্ত্য মারা গেছে বলেই কি সে এই সাহসটা দেখাতে পারছে? বাঁকা সুরে বললেন, – তাহলে তো অচিন্ত্যবাবু মারা যাওয়ায় আপনাদের বেশ সুবিধেই হল। তাই না? তিনি বেঁচে থাকলে তো এই সম্পর্কটা মেনে নিতেন না।

– আই অ্যাম সরি স্যার! ইউ আর রং হিয়ার। মৃদু হেসে জবাব দিল শাক্য, – উনি বেঁচে থাকলেও আমাদের কিছু এসে যেত না।

– ওহ রিয়্যালি? আপনি কি বলতে চাইছেন অচিন্ত্যবাবু তাঁর স্ত্রীর এই অবৈধ সম্পর্কটা এক কথায় মেনে নিয়ে তাঁকে ডিভোর্স দিয়ে দিতেন যাতে আপনারা বিয়ে করে বাকী জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাতে পারেন। অনিকেতের গলায় ব্যাঙ্গ ঝরে পড়ল।

– ডিভোর্স! বাট হোয়াই? শাক্যও কিছু কম যায় না। – ডিভোর্সের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? কোন অধিকারে অচিন্ত্য নন্দিতাকে ডিভোর্স দেবে?

ছেলেটার স্পর্ধা দেখে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল অনিকেতের। গলাটা সামান্য চড়ালেন তিনি – তার মানে?

– গেট ইয়োর ফ্যাক্টস স্ট্রেট, স্যার। অচিন্ত্য আর নন্দিতা কোনদিনই স্বামী স্ত্রী ছিল না। দে ওয়্যার জাস্ট লিভিং টুগেদার। শাক্য প্রাঞ্জল করল। – স্কাউন্ড্রেলটা নন্দিতাকে খালি ইউজ করত। আর কিছুই নয়।

প্রচণ্ড একটা ঝটকা খেলেন অনিকেত। ব্যাপারটা হজম করতে একটু সময় লাগল তাঁর। বললেন, – কি বলছেন কি আপনি? আর ইউ শিয়োর?

– ইয়েস স্যার। আই অ্যাম হান্ড্রেড পারসেন্ট শিয়োর। ওদের কোনদিনই বিয়ে হয়নি। না আইনত না ধর্মীয়। এতক্ষণে খুলে বলল শাক্য। – স্রেফ মিডিয়া যাতে নতুন করে স্ক্যান্ডাল না করে তাই চোখে ধুলো দেবার জন্যে ওরা এই নাটকটা চালাত। অবশ্য নন্দিতা বার বার রিকোয়েস্ট করত বিয়ে করে নেবার জন্যে। কিন্তু বুড়োটা কিছুতেই শুনত না। এই নিয়েই তো ওদের মধ্যে যত ঝামেলা।

– এই ব্যাপারটা আর কে কে জানে? গলার স্বরটা নরম হল অনিকেতের।

– আমি যদ্দুর জানি দিস ওয়াজ অ্যা ওয়েল কেপ্ট সিক্রেট। এমনকি ওদের বাড়ির লোকেরাও জানে না। নন্দিতা খালি আমাকেই জানিয়েছে। বুঝতেই পারছেন...। কথাটা শেষ করল না শাক্য।

– কিছু মনে না করলে একবার বলবেন কি আপনার সাথে নন্দিতার সম্পর্কটা ঠিক কতদিন হল শুরু হয়েছে?

একটু ভেবে উত্তর করল শাক্য, – হুম্ তিন মাস... না না চার মাস হবে। এই তো এই ছবিটার কন্ট্রাক্টে সাইন করার জাস্ট আগে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন অনিকেত। তাঁর চোখদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। বললেন, – থ্যাঙ্কস অ্যা লট, শাক্য। আপনার সাথে আরও কিছু কথা ছিল। কিন্তু আমাকে একটা খুব জরুরী কাজে এক্ষুনি বেরতে হবে। আমি আপনাকে পরে কল করে নেব। বলে হতভম্ব শাক্যকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সটান দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন ভ্যান থেকে।

***

পয়লা মে তে সব অফিস কাছারি বন্ধ থাকলেও পুলিশের কোনও ছুটি নেই। তার ওপর যাচ্ছেতাই গরমও পড়ে গেছে। এসিটা চলা সত্ত্বেও ঘাম হচ্ছিল গৌতমের। অচিন্ত্যর কেসটা যে কোন দিকে গড়াচ্ছে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

ওপরমহল থেকে ক্রমাগত চাপ এসে যাচ্ছে। কাল অনিকেত এসেছিলেন সৈকতের সাথে দেখা করতে। সে চায় না অনিকেতের কাছে তার আর সৈকতের আত্মীয়তার সম্পর্কটা প্রকাশ হয়ে যাক। অনিকেত তাকে একজন বায়াস্ড পুলিশ অফিসার মনে করুক, এটা সে মেনে নিতে পারবে না। যদি মুখ ফস্কে সৈকত তার ব্যাপারে কিছু বলে দেয় এই ভয়ে সে অনিকেতের সাথে সৈকতের সামনে যায়নি। একই কারণে কাল অনিকেত সুরমার সাথে দেখা করতে যাবার আগে সে তার মাসী শ্বাশুড়ীকে ফোন করে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে বারণ করে দিয়েছিল। রাতে আবার ফোন করে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে সুরমা অনিকেতের কাছে গৌতমের কথা চেপে গেছেন। কিন্তু সৈকতের সাথে কাল বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছেন অনিকেত। বেরনোর পর সে অনিকেতকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু অনিকেত এড়িয়ে গেছেন। কি কথাবার্তা হল কিছুই জানাননি। কি যে ওঁর মাথায় ঘুরছে খোলসা করে কিছুই বলছেন না। ফলে গৌতমের টেনশন আরও বাড়ছে। তার ওপর একটু আগে মেসেজ করলেন যে নন্দিতা নাকি তাঁর সাথে সহযোগিতা করেনি। তাহলে কি নন্দিতাকে একবার থানায় ডেকে পাঠাবে? থানায় এলে আর কোনও জারিজুরি খাটবে না ম্যাডামের। কথায় বলে না বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, কিন্তু পুলিশে ছুঁলে...

হঠাৎ বুকপকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। কে করছে একবার দেখে নিয়ে ফোনটা ধরে বলল, – হ্যাঁ জ্যেঠু! বলুন। কথা হল শাক্যর সাথে।

উল্টো দিকে অনিকেত এক নিঃশ্বাসে যা যা বলে গেলেন মন দিয়ে শুনল সে। কিন্তু কিছুই বুঝল না হঠাৎ করে এরকম নির্দেশ কেন দিলেন অনিকেত। কখন যে কি ওঁর মাথায় চাপে ভগবানই বোধ হয় ভাল বলতে পারবেন। ফোনটা রেখে দিয়ে সাবঅর্ডিনেট প্রকাশকে ডেকে বলল, – প্রকাশ, তাড়াতাড়ি অচিন্ত্য সরকারের ফাইলটা নিয়ে এস। একটা ঠিকানা খুঁজে বের করতে হবে। আর হ্যাঁ, ইমরানকে বল গাড়ীটা বের করতে। এক্ষুনি বেরতে হবে। কুইক!

***

গৌতমের সাথে কথা শেষ করে পার্কিং লটে নিজের গাড়ীতে বসেই অনিকেত আরেকটা ফোন করলেন দিল্লীতে তাঁরই এক পুরনো সহকর্মীকে। খুব তাড়াতাড়ি একটা ইনফর্মেশন চাই তাঁর। আর তাড়াতাড়ি ইনফর্মেশন বের করতে ভারতবর্ষের যে কোনও পুলিশ ডিপার্টমেন্টের থেকে সিবিআই অনেক বেশী দক্ষ। খুব সংক্ষেপে দরকারি নির্দেশগুলো দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ীটা বের করলেন। সময় একেবারেই বেশী নেই তাঁর হাতে। মোবাইলটায় একটা শব্দ হতে পকেট থেকে বের করে দেখলেন গৌতম নির্দেশমত টেক্সট করে পাঠিয়ে দিয়েছে ঠিকানাটা। ঠিকানার দিকে গাড়ী চালাতে চালাতে মনে মনে একবার ভেবে নিলেন সবটা। হ্যাঁ, সবই খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। শুধু বাকী রয়েছে একটাই তথ্য। যেটা জানার জন্যে তাঁর প্রাক্তন দপ্তরের সাহায্য নিতে হল। এই খবরটা পেয়ে গেলেই জিগ্ স পাজলের শেষ টুকরোটা তাঁর হাতে এসে যাবে এবং যবনিকা পড়বে অচিন্ত্য সরকারের মৃত্যুরহস্যে।

তাঁর মনে এতদিন ধরে যে খটকাটা ছিল সেটা দূর হয়েছে। খটকা না বলে সম্ভাবনা বলাটাই বেশী ভাল। কিন্তু এই সম্ভাবনাটা আগেই তাঁর মাথায় আসা উচিত ছিল। তাঁর অবচেতন মন তাঁকে একটা হিন্টও দিয়েছিল স্বপ্নে। কিন্তু

তখন তিনি সেটা ধরতে পারেননি। সত্যি ব্রেনে মরচে পড়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মীশাক খেতে হবে তাঁকে। কোথাও একটা পড়েছিলেন যে ব্রাহ্মীশাক খেলে নাকি মাথা পরিষ্কার হয়।

সপ্তাহের মাঝে ছুটির দিন। রাস্তাঘাট তাই ফাঁকা। বেশীক্ষণ লাগার কথা নয় গন্তব্যে পৌঁছতে। ফাঁকা রাস্তায় আধঘণ্টাতেই পৌঁছে যাওয়া উচিত। বড়জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। কিন্তু রবীন্দ্র সদনের কাছে এসে দেখলেন কোনও একটা রাজনৈতিক দলের সভা ও মিছিলের জন্যে রাস্তা বন্ধ। মনে মনে বিরক্ত হলেন তিনি। এখন গাড়ী ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা ধরে যেতে হবে। আরও মিনিট পনের সময় বেশী লাগবে পৌঁছতে। তবে লালবাতি লাগানো গাড়ীতে করে গৌতম নিশ্চয়ই আগে পৌঁছে যাবে। এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

আরও কিছুদূর এগোনোর পরে যে ফোনটার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন সেটা এসে গেল। গাড়ীটা একটু সাইড করে রেখে রিসিভ করলেন কলটা। হ্যাঁ! তিনি যা ভেবেছিলেন তাই। নিজেরই নিজের পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করল তাঁর। কিন্তু সেটা না করে চাপ বাড়ালেন অ্যাক্সিলারেটরে।

গৌতমের পাঠানো ঠিকানা অনুযায়ী একতলা বাড়িটার সামনে এসে দেখলেন প্রচুর ভিড় বাইরে। কিছু পুলিশও নজরে এল। সবার দৃষ্টি বাড়ির দিকে। গাড়ীটা রাস্তার পাশে একটু ছায়ায় পার্ক করে ঢুকতে গেলেন বাড়িতে। কিন্তু গেটে পাহারারত পুলিশটা বাধা দিল তাঁকে। কি হয়েছে আবার এখানে? একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা দুলতে লাগল। মোবাইলটা বের করে কল করলেন গৌতমকে। রিং হচ্ছে। কিন্তু সে ধরছে না। সে কি পৌঁছয়নি এখনও?

না! ওই তো ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে গৌতম। ফোনটা তার হাতে বেজেই চলেছে। অনিকেত কেটে দিলেন ফোনটা। গৌতমের মুখটা থমথমে। কাছে আসতেই তিনি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, – কি হয়েছে গৌতম? এনিথিং রং?

হতাশ ভাবে উত্তর দিল গৌতম, – আই অ্যাম সরি জ্যেঠু! আমাদের দেরী হয়ে গেছে।

– তার মানে? অনিকেতের গলাটা প্রায় চিৎকারের মত শোনাল।

– তন্ময় ঘোষ কাল রাতে মারা গেছে। যতটা সম্ভব শান্ত গলায় বলল গৌতম, – হি ইজ ডেড!

৮

রিস্টওয়াচে আরেকবার সময়টা দেখল গৌতম। বারোটা বেজে সাত। এখনও এসে পৌঁছননি অনিকেত। বলেছিলেন বারোটার মধ্যে এসে যাবেন। দশ মিনিট আগে একবার ফোন করেছিল সে। তখন বলেছিলেন যে ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়েছেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসবেন। এদিকে সবাই অধৈর্য হয়ে উঠছে। অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

অনিকেতের কথামত সবাইকে ডাকা হয়েছে আজ অচিন্ত্যর বাড়িতে। পুলিশের ডাক অগ্রাহ্য করতে না পেরে প্রত্যেকে আসতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের হাবেভাবে অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে। নন্দিতা আর শাক্য তাঁদের শুটিং ফেলে উপস্থিত। সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়ে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে শাক্য। মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। পাশে বসে নন্দিতা। একটা রুমালে কিছুক্ষণ পরপর চোখ নাক মুছছে। সর্দি না কান্না বোঝা যাচ্ছে না। অরুণিমাও চলে এসেছে হাসপাতাল থেকে একবেলার ছুটি নিয়ে। কেশব বাড়িতেই ছিল। সৈকতকেও আনা হয়েছে। একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে কি যেন ভাবছে। সুরমা সরকারকেও আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলেছেন যে তিনি পুলিশকে সাহায্য করতে সবসময়ই রাজী। কিন্তু যে বাড়ি থেকে একদিন স্বেচ্ছায় বেড়িয়ে এসেছিলেন, সেখানে নিতান্ত বাধ্য না হলে আর ঢুকবেন না। এই শুনে অনিকেত তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এরা ছাড়াও কয়েকজন লালবাজারের অফিসারও রয়েছেন। মুখে উদাসীন ভাব দেখালেও বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকেই মনে মনে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

এমন সময় বাইরে একটা গাড়ীর শব্দ হতে গৌতম জানলা দিয়ে দেখল অনিকেত ঢুকছেন। আজ ড্রাইভার নিয়ে এসেছেন। পোর্টিকোতে গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন বাড়ির ভিতরে। এসেই অপরাধীর মত মুখ করে বললেন, – আই অ্যাম এক্সট্রীমলি সরি! ট্র্যাফিকে ফেঁসে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ আপনাদের অপেক্ষা করতে হল।

প্রত্যেকে তেতো পাচন গেলা মুখে হাসল। তারপর গৌতম বলল, – আগেই বলা হয়েছে আপনাদের এখানে একসাথে ডাকা হয়েছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট করা হবে বলে। ধন্যবাদ সবাইকে আপনাদের মুল্যবান সময় ব্যয় করে আসার জন্যে। বলে অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, – দ্যা স্টেজ ইজ ইয়োরস, স্যার! প্লিজ প্রসিড।

ঘরের মাঝখানে এসে একটা গলাখাঁকারি দিয়ে অনিকেত শুরু করলেন, – আপনারা সবাই জানেন, ঠিক এক সপ্তাহ আগে গত বৃহস্পতিবার এই বাড়িতে বাড়ির মালিক অচিন্ত্য সরকারকে হত্যা করা হয়। লালবাজার এই খুনের তদন্ত শুরু করে। তদন্ত চলাকালীন গতকাল আরেকটি আনফর্চুনেট ঘটনা ঘটে। আপনারা খবরের কাগজে হয়ত পড়ে থাকবেন মিসেস নন্দিতা সরকারের প্রাক্তন স্বামী তন্ময় ঘোষ গতকাল তাঁর বাড়িতে আত্মহত্যা করেন। তাঁর হাতের শিরা কাটা ছিল। একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে। নোট বলাটা হয়ত ঠিক হবে না কারণ তার মাথার কাছে ল্যাপটপে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওপেন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাতে তন্ময় লিখে গেছেন যে তাঁর মৃত্যুর জন্যে কেউই দায়ী নয়। জীবনের প্রতি হতাশা থেকে তিনি সুইসাইডের পথ বেছে নিচ্ছেন।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে অনিকেত একটু থামলেন। একবার চোখ বোলালেন প্রত্যেকের মুখের দিকে। সবাই এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে। খালি নন্দিতা দুটো আঙ্গুল দিয়ে চোখ দুটো চেপে বসে আছে। আবার শুরু করলেন অনিকেত, – যাই হোক, আপনারা জেনে খুশী হবেন যে পুলিশের তদন্ত শেষ হয়েছে এবং অচিন্ত্য সরকারের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘরে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হয়েই থেমে গেল। সেদিকে নজর না দিয়ে অনিকেত বলতে থাকলেন, – যে কোনও ইনভেস্টিগেশনে পুলিশের সবচেয়ে বেশী সুবিধে হয় যদি তদন্তের সাথে জড়িত প্রত্যেকে সত্যি কথা বলেন। সত্যি

মানে 'ট্রুথ, দ্যা হোল ট্রুথ অ্যান্ড নাথিং বাট দ্যা ট্রুথ'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ক্ষেত্রে কেউই 'নাথিং বাট দ্যা ট্রুথ' বলেননি। পুলিশের কাছে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সত্যগোপন করেছেন। কেউ করেছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে, কেউ বা করেছেন পরিস্থিতির চাপে বা ভয়ে।

ঘরে তখন একটা পিন পড়লে তারও শব্দ শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধতা। অনিকেত ফিরলেন সৈকতের দিকে, – সত্যগোপনকারীদের তালিকায় প্রথমেই আসছে সৈকতের কথা। সে পুলিশকে জানিয়েছিল যে সেদিন সে দ্বিতীয়বার বাড়িতে ঢুকেছিল। এমনকি সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতেও উঠেছিল। কিন্তু অচিন্ত্যর শোবার ঘরে ঢোকেনি। এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যে সে ক্ষেত্রে তার লাইটার অচিন্ত্যর শোবার ঘরে এল কি করে? পরশু আমি লক আপে সৈকতের সাথে দেখা করি। আমার মনে হয়েছিল সে ভয় পেয়ে রয়েছে। তাকে আমি অভয় দেই। সত্যি কথা বললে তাকে আমি বাঁচাব এমন প্রতিশ্রুতিও দেই। সৈকতকে ধন্যবাদ, সে তখন আমার কাছে সব কথা খুলে বলে। অ্যাম আই রাইট, সৈকত?

ঘরে সবার চোখ ঘুরে এখন সৈকতের দিকে। সৈকত নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। অনিকেত আবার শুরু করলেন, – সৈকতের সাথে আমার কথাবার্তা অনুযায়ী সেদিন সৈকত কি কি করেছিল সেটা আমি নিজের বয়ানে বলছি। সৈকত, আমার কোথাও ভুল হলে শুধরে দিও। অচিন্ত্য সৈকতের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাঁকে বের করে দেবার পর সৈকত বাগানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খায়। তারপরে মাথা ঠাণ্ডা হলে বাবার সাথে আবার কথা বলবে বলে বাড়িতে ঢোকে। ঠিক এই সময় কারেন্ট চলে যায়। প্রথমে সে স্টাডিরুমে বাবাকে খোঁজে। সেখানে অচিন্ত্যকে না পেয়ে সে আন্দাজ করে নেয় বাবা দোতলায় নিজের শোবার ঘরে আছেন। তাই সে দোতলায় ওঠে। বাবার ঘর অব্দি এসে পৌঁছে দরজার সামনে সে একটা অদ্ভুত গন্ধ পায়। ক্লোরোফর্মের গন্ধ। তার সন্দেহ হয়। সে বাবাকে এক দুবার ডেকে সাড়া না পেয়ে নিজের মোবাইলটা বের করে পকেট থেকে এবং মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটে দেখে তার বাবা প্রাণহীন অবস্থায় বিছানায় পড়ে। সে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে ভাবে এই অবস্থায় সবাইকে জানালে প্রত্যেকে তাকেই সন্দেহ করবে। সে ভেবেছিল তাকে দ্বিতীয়বার ঘরে ঢুকতে কেউ দেখেনি। তাই এখন চুপচাপ বাড়ি থেকে চলে গেলেই তার ওপরে আর কারোর সন্দেহ হবে না। এই ভেবে সে কাউকে কিছু না জানিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সৈকতের সাথে কথা বলে আমি দুটো জিনিস জানতে পারি। প্রথমটা আমার আন্দাজ, বাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যখন সে পকেট থেকে মোবাইল বের করছিল তখন অসতর্কতায় তার লাইটারটা মাটিতে পড়ে যায়। আর দুই নম্বরটা সৈকত আমাকে জানায় যে সে যখন বাবার মৃতদেহটা দেখে কি করবে ভাবছে, ঠিক তখনই কারেন্ট চলে আসে। বাকি সব ঘর বা করিডোরে আলো জ্বলে উঠলেও অচিন্ত্যর ঘর কিন্তু তখনও অন্ধকার ছিল। কি সৈকত ঠিক বললাম তো?

সৈকতের সম্মতি পেয়ে অনিকেত বলতে থাকলেন, – অথচ জবানবন্দীতে রাখালের মা জানিয়েছে যে রাত দশটার সময় সে ঘরে না ঢুকেই দরজার বাইরে থেকেই অচিন্ত্যর ডেডবডিটা দেখতে পায়। তার মানে যখন রাখালের মা অচিন্ত্যর মৃতদেহ আবিষ্কার করে, তখন অচিন্ত্যর ঘরে আলো জ্বলছিল। এই দুজনের বক্তব্য থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে সেদিন সৈকত আর রাখালের মার মাঝখানে আরেকজন কেউ অচিন্ত্যর ঘরে ঢুকেছিল।

ঘরে যেন একটা বোমা পড়ল। এক দুই সেকেন্ড প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের হতবাক অবস্থাটা যেন উপভোগ করলেন অনিকেত। তারপর হঠাৎ কেশবের দিকে ফিরে বললেন, – আচ্ছা কেশববাবু, আপনার পা যে কেটে গিয়েছিল, সেটা সেরে গেছে?

আচমকা এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না কেশব। নিজের অজান্তেই বাঁ পাটা একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, – অ্যা! পা! মানে...কি, কি বলছেন ঠিক...

– না, মানে পরশু দিন যখন আপনার সাথে দেখা হল, দেখলাম আপনি ফিট ফাট হয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন। ফরম্যাল শার্ট, ফরম্যাল প্যান্ট, অথচ পায়ে চামড়ার চটি। কৌতূহল হওয়ায় ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম আপনার বাঁ পায়ে একটা ব্যান্ড-এড লাগানো। আজ আবার দেখছি সেটা নেই। তাই জিজ্ঞেস করলাম যে, কাটাটা কি সেরে গেছে এখন? বিশদ করে বোঝালেন অনিকেত।

– ও হ্যাঁ হ্যাঁ! সেরে গেছে। হড়বড় করে বলল কেশব।

– বাঃ খুব ভাল। তা কেশববাবু পরশুদিন আপনি তো ইন্টারভিউ দিতে যাননি। আপনি গিয়েছিলেন ব্যাঙ্কে। আপনার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করতে, ঠিক কিনা? আরেকটা বোমা ফাটালেন অনিকেত, – উঁহু! অস্বীকার করার চেষ্টা করবেন না। ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ক্যামেরায় আপনাকে পরিষ্কার ভাবে সনাক্ত করা হয়েছে। তা কেশববাবু আপনি তো মাসে বার হাজার টাকা মাইনে পেতেন। তাহলে পঞ্চাশ হাজার একসাথে... ঠিক বুঝলাম না। রিসেন্টলি কি আপনি কোনও লটারিতে টাকা পেয়েছিলেন?

কেশবের মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে কোনও মতে বলল, – আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

– বুঝতে পারছেন না! ওকে! আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কঠিন স্বরে বললেন অনিকেত, – গত বৃহস্পতিবার, সৈকত দ্বিতীয়বার বাড়ি থেকে চলে যাবার পরে আপনি অচিন্ত্যর ঘরে ঢুকেছিলেন। আপনার ঘরটা অচিন্ত্যবাবুর ঘরের ঠিক নীচে। তার ঘরে গ্লাস ভাঙ্গার আওয়াজ আপনি পেয়েছিলেন। পরে কারেন্ট আসার পরে সৈকতকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেও দেখেছিলেন। আপনার মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। আপনি ওপরে যান কি হয়েছে দেখতে আর তখন অচিন্ত্যবাবুর মৃতদেহটা আবিষ্কার করেন। আপনার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি জেগে ওঠে। পার্সোনাল ম্যানেজার হিসেবে আপনি অচিন্ত্যর সব ট্র্যানজ্যাকশনের খবর রাখতেন। সেই সুত্রে বাড়িতে যে আশি হাজার টাকা রাখা আছে সেটা আপনার জানা ছিল। আলমারির চাবি কোথায় রাখা থাকত সেটাও আপনি জানতেন। লোভ সামলাতে না পেরে অচিন্ত্যর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে আপনি সেদিন টাকাগুলো চুরি করেন।

– কি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন স্যার! আমি ওইদিন স্যারের ঘরে ঢুকিইনি! মিনমিনে শোনাল কেশবের গলাটা।

– আর একটাও মিথ্যে কথা বলবেন না, কেশববাবু। গর্জে উঠলেন অনিকেত, – সেদিন যদি আপনি অচিন্ত্যর ঘরে নাই ঢোকেন তাহলে ওঁর ঘরের পাপোশে আপনার রক্তের দাগ এল কি করে? শুধু সেটাই নয় করিডোরে ওয়েস্ট

পেপার বাস্কেটে অচিন্ত্যর গ্লাসের একটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোও পাওয়া গেছে, যেটাতে আপনার রক্ত আর হাতের ছাপ রয়েছে। সেদিন আলমারি থেকে টাকা আর গয়না সরিয়ে ফেরার সময় অসতর্ক ভাবে একটা গ্লাসের টুকরোতে আপনার পা কেটে যায়। আপনি বেখেয়ালে সেই পা মোছেন পাপোশে এবং গ্লাসের টুকরোটি হাতে করে নিয়ে ফেলেন বাইরের ময়লা কাগজের বাস্কেটে। আর সেই কারণেই ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় শু না পরে চামড়ার চটি পড়তে বাধ্য হন। তারপরে সবথেকে বড় ভুলটা করেন চুরি করা আশি হাজার টাকার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট করতে গিয়ে। আপনি হয়ত জানতেন না যে পুলিশ আপনার এবং আপনার সব ক্লোজ রিলেটিভদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মনিটর করছে। তবে গয়নাগুলো মনে হয় এখনও সরাতে পারেননি। আমি শিয়োর যে আপনার ঘর সার্চ করলে গয়নাগুলো আপনার ঘরেই পাওয়া যাবে।

এবার ভেঙ্গে পড়ল কেশব। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে বলল, – আমার ভীষণ ভুল হয়ে গেছে স্যার। লোভে পড়ে পাপ করে ফেলেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি স্বীকার করছি, আমি সেদিন স্যারের ঘরে ঢুকেছিলাম। চুরি আমিই করেছি। কিন্তু স্যার, মায়ের দিব্যি গেলে বলছি খুন আমি করিনি।

কড়া গলায় বললেন অনিকেত, – ক্ষমা করার আমি কেউ নই, কেশববাবু। খুন হয়ত আপনি করেননি, কিন্তু একটা মস্ত বড় অপরাধ আপনি করেছেন। শুধু তাই নয় বেরোনোর সময় সৈকতের লাইটারটা দরজার বাইরে পড়ে থাকতে দেখে সেটা রুমালে চেপে আলমারির সামনে রেখে এসে জেনে শুনে একজন নিরপরাধীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতেও আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আমার কাজ ছিল আপনাকে ধরিয়ে দেওয়া, এবার আপনার বিচার করবে মহামান্য আদালত।

গৌতমের ইশারায় একজন অফিসার এগিয়ে এসে কেশবকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে উপস্থিত সবার বিহ্বলতা কাটতে একটু সময় লাগলো। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করে শাক্য বলল, – তাহলে অচিন্ত্যকে খুনটা করল কে?

শান্ত গলায় ঘোষণা করলেন অনিকেত, – অচিন্ত্যকে খুন করেছে তন্ময় ঘোষ।

এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল নন্দিতা। এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, – কি বলছেন যাতা? তন্ময় সেদিন গৌহাটি যাচ্ছিল। সে নিজে আমাকে বলেছে। তাছাড়া পুলিশ...

– যাচ্ছিল। কিন্তু যায়নি। নন্দিতা শেষ করার আগেই বাধা দিলেন অনিকেত। – দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে মিসেস সরকার। তন্ময় সেদিন গৌহাটি যাবে বলে ট্রেনে উঠেছিল। হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ে বিকেল তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে। ফার্স্ট স্টপেজ বর্ধমানে পৌঁছয় পাঁচটা চারে। তন্ময় বর্ধমানে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। তারপরে ন্যাশনাল হাইওয়ে টু ধরে দেড় থেকে দুই ঘণ্টা লাগে তার কোলকাতা ফিরতে। কোলকাতায় ফিরে সে কৌশলে এই বাড়িতে ঢোকে। অচিন্ত্যর ঘরের পিছনে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটা আছে সেটা বেয়ে দোতলার কার্নিশে ওঠে। তার কাছে অচিন্ত্যর ব্যালকনির ফায়ার এস্কেপে যে তালাটা লাগানো থাকে, সেই তালার ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। তালা খুলে সে অন্ধকারে ব্যালকনিতে

লুকিয়ে থাকে। তারপর অচিন্ত্য যখন সৈকতের সাথে ঝগড়া করে ওপরে চলে আসে, তখন সুযোগ বুঝে তাকে ক্লোরোফর্ম করে হত্যা করে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন অনিকেত।

– কিসের ভিত্তিতে কথাগুলো বলছেন আপনি? এবার প্রশ্ন অরুণিমার। – সে যে কোলকাতা ফিরে এসেছিল এমন কোনও প্রমাণ আছে কি আপনাদের কাছে?

– একটা নয়, অনেকগুলো প্রমাণ আছে, মিস সরকার! অরুণিমার দিকে ফিরলেন অনিকেত। – যেমন সেদিন কোলকাতায় ঢোকার সময় সন্ধ্যে ছটা তেত্রিশ নাগাদ ডানকুনি টোল প্লাজার সিসিটিভি ক্যামেরায় তাকে সনাক্ত করা গেছে। তাছাড়া প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে ছটায় ইন্ডিগোর একটা মর্নিং ফ্লাইট কোলকাতা থেকে গৌহাটি যায়। ছাব্বিশে এপ্রিল মানে অচিন্ত্য সরকারের মৃত্যুর পরের দিন ওই ফ্লাইটে যে যে প্যাসেঞ্জার গৌহাটি গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে তন্ময় ঘোষের নামটাও পুলিশ খুঁজে বের করেছে।

– বেশ! মেনে নিলাম সে কোনও কারণে কোলকাতায় ফিরে এসেছিল। সহজে মেনে নেবার পাত্রী নয় অরুণিমা। – কিন্তু এতে তো এটা প্রমাণ হয় না যে তন্ময়ই দাদাকে খুন করেছে।

– হ্যাঁ, তা ঠিক। অনিকেতের পাল্টা জবাব। – কিন্তু পুলিশ তন্ময়ের বাড়ি সার্চ করে অচিন্ত্যর ঘরের ব্যালকনির ফায়ার এস্কেপে যে তালাটা লাগানো ছিল, তার ডুপ্লিকেট চাবিটা খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া যে ছুরিটা দিয়ে তন্ময় নিজের হাতের শিরা কেটেছে, সেই একই ছুরি দিয়ে সে অচিন্ত্যকে হত্যা করে। ছুরিতে অচিন্ত্যর ডিএনএ-র নমুনা পাওয়া গেছে।

– কিন্তু গেটে সিকিউরিটির নজর এড়িয়ে সে বাড়িতে ঢুকল বা বেরলো কি করে? শাক্যর বিস্ময় যেন কাটছেই না।

– ভাল প্রশ্ন! আগে বেরনোরটা বলি। অনিকেত বিশ্লেষণ করলেন, – অচিন্ত্যকে মারার পর তন্ময় আবার যে পথে ঘরে ঢুকেছিল সেই পথেই বেরিয়ে যায়। বেরনোর সময় খেয়াল করে ফায়ার এস্কেপের তালাটাও লাগায়। এরপরে সে জেনারেটর রুমে গিয়ে মেন লাইনের সার্কিট ব্রেকারটা ট্রিপ করে দেয়। ফলে সমস্ত বাড়ির কারেন্ট চলে যায় আর সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা জগন্নাথ জেনারেটর চালাতে গেট ছেড়ে জেনারেটর রুমে আসে। জেনারেটর রুম থেকে মেন গেটটা দেখা যায় না। আর সেই সুযোগে তন্ময় সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা হৃদয়াঙ্গম করতে সবারই একটু সময় লাগল। শাক্যই আবার মুখ খুলল, – আর ঢোকার সময়?

– আর ঢোকার সময় তন্ময়কে বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করে তার হত্যাকারী।

এবার আর ছোটখাটো বোমা নয়, ঘরে যেন একটা নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন হল। কারোর মুখে কোনও কথা সরছে না দেখে, অনিকেত নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, – হ্যাঁ! কথাটা সত্যি। তন্ময় আত্মহত্যা করেনি। অচিন্ত্যর মত তাকেও খুন করা হয়েছে। হত্যাকারী খুনটাকে একটা আত্মহত্যার চেহারা দিতে চেয়েছিল আর এই কারণেই একটা সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছিল ল্যাপটপে। কিন্তু দুটো অনিচ্ছাকৃত ছোট ভুল তার চেষ্টাটা ব্যর্থ করে দিয়েছে। পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেছে যে এটা আত্মহত্যা নয়। এটা একটা প্রিপ্ল্যানড মার্ডার। প্রথমত হত্যাকারী দেখাতে চেয়েছিল তন্ময় নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু একজন লোক যখন তার নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের

শিরা কাটে তখন স্বাভাবিকভাবে কাটমার্কের ডিরেকশন থাকে ডায়াগোন্যালি তালুর দিক থেকে কনুই-এর দিকে, মানে ওপর থেকে নীচের দিকে। কিন্তু যদি অন্য কেউ সেই কাজটা করে সেক্ষেত্রে এই ডিরেকশনটা হয় উল্টো। মানে কনুই-এর দিক থেকে তালুর দিকে অর্থাৎ হাতের নীচের দিক থেকে ওপরের দিকে। তন্ময়ের হাতের কাটমার্কটা এই দ্বিতীয় ধরণের ছিল। আর দুই নম্বর ভুলটা হল হত্যাকারী তন্ময়কে মারার আগে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল যাতে সে কোনওরকম বাধা না দিতে পারে। অটপ্সি রিপোর্টে তন্ময়ের পেটে ঘুমের ওষুধ নাইট্রাজেপাম বা এন টেনের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। মিডিয়াকে ইচ্ছে করেই প্রকৃত খবরটা দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছিল তন্ময় আত্মহত্যা করেছে। কারণ আসল খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে হত্যাকারী সতর্ক হয়ে যেতে পারত।

এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে অনিকেত দম নেবার জন্যে একটু থামলেন। তারপরে অরুণিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, – বাই দ্য ওয়ে, মিস সরকার। আপনি আপনার গাড়ীটা রিসেন্টলি সার্ভিসিং করতে দিয়েছিলেন, তাই না?

– অ্যাঁ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ! প্রথমে একটু চমকালেও দ্রুত সামলে নিল অরুণিমা, – কেন বলুন তো?

– না এমনিই! মারুতি এইট হান্ড্রেডটা তো আপনার। তাই না? তা কোন মারুতি সার্ভিস ষ্টেশনে দিয়েছিলেন সার্ভিস করাতে?

– আসলে কি হয়েছে, আমার এক পেশেন্ট রয়েছেন যার একটা সার্ভিস ষ্টেশন আছে। আমি মারুতি চালাই দেখে তিনিই একদিন কৃতজ্ঞতাবশত বলেছিলেন যে আমার গাড়ীটা সার্ভিসিং করাতে হলে তাঁকে যেন বলি। কম টাকায় করিয়ে দেবেন। অরুণিমার সপ্রতিভ উত্তর। – তাই গাড়ীটা ইদানীং ট্রাবল দিচ্ছিল দেখে তাঁকেই বলেছিলাম। তিনিই লোক পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার সার্ভিসিং হয়ে যাবার পরও তিনিই তাঁর লোক মারফৎ ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি ঠিক জানি না তাঁর সার্ভিস ষ্টেশনটা ঠিক কোথায়।

মন দিয়ে কথাগুলো শুনে ওপরে নীচে মাথা নাড়লেন অনিকেত। কিছু একটা ভাবলেন এক দুই সেকেন্ড। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, – আপনি তো তন্ময়কে চিনতেন, তাই না?

কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল অরুণিমা, – চিনতাম বলাটা ঠিক হবে না। মুখচেনা ছিল, এটুকু বলতে পারি।

– চিনতেন না? কেন? অনিকেত অবাক হল। – আমাদের কাছে তো খবর আছে যে আপনারা দুজন একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়তেন।

– তাই নাকি? হতে পারে। আসলে আমাদের স্কুলে এক একটা ক্লাসে চারটে করে সেকশন ছিল। আর প্রত্যেক সেকশনে পঞ্চাশজন করে স্টুডেন্ট পড়ত। এতজনের মধ্যে সবার সাথে তো আর সমান পরিচিতি থাকে না। তাই না? এবারও দমল না অরুণিমা।

– হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তার মানে আপনি ততটা চিনতেন না তন্ময়কে। অনিকেত সম্মত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তীরের মত প্রশ্ন ছুঁড়লেন, – তাহলে মিস সরকার, আপনার গাড়ী সার্ভিসিং-এর বিলটা তন্ময়ের কাছে এল কি করে?

– মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? এবার অরুণিমার মুখে ঈষৎ ভয়ের ছাপ পড়ল।

অরুণিমার চোখে চোখ রেখে বললেন অনিকেত, – পুলিশ তন্ময়ের ঘর থেকে আপনার গাড়ীর সার্ভিসিং-এর বিলটা খুঁজে পেয়েছে, মিস সরকার, যেটাতে আপনার গাড়ীর নাম্বারটা স্পষ্ট ভাবে লেখা রয়েছে। আপনি আর তন্ময় দুজনে মিলে প্ল্যান করে অচিন্ত্যকে খুন করেছেন। আপনি বা তন্ময় কেউ একজন কয়েকদিন আগে আপনার গাড়ীটা সার্ভিসিং এর জন্যে বর্ধমানের একটা মারুতি সার্ভিস স্টেশনে রেখে আসেন। গত বৃহস্পতিবার তন্ময় বর্ধমানে ট্রেন থেকে নেমে প্রথমে সেখান থেকে আপনার গাড়ীটা কালেক্ট করে। তারপরে সেটাতে করে কোলকাতা ফিরে তন্ময় আপনার গাড়ীর ডিকিতে লুকিয়ে থাকে আর আপনি আপনার ড্রাইভারকে ডাকেন আপনাকে নিয়ে বাড়িতে ফেরার জন্যে। এভাবেই তন্ময় সেদিন আপনার সাহায্যে সিকিউরিটির চোখ এড়িয়ে এই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। শুধু এটুকু করেই কিন্তু আপনি ক্ষান্ত হননি। গতকাল রাতে আপনি আপনার এই কুকর্মের পার্টনার তন্ময়ের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে হয়ত সাকসেস সেলিব্রেট করার অজুহাতে তন্ময়ের ড্রিঙ্কে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন। পরে তন্ময় ঘুমিয়ে পড়লে, তার হাতের শিরা কেটে তাঁকে খুন করে আপনার অপরাধের একমাত্র সাক্ষীকে চিরতরে চুপ করিয়ে দেন।

কোণঠাসা বাঘিনীর মত ফুঁসে উঠল অরুণিমা, – মিথ্যে কথা। তখন ধরে যা মনে আসছে তাই বলে চলেছেন। কোনও প্রমাণ ছাড়া যা ইচ্ছে তাই বলে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন...

হিমশীতল কণ্ঠে বললেন অনিকেত, – আমি আপনাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছি না মিস সরকার। আপনি নিজেই নিজেকে ফাঁসিয়েছেন। আপনার জ্ঞাতসারে জানাই, মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে তৈরি যে কোনও ডকুমেন্টে দুটি প্রোপার্টি থাকে। 'অথার' এবং 'লাস্ট সেভ্ড বাই'। যে ব্যাক্তি কম্প্যুটারে লগইন করে ডকুমেন্টটা তৈরি করছে, বাই ডিফল্ট তার ইউজার নেমটা এই দুটো প্রোপার্টিতে স্টোর হয়ে যায়। পরে ডকুমেন্টটা এক কম্প্যুটার থেকে অন্য কম্প্যুটারে নিয়ে গেলেও এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয় না। আপনি মনে হয় সুইসাইড নোটটা আপনার নিজের ল্যাপটপে বানিয়ে পেন ড্রাইভে করে ট্র্যান্সফার করেছিলেন তন্ময়ের ল্যাপটপে। কারণ তন্ময়ের সুইসাইড নোটটাতে 'অথার' এবং 'লাস্ট সেভ্ড বাই' প্রোপার্টিতে যে নামটা দেখা যাচ্ছে সেটা হল arunima.sarkar।

কিছু একটা বলার চেষ্টা করেও থেমে গেল অরুণিমা। ফ্যালফ্যাল করে অনিকেতের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলায় দুঃখের ভাব ফুটিয়ে অনিকেত আবার বললেন, – আয়্যাম সরি, মিস সরকার। আপনি ধরা পড়ে গেছেন। আমি জানি আপনি আপনার ল্যাপটপ থেকে ফাইলটা শিফ্ট ডিলিট করে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ফরেন্সিক ল্যাবে আপনার ল্যাপটপের হার্ড ড্রাইভটা অ্যানালাইসিস করে সেই পার্মানেন্টলি ডিলিট করা ফাইলটাও উদ্ধার করা সম্ভব। আপনার বাঁচার আর কোনও উপায় নেই।

এক দুই সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে মাথাটা নিচু করে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে নিল অরুণিমা। এতক্ষণ গৌতম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। এবার এগিয়ে এল অরুণিমার দিকে। বলল, – মিস সরকার! আপনাকে একবার আমাদের সাথে থানায় আসতে হবে। অচিন্ত্য সরকারের মৃত্যুর চক্রান্তে জড়িত থাকার আর তন্ময় ঘোষকে হত্যার দায়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

অনিকেতকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এই কদিন বেশ চাপ গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। তাও তাঁর মুখ যুদ্ধজয়ের কারণে উজ্জ্বল। অবসন্ন দেহে এগিয়ে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে রাখা একটা জলের বোতল থেকে কয়েক ঢোঁক জল খেলেন। তারপর ফিরে এসে নন্দিতার দিকে ফিরে বললেন, – লাস্টে আর একটা কথা বলে আমার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করব। সত্যগোপনকারীদের দলে শেষ সদস্য হিসেবে আপনার নামটাও আছে মিসেস সরকার। সেদিন পার্টি থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন এই কথাটা আপনি না বললেও, যার সাথে আপনি সেদিন ঝটিকা অভিসারে গিয়েছিলেন, সেই শাক্য কিন্তু পুলিশের কাছে কিছুই গোপন করেননি।

৯

বিকেলে আর কোথাও বেড়াতে না বেরিয়ে বাড়িতেই ছিলেন অনিকেত। সোফায় বসে আনন্দবাজার পত্রিকার পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপন দেখে ছেলের জন্যে উপযুক্ত পাত্রীদের বাছাই করে লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে রাখছিলেন। দময়ন্তীর কড়া হুকুম। এবার থেকে খালি বনের মোষ না তাড়িয়ে ঘরের কাজও কিছু কিছু করতে হবে। এমন সময় কলিং বেলের শব্দ পেয়ে সহদেব এসে দরজা খুলে দিল। গৌতম এসেছে। তাঁকে দেখে অনিকেত পেপারটা ভাঁজ করে পাশে সরিয়ে রেখে হেসে বললেন, – আরে এস এস গৌতম, বল কি খবর?

– খবর ভালই জ্যেঠু। গৌতমও পাল্টা হেসে বলল, – অরুণিমা সরকার সব কনফেস করেছে। তাঁকে এখনও ইন্টারোগেশন করা হচ্ছে। আরও অনেক ইনফরমেশন পাওয়া বাকী। আর সৈকতকে সসম্মানে সব দায় থেকে মুক্ত করা হয়েছে। সে ছাড়া পেয়ে বাড়ি গেছে।

– বাঃ! এতো খুব ভাল খবর। কংগ্র্যাচুলেশনস।

– কংগ্র্যাচুলেশনস তো আপনার প্রাপ্য, জ্যেঠু। মির‍্যাকলটা তো আপনিই করেছেন। আন্তরিক ভাবে বলল গৌতম। – আমি তো ভাবতেই পারছি না কি করে আপনি কেসটা ক্র্যাক করলেন?

হা হা করে হেসে উঠলেন অনিকেত, – গৌতম, এদেশের সব পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মূল সমস্যাটা কি জান? আমরা সব কেসে খালি মেক্যানিকালি ইনভেস্টিগেট করি। তদন্তের সময় নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাই না। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কি এমন করেছিল তন্ময়? সিম্পলি একটা ইল্যুশন ক্রিয়েট করেছিল। ট্রেনে উঠেই প্রথমেই মার্ক করে নিয়েছিল ওই বাবা, মা আর বাচ্চাটাকে। কারণ বাচ্চাদের সাথে ভাব জমিয়ে নেওয়াটা সবচেয়ে সহজ। তারপর ধীরে ধীরে বাচ্চার থ্রুতে বাবা মার সাথে আলাপ জমায়। ও জানত পরে পুলিশ খোঁজ করলে আর কেউ না করুক অন্তত এরা তাঁকে আইডেন্টিফাই করবেই। এভাবে অকাট্য একটা অ্যালিবাই তৈরি করে সে বর্ধমানে নেমে যায়। পরের দিন সকালে প্লেনে গৌহাটি গিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে আসে কামাখ্যা স্টেশনে। এই স্টেশনে সব ট্রেন দাঁড়ায়। ফের ট্রেনে উঠে পড়ে এমন একটা ভাব করে যেন রাতের বেলা কোনও বন্ধুর সাথে গল্প করে বা তাস খেলে কাটিয়েছে। ব্যাস, ট্রেনের সহযাত্রীরা আর গৌহাটিতে যে তাকে স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছিল প্রত্যেকে

তার হয়ে গলা ফাটায় যে সে ওইদিন ট্রেনেই ছিল। প্রথম দিন তোমার সাথে কথা বলে বা জবানবন্দীর ফাইলটা পড়ে আমার খালি মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কিছু ধরতে পারছিলাম না। পরে মাথায় আসে যে এক্ষেত্রে আসল তথ্য জানাতে পারে একমাত্র টিকিট চেকার। তাই তন্ময়কে সন্দেহ হতেই আমি সিবিআই-কে এই ইনফর্মেশনটা বের করতে বলি। তারা সেদিনের দায়িত্বে থাকা টিকিট চেকারের সাথে যোগাযোগ করে আমাকে জানায় যে সেইদিন সেই ট্রেনে টিটি কোথাও তন্ময়ের দেখা পায়নি। ব্যাস তন্ময়ের ম্যাজিকের রহস্য ফাঁস।

– হুমম ঠিকই, টিকিট চেকারের ব্যাপারটা আমাদের মাথায় আসেনি। গৌতম স্বীকার করল, – কিন্তু তন্ময়ের ওপর আপনার কি কারণে সন্দেহ হল?

– দেখ, তোমরা তন্ময়কে প্রথমেই ক্লিনচিট দিয়ে দিলেও, আমি কিন্তু ওকে কখনই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিইনি। সুরাহা করলেন অনিকেত। – কোনও লোক যদি কাউকে সবার সামনে খুনের হুমকি দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার তার সাথে মিটমাট করে নেয়, তখন এর পিছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য থাকার সম্ভাবনাটা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তন্ময় নন্দিতার সাথে ঠিক এটাই করেছিল। তারপরে আমি সুরমা সরকারের কাছ থেকে আরেকটা ইম্পরট্যান্ট ক্লু পাই। তিনি কথায় কথায় তন্ময় সম্বন্ধে বলেছিলেন যে অচিন্ত্য মারা যাওয়ায় এখন নিশ্চয়ই 'ওরা' সুখী হবে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে উনি হয়ত শাক্যর ব্যাপারটা জানেন না, তাই 'ওরা' বলতে তন্ময় আর নন্দিতার কথা বলছেন। কিন্তু পরে উনি পরিষ্কার করেন ব্যাপারটা। সৈকত একদিন একটা রেস্ট্যুর‍্যান্টে তন্ময় আর অরুণিমাকে একসাথে দেখে মাকে এসে কথাটা জানিয়েছিল। তখন থেকে তন্ময়ের প্রতি আমার সন্দেহটা জোরদার হয়। কিন্তু অচিন্ত্যকে খুন করার পিছনে ওর মোটিভটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে শাক্যর সাথে কথা বলে জানতে পারি যে নন্দিতা আর অচিন্ত্যর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কই ছিল না। ফলে অচিন্ত্যর মৃত্যুর পরে তার 'ইমিডিয়েট নেক্সট অফ কিন' হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি পাবার কথা অরুণিমার, নন্দিতার নয়। তখনই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়। তন্ময়ের সাথে মিটমাট হয়ে যাবার পরে শাক্য আসার আগে থেকেই তন্ময়ই ছিল নন্দিতার একমাত্র কাছের মানুষ। তাই আমি আন্দাজ করি যে শাক্য ছাড়াও এই তথ্যটা নন্দিতা নিশ্চয়ই তন্ময়কেও জানিয়েছিল। পরে আমার আন্দাজটাই সত্যি প্রমাণিত হল। তবে একটা ভুল আমি করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম এই প্ল্যানটা তন্ময়ের। পরে যখন বুঝতে পারি যে পুরো ব্যাপারটার মাষ্টারমাইন্ড অরুণিমা আর তন্ময় ইজ নাথিং বাট অ্যা পন, তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

– ঠিকই বলেছেন। সায় দিল গৌতম। – অরুণিমা যে একাজে জড়িত থাকতে পারে সেটা ভাবাই যায় না।

– দেখ গৌতম। মানুষের মন বড়ই দুর্বোধ্য। সে যে কখন কি পথে চলে সেটা বোঝা খুবই কঠিন। দার্শনিকের মত উত্তর দিলেন অনিকেত। – অরুণিমাকে ইন্টারোগেট করলে আসল সত্যিটা জানা যাবে। তবে আমার যেটা মনে হয় অরুণিমা কম বয়সে মা কে হারিয়ে সুরমাকে পেয়ে তাকেই নিজের মায়ের জায়গায় বসায়। অচিন্ত্য যখন সুরমাকে ডিভোর্স করে তখন থেকেই সে তার দাদাকে প্রাণপণে ঘৃণা করত। সরি, ভুল হল, শুধু দাদাকে নয়, অরুণিমার এই ঘৃণাটা ছিল পুরো পুরুষ জাতটার প্রতি। তারপর যখন নন্দিতা এল সে বুঝল যে অচিন্ত্যর সব সম্পত্তি একসময়

নন্দিতা পাবে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সে তন্ময়কে চিনত। শত্রুর শত্রু মিত্র। তাই সে প্রেমের ফাঁদ পেতে তন্ময়কে দলে টানল। তন্ময় নন্দিতাকে প্রাণপণে ভালবাসত। নন্দিতার সাথে ডিভোর্স হওয়ার জন্যে সে অচিন্ত্যকেই দায়ী করত। আর সেই জন্যে অচিন্ত্য আর নন্দিতার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে মরিয়া হয়ে ছিল। তাই অরুণিমার ডাকে তার সাথে হাত মেলাতে সে দেরী করেনি। অরুণিমা হয়ত তন্ময়কে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রথমে তারা ঠিক করেছিল প্রথমে নন্দিতা আর তারপরে অচিন্ত্য, একে একে দুজনকেই সরিয়ে দেবে। তারপরে সব গোলমাল মিটলে তারা বিয়ে করে নেবে। ফলে অরুণিমা আর তার দখলে সব সম্পত্তি চলে আসবে। কিন্তু পরে অরুণিমা যখন তন্ময়ের কাছ থেকে জানতে পারে যে অচিন্ত্য আর নন্দিতার বিয়েই হয়নি, তখন তারা প্ল্যান চেঞ্জ করে অচিন্ত্যকেই প্রথমে টার্গেট করে। তন্ময় আদতে ছিল বোকা। সে অরুণিমার আসল প্ল্যান ধরতেই পারেনি। অচিন্ত্যর মৃত্যুর পর অরুণিমার জীবনে তন্ময়ের আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাই প্ল্যানের ফাইনাল স্টেপ অনুযায়ী অরুণিমা তন্ময়কেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়।

অনিকেতের ব্যাখ্যায় ঘরের পরিবেশটা ভারী হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ দুজনেই কোনও কথা বললেন না। শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল গৌতম, – সত্যি জ্যেঠু, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, না হলে হয়ত এই কেসের সমাধানই হত না। এনি ওয়ে আজ উঠি। ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে।

অনিকেতও উঠলেন গৌতমকে এগিয়ে দিতে। দরজার সামনে এসে বললেন, – চল, আবার দেখা হবে! একদিন সময় করে যাব তোমাদের বাড়িতে। বৌমাকে বলবে আমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে হবে। ভাই ছাড়া পেয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই জ্যেঠুকে ভালমন্দ রান্না করে খাওয়াতে ওর আর কোনও আপত্তি থাকবে না?

যেতে যেতে পিছনে ফিরল গৌতম। হাঁ হয়ে গেছে কথাটা শুনে। কোনও মতে বলল, – মানে? আপনি কি করে...? ও মাসীমা তাহলে...

আবার ঘর কাঁপিয়ে উদাত্ত হাসি হাসলেন অনিকেত, – না গৌতম। তুমি ভুল করছ। আমি জানি আমি সুরমা দেবীর বাড়িতে যাবার আগে তুমি ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলে। উনি তোমাকে দেওয়া কথা রেখেছেন। উনি কিন্তু আমাকে তোমাদের ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

– তাহলে আপনি জানলেন কি করে? গৌতমের হতভম্ব ভাব কাটছেই না।

– গৌতম, তুমি হয়ত বিয়ের পর ওঁদের বাড়িতে যাওনি বা গেলেও খেয়াল করনি। ওঁর বাড়ির দেওয়ালে প্রচুর ফ্যামিলি ফটো টাঙ্গানো আছে। তার মধ্যে একটা ফটো আছে যেটায় সৈকতকে তার এক দিদি ভাইফোঁটা দিচ্ছে। যদিও বেশ কয়েক বছর আগের ছবি। তাও ওই ছবি দেখে বৌমাকে চিনে নিতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

বিশেষ ধন্যবাদ

শর্মিলা ব্যানার্জি

নির্মাল্য মুখার্জী চক্রবর্তী

ধন্যবাদ

সত্র্যজিত

পাগলা দাশু

হস্তিমূর্খ

প্রচ্ছদ

শাক্যমুনি

সম্পাদনা

প্রত্যয়

www.chorjapod.com